এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা ১২

প্রকাশক শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী : মণীন্দ্র মিত্র

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৬

মুল্য : পাঁচ টাকা

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা

চৌত্রিশ নম্বরের ল্যাসিকে

এই গল্পের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।

॥ এক ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কেয়াতলা লেনের একটা অন্ধকার বাড়িতে হঠাৎ একদিন আলো জ্বলল।

রমাপদ চাকরি পেয়েছে। চাকরি পেয়েছে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে। সবে সে চাকরি পেল, একমাস না গেলে মাইনের একটা টাকাও ঘরে আসবে না। তবুও কেয়াতলার ছোট্ট সংসারটায় ছড়িয়ে পড়ল আনন্দের আলো। বৃদ্ধ পিতা শশধরবাবু রমাপদর নিয়োগপত্রটা পকেটে নিয়ে চ'লে এলেন লেকের দিকটায়। রোজই তিনি আসেন এখানে বেড়াতে। লেকের ধার দিয়ে কখানা বেঞ্চি পাতা আছে। বেঞ্চিগুলো কে যে ওখানে পেতে রেখেছে শশধর সেন তা জানেন না। ইংরেজ-সরকারের হাতে এখন অনেক কাজ। হিটলারকে রুখতে হচ্ছে। রুখতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। তার ওপর, বেঁটে বেঁটে জাপানীগুলো কি কাণ্ডই না শুরু করল! খিদিরপুরের ডকে এরই মধ্যে তিনটে বোমা পড়েছে। দুটো ফাটল, একটা আবার ফাটল না। চাটগাঁর খালাসীগুলো তাজা বোমা ধ'রে ফেলেছে। বেঞ্চিতে ব'সে শশধরবাবু রমাপদর নিয়োগপত্রের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

হ্যাঁ, কি যেন ভাবছিলেন তিনি? তাজা বোমা। বোমাটা নাকি ফারপো কোম্পানির কুইন কেকের মত দেখতে। বেঁটে জাপানীগুলো কম বজ্জাত নয়। ইংরেজকে ভয় দেখাবার জন্যে হয়তো সত্যি সত্যি ওরা একটা কুইন কেকই ফেলে দিয়ে গেছে। ওপরটা লোহা বটে, কে জানে ভেতরে হয়তো বারুদ নেই, ক্রিম দিয়ে ভর্তি করা। ঘন দুধের সঙ্গে যে খানিকটা ময়দা আর চিনি মিশিয়ে ক্রিম তৈরি করতে হয়, শশধরবাবু তা জানেন। ক্রিম? না, ক্রিম কোথায়? পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, নিয়োগপত্র।

বেঞ্চির পেছনে রাস্তা দিয়ে একটা মিলিটারি কন্‌ভয় যাচ্ছিল। শশধরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চশমার তলা দিয়ে একবার দেখে নিলেন গাড়িগুলোকে। তারপর জলের দিকে মুখ ক'রে ভাবলেন, বাপের ব্যাটা বটে ইংরেজগুলো। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে লড়ছে তো ওরাই। ফরাসীগুলো কেবল কবিতা আর উপন্যাস লিখে লিখে বিংশ শতাব্দীটাকে নষ্ট করতে বসেছে। যুদ্ধ জেতবার বলিষ্ঠতা

লোপ পেয়েছে ওদের চরিত্র থেকে। কিন্তু ইংরেজ? চোখ বুজে শশধরবাবু স্মরণ করতে লাগলেন তাঁর ছাত্রজীবনের কথা। ইংলণ্ডের ইতিহাস তাঁর প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত মুখস্থ ছিল। তাঁর মত এত বেশি নম্বর কেউ পেত না। লণ্ঠনের কেরোসিন তেল পুড়িয়ে পুড়িয়ে তিনি নেশাখোরের মত ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়তেন। কি বই রে বাবা! ইতিহাস নয়, যেন পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ উপন্যাস পড়ছেন তিনি! উপন্যাসই বটে, নইলে এই সব আজগুবি এবং অসম্ভব ব্যাপারগুলো ঘটছে কি ক'রে? ইউরোপ থেকে হ'টে এসেছে, হেরে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাঙালী বাবুদের হাওয়া খাবার জন্যে লেকের ধারে বেঞ্চিগুলো পেতে রেখেছে ওরাই। এমন ব্যবস্থা আর কে করত মশাই? শশধরবাবু প্রশ্নটা যেন একটু জোরেই উচ্চারণ ক'রে ফেললেন। আজ তাঁর ফুসফুসের জোর বেড়েছে। রমাপদ চাকরি পেল।

পেনশনপ্রাপ্ত সাব-জজ মাখন গুপ্ত এসে বসলেন শশধরবাবুর পাশে। রোজই বসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি যেন বলছিলেন একটু আগে, মাস্টার মশাই?"

"বলব আর কি! ইংরেজ এবার গেল।"—বললেন শশধরবাবু।

মুন্সেফি করতে করতে মাখন গুপ্ত সাব-জজ হয়েছিলেন পেনশন নেওয়ার এক বছর আগে। ইংরেজদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। লেকের হাওয়া খেতে খেতে তিনি সে কথা ঘোষণা করেন প্রতিদিন। ঘোষণা করেন মাখনবাবু যে, তাঁর বড় ছেলে প্রভাসও মুন্সেফি করতে করতে একদিন সাব-জজ হবে। বোধ হয় সেই কারণেই মাখন গুপ্ত মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কোনদিন অস্ত যাবে না।

"নাঃ, হিটলার পারবে না মশাই। আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি।"—বেঞ্চিতে ব'সে ঘোষণা করলেন মাখনবাবু।

"আপনার আমার লেখার ওপর আর কিছুই নির্ভর করছে না, খিদিরপুর ডকে বোমা পড়েছে।"

"মিসেস গুপ্তকে নিয়ে আমি কাল হাজারিবাগ চ'লে যাব ভাবছি। আপনি কি করবেন শশধরবাবু?"

"আমার আবার করা-করি কি! আমি তো আর পেনশন পাই না, ম'রে গেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া, রমাপদ চাকরি পেল—"

"পেল ?"—প্রশ্নবোধক শব্দটা যেন মাখন গুপ্তর গলা দিয়ে বেরুলো না, মুখের চামড়া ফেটে বেরিয়ে পড়ল তাঁর। তিনি কোঁচার কাপড় দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন। ঘাম বেরুচ্ছে। হাতের ছড়িটা ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে মাখনবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ গভর্মেণ্টের চাকরি ? বেঙ্গল, না, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট ? আমার চিঠি নিয়ে রমাপদ বুঝি মেজর গ্রীনগ্লাসের সঙ্গে দেখা করেছিল ? আমি জানতুম শশধরবাবু, মেজর গ্রীনগ্লাস কখনও আমার চিঠি ফেলে দিতে পারবে না। মেদিনীপুরে আমি যখন সাব-জজ ছিলুম, গ্রীনগ্লাস ছিল মেদিনীপুরের পুলিস সাহেব। তারপর সে আর্মিতে চ'লে যায়। আমার চিঠিখানা তবে খুবই কাজ দিয়েছে বলুন ? ইংরেজ জাতের চরিত্রই মশাই আলাদা। ওদের কাছে চাকরি ক'রে সুখ আছে। কোন্ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি পেল রমাপদ ?"

"ব্যাঙ্কে।"—বললেন শশধরবাবু।

"ব্যাঙ্কে ?"—মাখবাবুর কণ্ঠে যেন হাহাকারের সুর, "ব্যাঙ্কে ? কোন্ ব্যাঙ্কে ? আমার যা-কিছু টাকা সবই ইম্পিরিয়েলে, সুদ ওয়া দিশী ব্যাঙ্কের চেয়ে অনেক কম দেয় বটে। কিন্তু রমাপদ কোথায় চাকরি পেল ? ছি ছি, আমায় আগে বলেন নি কেন ? ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বড় ম্যানেজার রবার্টসন সাহেব তো আমার খুবই বড় বন্ধু। রমাপদ ব্যাঙ্কে চাকরি নেবে জানলে আমি একটা চিঠি লিখে দিতুম।"

"এম. কম. পাস করেছে, ব্যাঙ্কের চাকরিই ওর পক্ষে ভাল হবে মাখনবাবু।"

"রমাপদ এম. কম. পাস করেছে না কি ? ভেরি গুড। কোন্ ব্যাঙ্কে সে চাকরি পেল ?"

"বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে।"

মাখনবাবু এবার ডান পাশ থেকে উঠে এসে শশধরবাবুর বাঁ পাশে বসলেন। রমাপদ চাকরি পেয়েছে ব'লে মাখনবাবুর উত্তেজনা খুবই বেড়ে গেল। তিনি খুশি হয়েছেন। খুশি হয়েছেন এই জন্যে যে, রমাপদ সরকারী চাকরি পায় নি। পাড়াগাঁয়ের কোন্ এক স্কুল-মাস্টারের ছেলে সরকারী চাকরি পেলে মাখন গুপ্তর চিঠির আর ইজ্জত থাকত না। তা ছাড়া, লেকের ধারে হাওয়া খেতে এসে শশধরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এত অল্প পরিচয়ের

পর শশধরবাবুর অনুরোধে প'ড়েই তিনি গ্রীনগ্লাসের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। পেনশনপ্রাপ্ত সাব-জজ মাখন গুপ্ত মনে মনে হাসছিলেন। ত্রিশ বছর মাস্টারি করলে মানুষ তো আর মানুষ থাকে না। ইংরেজী ভাষার মারপ্যাঁচ বুড়ো মাস্টার বুঝতে পারে নি। চিঠিখানা তিনি এমন ভাবে লিখেছিলেন যে, মেজর গ্রীনগ্লাস পড়লেই বুঝতে পারতেন, দু লাইনের মাঝখানে একটা গোপন অর্থ আছে। অর্থটা হচ্ছে যে, চাকরি দেবার দরকার নেই। নেহাত মুশকিলে প'ড়েই তিনি চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। বুড়ো মাস্টারটা সাব-জজের লেখা ইংরেজী ভাষার গোপন অর্থ বুঝতে পারেন নি ব'লে মাখনবাবু মনে মনে ভীষণভাবে হাসতে লাগলেন।

শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, চুপ মেরে গেলেন যে গুপ্ত মশাই ?"

"চুপ ক'রে রমাপদর কথাই ভাবছি।"—জবাব দিলেন মাখনবাবু।

"রমাপদকে নিয়ে ভাবনার আর কিছু নেই। তিন শো টাকায় শুরু করল, এখন কৃতিত্ব এবং ভাগ্যের জোরে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তা কেবল ভগবানই জানেন।"

"সে কথা ঠিক। রমাপদর বিয়ের কি করবেন ?"—জিজ্ঞাসা করলেন মাখন গুপ্ত।

"সে রমাপদ জানে। এত শিগগির বিয়ে করবার কি দরকার ? তা ছাড়া, আজকালকার ছেলে এবং মেয়েরা বিয়েটাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ব'লে ভাবে। অতএব রমাপদ যতক্ষণ নিজে না তার বিয়ের কথা উত্থাপন করছে—"

বাধা দিয়ে মাখন গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার সেই বিধবা বোনটির কথা মনে আছে কি আপনার শশধরবাবু ? কালকে যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল ? সৌদামিনী প্রায় দশ বছর হ'ল বিধবা হয়েছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন বটে। বালিগঞ্জ রেল-স্টেশনের পুব দিকে কোথায় যেন থাকেন।"

"রেল-লাইনের ওপারে। কসবা। ভাল বন্দোবস্ত মশাই। ট্রাম কিংবা মোটর-বাসের উৎপাত নেই। একটা ঘরের ভাড়া লাগে মাত্র কুড়ি টাকা। হাত বাড়ালেই হাটবাজার। বিপদে-আপদে পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে আসে। সাহায্য করবার সুযোগ না পেলে প্রতিবেশীরা যেন মনে মনে দুঃখই পায়। ও-অঞ্চলটা এখনও একটু প্রিমিটিভ, লেখাপড়ার চর্চা তেমন নেই।"

"তা না থাক্, চরিত্র থাকলেই হ'ল। আমাদের অঞ্চলে, মানে কেয়াতলা লেনই বলুন আর আপনার হিন্দুস্থান পার্কই বলুন, সর্বত্রই লেখাপড়ার চর্চা খুবই বেড়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু শিক্ষা তেমন বাড়ছে না। শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে চরিত্রগঠন।"—এই ব'লে শশধরবাবু উঠলেন। লেক অঞ্চলের চতুর্দিকে মিলিটারিদের থাকবার জন্যে লম্বা লম্বা সব ব্যারাক তৈরি হয়েছে। পাকা বাড়ি নয়, টালির ঘর। শশধরবাবু দেখলেন, টালির ওপর এরই মধ্যে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে ব'সে সূর্য এখনও দেখা যাচ্ছে না। পেনশনপ্রাপ্ত সাব-জজ মাখন গুপ্তর মত মানুষ পাশে থাকলে কেউ কোনদিন সূর্য দেখতে পাবে ব'লে বিশ্বাস করেন না শশধরবাবু। মাখনবাবুরা কোনদিনই সূর্য দেখতে পান নি। কসবার আকাশে যে আলোর সম্ভার নিয়ে এই মুহূর্তে সূর্য উপস্থিত হয়েছে, মাখনবাবুরা তাকে প্রিমিটিভ বলেন।

আবার একটা মিলিটারি কন্‌ভয় আসছে পুব দিক থেকে। এটা চ'লে না যাওয়া পর্যন্ত শশধরবাবু রাস্তা পার হতে পারবেন না মনে ক'রে স'রে এলেন লেকের কিনারার দিকে। মাখন গুপ্তও তাই করলেন। কন্‌ভয়ের জন্য নয়, কি একটা কথা বলবেন ব'লে মাখন গুপ্ত দাঁড়ালেন এসে শশধরবাবুর কাছে। কথাটা জরুরী। সৌদামিনীর মেয়েটা বড় হয়েছে। আসছে বছরই তো সে আই. এ. পরীক্ষা দেবে। আই. এ. পরীক্ষা দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়; পাস করা তো আরও সোজা। কিন্তু পরীক্ষার ফী যোগাড় করাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন কাজ। সৌদামিনী কসবা থেকে হিন্দুস্থান পার্ক পর্যন্ত হাঁটা-হাঁটি করবে অনেকবার। শেষ পর্যন্ত পেনশনের টাকা থেকে পরীক্ষার ফী দিতে হবে মাখনবাবুকেই। ক টাকাই বা তিনি আর পেনশন পান? কয়েক শো টাকা মাত্র। পেনশনপ্রাপ্ত সাব-জজের জীবনে টাকার অভাব যে কত বড় অভাব সৌদামিনী তা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না ওর মেয়েটাও। মামার দোতলার ঘরে যেন টাকার খনি আছে মনে করে মাধু। মাঝে মাঝে মাধুরী আসে মাখনবাবুর কাছে। গেল বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে মাধুরী একদিন এসেছিল। অভিযোগ করেছিল যে, ওর নাকি লেখাপড়া হচ্ছে না। নোট-বই কেনবার পয়সা নেই।

"কটা টাকা আমায় দিতে হবে মামা। নইলে আমি ভাল ক'রে পাস করব কি ক'রে?"

"পাস করলেই হ'ল মাধু। ভাল ক'রে পাস করবার দরকার কি? তা ছাড়া, নোট-বই প'ড়ে কে কবে ভাল ক'রে পাস করেছে?"

"অনেকেই মামা। যাঁরা দিনরাত গাড়ি হাঁকাচ্ছেন আর মুড়ি-মুড়কির মত পয়সা কামাচ্ছেন, তাঁরা সবাই নোট-বই পড়েছেন। তোমার বাড়ির দুখানা বাড়ি পরে যে চারতলা ম্যানসনটা উঠেছে, তার মালিকের ইতিহাস জান মামা?"

"না তো!"

"পাইকারী ভাবে নোট লিখে তিনি যেমন লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তেমনি তিনি আবার একটা ম্যানসনও তৈরি করেছেন। এক-এক তলায় তিনটে ক'রে ফ্ল্যাট।"

"তাই না-কি? ভাগ্যিস সার্ আশুতোষ মরবার আগে ম্যানসনটা দেখে যেতে পারেন নি!"

"দেখলে কি হত মামা?"

"ডিনামাইট দিয়ে কলেজ স্ট্রীটে একটা হ্যাভোক স্মষ্টি ক'রে যেতেন। 'দ্বারভাঙ্গা'র উঁচু মাথা ভেঙে পড়ত, ধুলো হয়ে যেত। অল্প হাওয়ায় হাজার হাজার মণ ধুলো কোন্ দিকে যে উড়ে যাচ্ছে তাও তিনি দেখে যেতে পারতেন। একটা গল্প শুনবি মাধু?"

"না মামা। নোট কেনবার জন্যে পাঁচটা টাকা দাও। গল্প ব'লে তুমি আমায় টাকার কথা ভুলিয়ে দিতে চাইলে কি হবে, আমি কিছুতেই ভুলব না। কসবা থেকে হেঁটে এসেছি, পা আমার জ্বালা করছে। পাঁচ টাকা ছাড়াও আমায় চারটে পয়সা বেশি দিতে হবে। ফেরবার সময় বাসে চেপে যাব। সেলাই-ফোঁড়াই ক'রে মা যা রোজগার করেন, তাতে আমাদের চলে না।"

"কেন, আমি তো তোদের মাসে মাসে চল্লিশটা ক'রে টাকা দিই।"

"তাতে আমাদের খুবই উপকার হয়। দু বেলা ডালভাত জোটে। লেখা-পড়া করতে আমার পয়সা লাগে না, নইলে দু বেলা আমাদের ডালভাতও জুটত না। গেল মাসে চল্লিশ দাও নি, পঁয়ত্রিশ দিয়েছ।"

"একেবারে কিছুই দিতে পারব না ভেবেছিলুম। গোটা বাড়িটায় চুনকাম করাতে হয়েছে। হ্যাঁ রে মাধু, তোর বিয়ের জন্য যে পাঁচ হাজার টাকা তোর বাবা রেখে গিয়েছিলেন, সেটা কোথায়?"

"পোস্ট অফিসে।"

"না না, ওখানে আর ক টাকাই বা সুদ পায়! আমি ও-টাকাটা বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে ফিক্স্‌ড ডিপোজিট রেখে দেব। শতকরা ন টাকা ক'রে সুদ দিচ্ছে ওরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক ফেঁপে উঠেছে কোলাব্যাঙের মত। শতকরা ন টাকা ক'রে সুদ পেলে পাঁচ হাজার টাকায় বছরে কত টাকা হয়?"

"চার শো পঞ্চাশ।"

"মাসে কত ক'রে পড়ল?

"সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা।"

"অঙ্কে দেখছি মাথা তোর খুব ভাল। মেয়েরা নাকি অঙ্কে ভাল হয় না!"

"আমি তো পরীক্ষায় নব্বুইয়ের কম নম্বর পাই না।"

"তা হ'লে চল্, তোর মার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। মাসে সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা ক'রে এলে তোর আর নোট কেনবার অসুবিধে হবে না। চারতলা ম্যানসনটা পাঁচতলা হবে—তা হোক। চল্, এক্ষুনি একবার যাই।"

"পাঁচটা টাকা আগে বার কর মামা।"

বাধ্য শেষ হয়ে পর্যন্ত মাখনবাবুকে পাঁচটা টাকা বার করতে হ'ল। মাধুরীর হাতে টাকা পাঁচটা দিতে তাঁর প্রায় আধঘণ্টা সময় নষ্ট করতে হয়েছে। মনিব্যাগে তাঁর পাঁচ টাকার নোট ছিল না। সব এক টাকার নোট। বার পাঁচেক গুনে গুনে দেখলেন তিনি। পাঁচের বদলে ছখানা নোট বেরিয়ে যাওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। গোনা শেষ হওয়ার পরে তিনি প্রতিটি নোট দু আঙুল দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে টিপে টিপে পরীক্ষাও করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বয়স এমন কি বেশি হয়েছে, এরই মধ্যে ভেজালের বন্যায় দেশ প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম। কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। পাঁচখানা নোটের সঙ্গে ছখানা চ'লে যাওয়া বিচিত্র নয়।

"মাধু,"—কসবার দিকে হাঁটতে হাঁটতে মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মাধু, সুদের হিসেবটা ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ মামা। বাড়ি চল, অঙ্ক ক'ষে তোমায় আমি দেখিয়ে দেব।"

"মনে মনে আর একবার অঙ্ক ক'ষে দেখ্ না।"

মাধুরী মামার পাশে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে অঙ্ক কষতে লাগল। শতকরা

ন টাকা হ'লে, হাজার টাকায় নব্বুই টাকা। নব্বইকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হয় চার শো পঞ্চাশ।

"এক বছরেব পুরো সুদ হয় চার শো পঞ্চাশ, বুঝলে মামা?"

"বুঝেছি। এবার চার শো পঞ্চাশকে বারো দিয়ে ভাগ কর্।"

"করছি।"

মাখনবাবু দেখলেন, ভাগ করবার আগেই তিনি গড়িয়াহাট বাজার পার হযে গেলেন। ভাগ শেষ হতে হতে বালিগঞ্জ রেল-স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে। তারপরে সেখান থেকে কসবা তো দু কদমের রাস্তা। বাসে চেপে এলে দু আনা পয়সা নষ্ট হ'ত ঝুটমুট। অঙ্ক কষতে কষতে মাধুরীও পায়ের জ্বালার কথা ভুলে গেল।

কসবা পর্যন্ত পাযে হেঁটে পৌঁছবার পরে একটা বছর পার হয়ে গেছে। মাধুরী কলেজে পডছে। সেখানেও তাকে মাইনে দিতে হয় না। মাধুরী বৃত্তি পেযেছে। ওর বিয়ের টাকাটা মাখনবাবু পোস্ট অফিস থেকে তুলে এনে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে ফিক্স্ড্ ডিপোজিট রেখেছেন। গতমাসের পনেরো তারিখে সৌদামিনী দেবী চার শো পঞ্চাশ টাকা সুদ তুলে এনেছেন। মাখনবাবু নিজেই তাঁর সঙ্গে গিযেছিলেন। দিনকাল ভাল নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোলাবারুদে কোথায যে কি পুড়ল তা তিনি জানেন না; কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে মাখনবাবুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পানের দোকানেও হাজাব টাকার নোট ভাঙানো চলে! শ টাকার নোটের ইজ্জত তো নস্যির মত উবে গেছে অনেক দিন আগেই। রাস্তায় সৎলোকের সংখ্যার চেযে জুয়াচোরের সংখ্যা অনেক বেশি। রাম-শ্যাম-যদুর পকেট-ভর্তি শ টাকার নোট। পকেটমারের ব্যবসা ফেঁপে না উঠলে এমন কাণ্ড ঘটতে পারত না।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিযে এসে মাখনবাবু বললেন, "সদু, টাকাগুলো আঁচলে ভাল ক'রে বেঁধে রাখ্। কটা গিঁট দিয়েছিস?"

"একটা দাদা।"

"না না, সর্বনাশ! করেছিস কি? রাস্তায় ভিড় দেখতে পাচ্ছিস না? একটা গিঁট দিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, টাকাগুলো ধ'রে রাখতে পারবি না সদু। গোটা পাঁচেক গিঁট বাঁধতে হবে।"

মাখনবাবুই ব্যাঙ্কের দরজায় দাঁড়িয়ে সৌদামিনী দেবীর আঁচলে গিঁট বেঁধে দিলেন। এমনভাবে বাঁধলেন যে, বাড়ি গিয়ে সৌদামিনী দেবী হয়তো দাঁত দিয়েও গিঁট খুলতে পারবেন না। কাঁচি দিয়ে টাকা-বাঁধা আঁচলের অংশটা কেটে ফেলতে হবে। তা হোক, মাখনবাবু এবার নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। গডরেজ কোম্পানির সিন্দুকের চেয়েও সদুর আঁচল নিরাপদ হ'ল্।

"আঁচলের কোণটা এবার ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে রাখ্ সদু।"

"কেন দাদা? মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখেছি।"

"মুঠো? ইংরেজ তার সবটুকু সামর্থ্য দিযে সাম্রাজ্যটা ধ'রে রাখতে পারছে না, আর তুই মুঠোর মধ্যে চার শো পঞ্চাশ টাকা ধ'রে রাখবি কি ক'রে সদু?"

"দাদা—"

"মাসে সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা ক'রে খরচ করবি। একটি পয়সাও যেন বেশি খরচ না হয়। এতগুলো টাকা আমিই তোকে পাইয়ে দিলাম, মনে রাখিস।"

"এখানে বড্ড ভিড় দাদা। চল, একটু ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াই।"

"দাঁড়াবার আর দরকার কি, একেবারে বাসে চেপে বসব। পার্ক স্ট্রীটের ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে আমার একটু কাজ আছে। আমার একটা দশ হাজার টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট বোধ হয় পেকে এসেছে। তবে এরা সুদ দেয় বড্ড কম। বিলিতী ব্যাঙ্ক কি না।"

"ইংরেজদের শোষণ কবে যে শেষ হবে, একমাত্র গান্ধীজীই জানেন।"—ব'লে বসলেন সৌদামিনী দেবী।

"তিনিই বা জানবেন কি ক'রে সদু? গান্ধীজী তো জেলে! তা ছাড়া, বেশী সুদ খাওয়ার লোভ আমার নেই; বয়েস হয়েছে, বত্রিশটা দাঁতের মধ্যে মাত্র ওপর-নীচে চারটে দাঁতই আসল, আর সবগুলো তো নকল দাঁত সদু। শতকরা ন টাকা সুদ খাওয়ার মত বয়স আমার নেই। তোর কথা অবিশ্যি আলাদা। ইংরেজের ওপর মাধুরীর যা রাগ, তাতে ইংরেজের ব্যাঙ্কে টাকা রাখা তোর চলে না। ম্যাট্রিক পাস করবার পরেই মাধু যে সব কথাবার্তা বলে, তার প্রত্যেকটি উচ্চারণ পর্যন্ত সিডিশন! সদু, এবার বিয়েটা ওর দিয়ে ফেল্।"

"বড্ড ভিড় দাদা, ক নম্বর বাসে উঠবে?"

"উঠলেই হ'ল যে কোন একটা নম্বরে। শোন্, সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা যখন তোর আয় বাড়ল, তখন আমার নিজের ব্যয় একটু কমাতে হবে। বুড়ো বয়সে টাকার অভাবে যদি কষ্ট পাই, তা হ'লে ভগবান পর্যন্ত আমায় অভিশাপ দেবেন। আসছে মাস থেকে চল্লিশের বদলে দেব ত্রিশ টাকা ক'রে। তোকে দেখে-শুনেই তো বিয়ে দিয়েছিলাম। যেমন তার স্বাস্থ্য ছিল, চাকরিও করত সে তেমনি ভাল। আমার ইচ্ছামত তো সংসারে সব কিছু চলছে না। হঠাৎ সে মারা যাবে, আমিই বা কি ক'রে জানব বল্? তবুও তো তার হঠাৎ-মৃত্যুর দুঃখের অংশ আমি নিয়েছি। চল্লিশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার দশটা টাকা আমি কমিয়ে দেব।"—এই ব'লে মাখনবাবু বাসে উঠলেন। মেয়েদের আগে পুরুষদের যে উঠতে নেই, তেমন একটা সহজ ভদ্রতা পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে শিখতে পারেন নি। সৌদামিনী দেবী বাসে উঠলেন মাখনবাবুর পরে। দশ টাকা কমিয়ে দেবার নূতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেলেন না সৌদামিনী দেবী।

কন্‌ভয় চ'লে গেছে। চ'লে যেতে সময় লাগল। মস্ত বড় কন্‌ভয়। শশধরবাবু মস্ত বড় কন্‌ভয়টা চ'লে যেতে দেখলেন। দু-চারজন বাঙালী সামরিক কর্মচারীও যেন কন্‌ভয়ের সঙ্গে ছিল ব'লে মনে হ'ল শশধরবাবুর। সারা জীবন তিনি মাস্টারি করেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার কাজই ছিল তাঁর। এর চেয়ে মহত্তর কাজ দুনিয়ায় আর কিছু আছে কি না তা তিনি জানেন না। জানবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি তিনি। বণিক অফিসের দারোয়ানদের চেয়েও কম মাইনে পেয়েছেন ব'লে কত লোকই তো তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে! তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ শশধরবাবু গায়ে মাখেন নি। লজ্জিত বোধ করেন নি অভাবের দুর্বলতম মুহূর্তেও। দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার পবিত্রতম কর্তব্য যাঁর কাছে ধ্যান-ধারণার বিষয়বস্তু ছিল, তাঁর লজ্জিত হওয়ার সত্যিই কোন কারণ ছিল না। তিনি যে তাঁর কর্তব্য শেষ ক'রে আসতে পেরেছেন, সেইটেই শশধরবাবুর কাছে আজ সবচেয়ে বেশি মাইনে পাওয়ার গৌরবের মত মনে হয়। তাঁরই হাতে গড়া বিভূতি বিশ্বাস আজ সামরিক কর্মচারী হয়েছে। বড় অফিসার। ওই কন্‌ভয়ের সামনে মোটর সাইকেলে চেপে তিনি তাকেই যেতে দেখেছেন একটু আগে। সাম্রাজ্যলোভী হিটলারকে

ধ্বংস করবার মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছে বিভূতি। ভাগীরথীর বিলুপ্তপ্রায় সভ্যতার নরম মাটিতে বিভূতি সত্যের সামরিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনছে। বাংলার ছেলে কন্‌ভয় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৃদঙ্গের শোভাযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় এ নয়। সাম্রাজ্যবাদীর সর্বগ্রাসী মুখব্যাদানের মধ্যে মৃদঙ্গের চাঁটি কাজ করবে না—কামানের শোভাযাত্রা তাই বিভূতি আজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লম্বা কন্‌ভয়টার মধ্যে শশধরবাবু একটা অতিস্পষ্ট চারিত্রিক মেরুদণ্ড দেখতে পেলেন। তাঁরই ছাত্র বিভূতি, এবং বিভূতির চরিত্রও বাংলার নরম মাটিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে ব'লে শশধরবাবু মনে মনে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। কাগজের টাকা কমলো কি বাড়ল, তাতে কি যায়-আসে? জাতি-চরিত্র তৈরি হয় শিক্ষামন্দিরে, ছাপাখানায় নয়।

পূর্বদিকের রাস্তা ধ'রে শশধর সেন আর মাখন গুপ্ত চ'লে এলেন হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তার মোড় পর্যন্ত। বাঁ দিকে ঘুরলেই কেয়াতলা লেনের শুরু। বড্ড সরু রাস্তা। বড়লোকেরা সব সস্তায় জমি কিনে রেখেছেন। কেউ বাড়ি এখন তৈরি করছেন না। প্রতি খণ্ড জমি এ-মাসে ও-মাসে হাত বদলে যাচ্ছে। ফাটকাবাজারের মত জমির দাম বাড়ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। হিটলারের পরাজয় এখন পর্যন্ত কেউ দেখতে পাচ্ছে না ব'লেই কেয়াতলা লেনের জঙ্গল সাফ হ'ল না। শশধরবাবু জানেন, কেয়াতলা লেনের ভাগ্য হিটলারের ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। তাঁর পতন না হওয়া অবধি এখানকার জমির দামও পড়বে না।

শশধরবাবু বললেন, "আজ তা হ'লে চলি।"

"একটু দাঁড়ান। চলুন না, আমার বাড়িটা একবার দেখে আসবেন। এখান থেকে দু মিনিটের রাস্তা।"—অনুরোধ করলেন মাখন গুপ্ত।

"বেশ তো, যাওয়া যাক। চলুন। রমাপদ আজই কাজে যোগ দেবে।"

"তা দিক, এখন সম্ভবত সাতটাও বাজে নি।"

মাখনবাবুর বাড়িটা তেমন বড় নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগেই তিনি তিন কাঠা জমি কিনে রেখেছিলেন। হ্যাঁ, তা অনেক আগেই হবে। এ অঞ্চলে তখন কেয়াতলা লেনের চেয়েও বড় জঙ্গল ছিল। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যেত। বোধ হয় সেই কারণেই জলের দামে তিনি জমিটুকু কিনতে পেরেছিলেন। এখন তো তিন কাঠার

দাম ত্রিশ হাজার! বাড়ি তৈরি করবার সময় এক ইঞ্চি জমি তিনি নষ্ট করেন নি। একেবারে রাস্তার ওপর থেকে ইটের ওপর ইট সাজিয়ে লম্বা ধাঁচের বাড়ি তুলেছেন মাখন গুপ্ত। দূর থেকে অনেকটা গম্বুজের মত দেখায়। তিন কাঠার মধ্যে দেড় কাঠা জমি তাঁকে বেচে ফেলতে হয়েছে। না বেচলে তাঁর বাড়ি তৈরির সময় ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা বার করতে হ'ত। তা ছাড়া, কাঠা-প্রতি তিনি মাত্র দু শো ক'রে খরচ করেছিলেন, যুদ্ধের মুখে সেই কাঠারই দাম হ'ল সাত হাজার। খবরটা তিনি পেলেন বর্ধমানে ব'সেই, কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার ঠিক তিন মাস আগে। এমন একটা খবর শুনলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরও ধ্যান ভেঙে যেত, আর মাখনবাবু তো একজন সাব-জজ।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এত বড় কোলাপ্‌-সিব্‌ল্‌-গেট লাগিয়েছেন কেন? ব্যাঙ্কের বাড়ির মত মনে হয়। গুটি পাঁচেক হাতী-মার্কা তালাও ঝুলছে। সৌন্দর্যের দিকে একটু দৃষ্টি রাখলে ভাল হ'ত।"

"সৌন্দর্য দিয়ে চোর-ডাকাত ঠেকাব কি ক'রে মশাই?"

"এখানে চোর-ডাকাতের উৎপাত বুঝি খুব?"

"ভগবানের কৃপায় এখনও তারা এসে হানা দেয় নি বটে, কিন্তু দিতে কতক্ষণ? মিসেস গুপ্ত অনেক সময়ই একলা থাকেন, তা ছাড়া, আজকাল চোর-ডাকাতদের চেহারা দেখে ধরা যায় না। কখন্‌ কোন্‌ সময়ে কি রূপ নিয়ে যে তারা আসবে, কেমন ক'রে বুঝব? কি দিনকালই না পড়েছে মশাই!"

"আপনার কথা শুনে তাই-ই মনে হচ্ছে। আমাদের কেয়াতলা লেনে এখনও অনেক জঙ্গল রয়েছে, মাঝে মাঝে গিন্নী নাকি শেয়ালের ডাকও শুনতে পান। কিন্তু ছদ্মবেশী চোর-ডাকাতের উৎপাত খুব কিছু একটা নেই। আপনাদের এ সব অঞ্চলে ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা, ধন-দৌলতের জাঁকজমক খুব বেশি ব'লেই চোর-ডাকাতেরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। মাখনবাবু, এ পাড়ার অভাব বড্ড সর্বনেশে অভাব।"

"অভাব?"—একটা হেঁচকা টান দিয়ে প্রশ্ন করলেন মাখন গুপ্ত, "আপনি এখানে অভাব দেখলেন কোথায়? কলকাতার প্রত্যেকটা রাস্তাই তো এখন এক-একটা ক্লাইভ স্ট্রীট! কি না কারবার চলছে এখানে বলুন? বুট্‌স্‌ কোম্পানির কুইনিন ক পাউণ্ড চাই? চার শো পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আসুন, এক পাউণ্ড পেয়ে যাবেন। দাম শুনেই তো ম্যালেরিয়া জ্বর পগার পার।

আমার চাকরটা গিয়েছিল কেষ্টনগরে। সেখান থেকে সে ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরল। শচীন ডাক্তার কুইনিন মিকশ্চার খাওয়াতে লাগল। জ্বর তবু ছাড়ে না। কেষ্ট যা আমার কাছে মাইনে পায়, তাতে ষাট দাগ কুইনিন মিকশ্চার কিনতেই টাকা সব ফুরিয়ে গেল। মিসেস গুপ্ত একদিন বললেন যে, মিকশ্চারের মধ্যে কুইনিন নেই, সব ময়দা।"—এই পর্যন্ত ব'লে মাখনবাবু ডান দিকের পকেট হাতড়ে একটা চাবি বার করলেন। সকালবেলা লেকের দিকে হাওয়া খেতে যাবার সময় তিনি বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যান। গেটের তালা খুলতে খুলতে তিনি বললেন, "আসুন, ভেতরে ব'সে আলাপ-আলোচনা করি। কুইনিন বড্ড সংঘাতিক জিনিস মশাই। পুলিসের লোক এখান দিয়ে ঘোরা-ফেরা করে। এ পাড়ার বউ-ঝিরাও গোপনে গোপনে কুইনিনের ব্যবসা চালাচ্ছে।. কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বুট্‌স কোম্পানির কুইনিনের দর কত ছিল জানেন?"

"না।"—জবাব দিলেন শশধরবাবু। মাখন গুপ্ত পুনরায় তালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। শশধরবাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস ক'রে তিনি বললেন, "চার শো পঞ্চাশ। আজকে পাঁচ শো হতে পারে। কিছু টাকা লাগিয়ে রাখবেন নাকি?"

সস্তাদরের বেতের ছড়িটা শশধরবাবুর হাতে একটু যেন ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠল। ম্যালেরিয়া-জ্বরের মত হঠাৎ বোধ হয় বেতটারও জ্বর এসেছে। হাতের তালুতে উত্তাপ অনুভব করলেন শশধর সেন। কিন্তু বুট্‌স্ কোম্পানির কুইনিনের সাধ্যই নেই এ উত্তাপ তাঁর কমিয়ে দিতে পারে। ত্রিশ বছর মাস্টারি করবার পরে আজ আবার তাঁর ইস্কুলে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল।

"তা হ'লে আমি চলি।"—বললেন শশধরবাবু।

"এলেনই যখন, একটু চা খেয়ে যান: মিসেস গুপ্ত হয়তো এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছেন।"—এই ব'লে মাখনবাবু এবার সত্যি সত্যি লোহার গেটের তালা খুললেন। খোলবার আগে তিনি রাস্তার দু দিকটা ভাল ক'রে একবার দেখে নিলেন। না, কেউ কোথাও নেই। থাকলেও সন্দেহজনক লোক কেউ আছে ব'লে তাঁর মনে হ'ল না।

"বাইরে থেকে জেলখানার মত মনে হয় বটে, কিন্তু দক্ষিণ দিকটা খোলা। লেক অঞ্চল থেকে হু-হু ক'রে বাতাস আসে।"—বললেন মাখন গুপ্ত।

"স্বাস্থ্যের পক্ষে খোলা বাতাসই সবচেয়ে ভাল। আমি চলি মাখনবাবু। রমাপদ আজই যাচ্ছে কাজে যোগ দিতে। অন্য একদিন আসব।"

"বেশ, তাই হোক। রমাপদর মাইনে যেন কত?"

"শুরু করছে তিন শো টাকায়।"

"বাঃ, বেশ। তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবকের পক্ষে তিন শো টাকা মন্দ নয়। স্বামী-স্ত্রী দুজন হ'লে তিন শো টাকায় খুবই ভাল চ'লে যাবে। তা হ'লে কসবা যাচ্ছেন কবে শশধরবাবু?"

"কসবা? কসবায় গিয়ে কি হবে মাখনবাবু? ভাবছিলুম আবার আমি আমার পুরনো ইস্কুলেই ফিরে যাব। আপনার-আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

"যাক, আপনি তো আদার ব্যাপারী—মানে, আপনি হচ্ছেন গিয়ে মাস্টার, সিন্‌কোনা চাষের খবর রেখে আপনার কি দরকার মশাই? মংপু ব'লে একটা জায়গার নাম শুনেছেন? ওঃ, ভুলে গিয়েছিলাম যে, আপনি হচ্ছেন ইতিহাসের শিক্ষক। মংপু হচ্ছে ভূগোলের ব্যাপার। নাম শোনেন নি শশধরবাবু?"

"হ্যাঁ, দার্জিলিং থেকে উত্তরে। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন সেখানে বোধ হয় ছিলেন।"

লোহার গেটটা খোলা রেখে মাখন গুপ্ত পুনরায় নেমে এলেন রাস্তায়। চোখ দুটোকে যথাসাধ্য বিস্ফারিত ক'রে তিনি বললেন, "আরে মশাই, আপনি দেখছি জাতমাস্টার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হৈ-হল্লার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন গিয়ে কবিতা। 'চয়নিকা'র পাতা সেদ্ধ করলে কুইনিন বেরুবে না, কিন্তু সিন্‌কোনার ছাল সেদ্ধ করলে—। কি মশাই, চুপ মেরে গেলেন যে? রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন গিয়ে সাহিত্য, আর সিন্‌কোনা হচ্ছে কুইনিন। মংপুতে সিন্‌কোনার প্রচুর চাষ হয়। বাংলা সরকারের অফিস আছে সেখানে।" মাখন গুপ্ত এবার হাঙরের মত ঠোঁট দুটোকে খুব কঠিনভাবে চেপে ধ'রে মুখটা টেনে নিয়ে এলেন শশধর সেনের কান অবধি। তার পরে রাস্তার দু দিকটা আবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে তিনিই বললেন, "বাজারে বিলিতী কুইনিন আর নেই মশাই। মংপু থেকে দিশী কুইনিন আসছে। ময়দার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সেই রদ্দি মালই বিলিতী প্যাকেটের

মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল অবনী দালালদের দোষ দিলে চলবে কেন, এ অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা সবাই অল্প-বিস্তর কুইনিনের কারবার চালাচ্ছে। বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারবেন না। বাড়িঘর সব সাজানো গোছানো। কোথাও একগাছা বুনো ঘাস পর্যন্ত গজাতে পারে না। কিন্তু শাবল দিয়ে কোপ মারুন, সিমেণ্টের মেঝে থেকে কি বেরুবে?"

"কি বেরুবে?"—পাল্টা প্রশ্ন করলেন শশধরবাবু।

"কুইনিন, করোগেটেড শীট, চালের বস্তা, হরলিক্‌স্ এবং হরেক রকমের দামী দামী ওষুধ। মিসেস গুপ্তর ডায়বেটিস হতে পারে ভেবে আমি তো মশাই বেশ কিছু ইনসুলিন স্টক ক'রে রেখেছি।"

"হ্যাঁ, ভালই করেছেন। ডায়বেটিস যদি না হয় তবে সুবিধে দরে বেচেও ফেলতে পারবেন। মন্বন্তরের ভয়ে চাল স্টক করাও ভাল। মেঝের সিমেণ্ট ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে সিমেণ্টই বা স্টক করবেন না কেন?"

"তা যা বলেছেন!" মাখন গুপ্ত গলার সুর বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কসবা যাচ্ছেন কবে? মাধুরী দেখতে সুন্দরী, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট। ফার্স্ট ক্লাস চরিত্র। মেয়েটিকে একবার দেখে আসুন। কবে যাবেন? আসছে শনিবারে আপনার সুবিধে হবে কি সেন মশাই?"

"আপনি ব্যস্ত মানুষ, আপনার সুবিধে হ'লেই হ'ল। বেশ তো, মেয়েটিকে একদিন দেখে আসা যাবে। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।"

"তা হ'লে সদুকে আমি আজই খবরটা দিয়ে আসব। সেন মশাই—" হঠাৎ থেমে গেলেন মাখন গুপ্ত। কি একটা গোপন কথা তাঁর মনে পড়েছে। —"সেন মশাই, এতে ভাবনার কিছু নেই। মাধুরীর বিয়ের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা মজুত আছে। আর আছে তা ওই বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে। দরকার থাকলে পাঁচ হাজার টাকা আপনি ক্যাশও নিতে পারেন।"

"না, আমার নিজের জন্যে এক পয়সাও দরকার নেই। ওপারের ডাক কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, টাকা-পয়সার প্রতি আর লোভ না থাকাই ভাল। বেশ, রমাপদকে সব কথাই আমি জানিয়ে দেব। আমাদের বাড়ি আপনিও একদিন আসুন।"

"যাব, নিশ্চয়ই যাব। ফ্যালনা সম্পর্ক তো নয়! অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। এখান থেকে ঢিল ছুঁড়লেই তো কেয়াতলা লেনে গিয়ে পৌঁছয়।

গলিটায় বড্ড বেশি জঙ্গল হয়ে রয়েছে। সেই জন্যে যাব যাব ক'রেও আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

জঙ্গলগুলো যদি সিন্‌কোনা গাছ হ'ত, তা হ'লে মাখন গুপ্তর কাছে কেয়াতলা লেন নিশ্চয়ই দূর মনে হ'ত না—ভাবলেন শশধরবাবু। তিনি আরও অনেক রকমের কথাই ভাবছিলেন। ত্রিশ বছর চাকরি করার পরে, ইস্কুল থেকে তাঁর বেরিয়ে আসা উচিত হয় নি।

ইস্কুল ছাড়বার সময় ঘরের চাল দিয়ে জল পড়তে দেখে এসেছিলেন তিনি। গত বর্ষায় ছেলেদের যেন কত কষ্টই না হয়েছে! ফুটো টিনগুলো বদলাবার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। বদলার জন্যে হেডমাস্টার মশাই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু গেল বছর টিন কিংবা এ্যাসবেসটসের দাম ছিল আগুনের মত। বাংলা দেশের ক'টা ইস্কুলেরই বা ক্ষমতা আছে এত পয়সা খরচ ক'রে ঘর মেরামত করবার? ইস্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করবার আগে তিনি অন্তত পারেন নি মেরামতের কাজটা শেষ ক'রে দিয়ে আসতে। এ বছরই বা হেডমাস্টার মশাই পারবেন কি ক'রে? দাম আরও বেড়ে গেছে। দামের আগুন নিবিয়ে দেবার মত দমকল বাংলা দেশে আর নেই। এ সব ভদ্রপাড়ার বাড়িগুলোর মেঝেতে কেউ যদি শাবল মারতে পারে, তবে বোধ হয় ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টিন আর এ্যাসবেসটস বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তিনি নিজে আজ বুড়ো হয়ে গেছেন। ষাটের ওপরে বয়স হয়েছে। শাবল ধরবার মত হাতে তাঁর আর শক্তি নেই। রমাপদকে দিয়ে হয়তো শাবল মারবার কাজটা করানো যেত। কিন্তু তাও আর হ'ল না। রমাপদ আজ থেকেই কলম ধরতে যাচ্ছে। যাচ্ছে সহকারী অ্যাকাউণ্টেণ্ট হয়ে বিশ্ব-বিহার ব্যাঙ্কে। মিথ্যে হিসেবের অঙ্ক কষতে কষতে রমাপদকেও একদিন হয়তো প্রবেশ করতে হবে পাতালে। শহর কলকাতার মাটির নীচের খবর সে এখনও রাখে না। রমাপদ জানে না, সেখানে একটা বিরাট আয়তনের গুপ্ত গুদাম তৈরি হয়েছে। কোটি কোটি শিশু আর পীড়িত মানুষ ওষুধের অভাবে ম'রে যাচ্ছে ভারতবর্ষের মাঠে ময়দানে। রমাপদর হিসেবের অঙ্কে তাদের কোন পরিচয় থাকবে না—থাকবে না তাদের অকাল-মৃত্যুর অজ্ঞাত ইতিহাসও।

"তা হ'লে এবার আমি চলি। নমস্কার।"—বললেন শশধরবাবু।

"একটু দাঁড়ান। রমাপদর যেন কত টাকা মাইনে হয়েছে বললেন ?"

"তিন শো। তিন হাজার হতেও সময় লাগবে না মাখনবাবু। ভাবনার কিছু নেই। এম. কম. পরীক্ষায় রমাপদ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এ যুগের হিসেব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রমাপদর গভীর এবং বিস্তারিত জ্ঞান আছে। এখন কেবল প্রকাশ্য হিসেবের সঙ্গে গুপ্ত গুদামের হিসেবটা মিলিয়ে দেবার অভিজ্ঞতা যদি অর্জন করতে পারে, তা হ'লে কেয়াতলা লেনের বুনো ঘাসগুলো সিন্‌কোনা গাছে রূপান্তরিত হতে সময় লাগবে না। মাখনবাবু, ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে আপনার কেষ্টর ম্যালেরিয়া আর সারবে না। ওকে বরং খালি গায়ে ময়দানে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলুন। সূর্যের আলোয় হয়তো অসুখ-বিসুখ সেরে যেতে পারে।"

"তা যা বলেছেন। কাল থেকে আমি তো ওকে গঙ্গাজল খাওয়াচ্ছি।"

"ভাগীরথীর বিশুদ্ধ জল যদি যোগাড় করতে পারেন, তা হ'লে গোটা বাংলা দেশের সব রকম রোগই সেরে যাবে।"

"ও কি, চ'লে যাচ্ছেন যে ? রমাপদর নিয়োগপত্রটা কি সঙ্গে এনেছেন ? আই মীন, মাইনের কথাটা নিশ্চয় তাতে লেখা আছে ?"—মাখনবাবু এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

"তা আছে।"—এই ব'লে শশধরবাবু ডান দিকের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করলেন। বার ক'রেই তিনি হাতটা তাঁর মাখনবাবুর দিক থেকে টেনে নিয়ে বললেন, "ভুল হয়ে গেছে। নিয়োগপত্রটা ফেলে এসেছি। এটা আপনারই লেখা চিঠি মেজর গ্রীনগ্লাসের কাছে। কাজে যখন লাগল না, আপনি এটা ফিরিয়ে নিন।"

মাখন গুপ্ত ফিরিয়ে নিলেন চিঠি। লোহার গেটের ফাঁকটুকুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে লতিকা বলল, "দাদু, ভোর ছটার সময় অবনী দালাল এসেছিল।"

ঘুরে দাঁড়ালেন শশধরবাবু। মেয়েটিকে দেখলেন তিনি। মেয়েটির হাতে একখানা ইংরেজী দৈনিক কাগজ। মাখন গুপ্তর গেটের ফাঁক দিয়ে বাংলা কাগজ কোনদিনও ঢুকতে পারে নি। মাখন গুপ্ত এবার শশধরবাবুকে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "আমার বড় ছেলে প্রভাসের মেয়ে। ডাকনাম লতু। অন্য একদিন আলাপ হবে শশধরবাবু। নমস্কার।" শশধরবাবু এর পরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন

না। যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন তিনি। লতিকা তবু বললে, "দাদু, অবনী দালাল খবর দিয়ে গেছে, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি কুইনিনের দাম বেড়েছে সাড়ে চার শো থেকে পাঁচ শো। পার্টি ঠিক আছে। জনক রোডের হরিহর গাঙুলীর নাত-বউ নাকি কিছু টাকা খাটাতে চায়।"

এর পরে শশধরবাবু আর অপেক্ষা করলেন না, হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলেন কেয়াতলা লেনের মুখে। দাঁড়ালেন একটু। হিন্দুস্থান পার্কের মত পরিষ্কার রাস্তা এটা নয়। দু পাশে এখনও অনেক বুনো ঘাস মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবুজ রঙের ঢেউ বইছে শশধরবাবুর চোখের সামনে। কেয়াতলা লেনের ঐশ্বর্য দিন এবং রাত্রে খোলা প'ড়ে থাকে। শশধরবাবু ঢুকে পড়লেন কেয়াতলা লেনে।

নটা না বাজতেই রমাপদ কাজে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। শশধরবাবু বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই রমাপদ দরজা খুলে দিল। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রমাপদর মা সুধাময়ী। শশধরবাবু দুজনকেই দেখলেন। মায়ের মনে আনন্দের ঝড় উঠেছে। ছেলের মুখেও স্ফূর্তির চিহ্ন দেখলেন তিনি। রমাপদ শশধরবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "প্রথম দিন ব'লে খানিকটা আগেই বেরুচ্ছি।"

"হ্যাঁ, খানিকটা আগে বেরুনোই ভাল। হিসেবের কাজ—মন এবং মাথা স্থির রেখে কাজ করতে হবে। এর ওপরে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, টাকাগুলো পরের। হিসেব-বিজ্ঞান তোমার যতই আয়ত্তে আসুক, পরের টাকার প্রতি দায়িত্ববোধ বিজ্ঞান থেকে আসে না, আসে চরিত্র থেকে।"

শশধরবাবু দেখলেন, প্যাণ্টকোট-পরা রমাপদ কেয়াতলা লেন থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

দু মাস পরের কথা।

মাধুরী কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। আসতে হয় ওকে ভবানীপুর থেকে। আশুতোষ কলেজে পড়ে মাধুরী। কলেজের মাইনে লাগে না বটে, কিন্তু ট্রামের ভাড়া লাগে। মাধুরী আসা-যাওয়া করে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে। প্রতিদিন দুটো ক'রে পয়সা বাঁচে ব'লে মায়ের তাতে খুবই সুবিধে হয়। দিনরাত সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ নিয়ে থাকতে হয় মাকে। ছুঁচের খোঁচা লেগে লেগে চালুনির ফুটোর মত আঙুলগুলোতে দাগ পড়েছে অনেক। দুটো পয়সা বাঁচাতে পারলে দুটো ফোঁড় হয়তো কমাতে পারবে মাধুরী।

কলেজ থেকে বেরিয়ে মাধুরী এসে দাঁড়ায় ফুটপাথে। বালিগঞ্জের ট্রাম ধরতে হবে। মেয়েদের ভিড় হয় খুবই। পরপর দু-তিনটে ট্রামের প্রথম শ্রেণীগুলো ভর্তি হয়ে যায়। মাধুরীর তাতে অসুবিধে হয় না। অপেক্ষা করতে হয় না দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ট্রামের জন্যে। প্রথম যে ট্রামটা আসে তাতেই উঠে পড়ে। খাতা আর বই কোলের ওপর রেখে সে ব'সে পড়ে মেয়েদের সীটে। তাড়াতাড় বাড়ি ফিরতে পারলে রান্নাবাড়ার কাজে মাকে খানিকটা সাহায্য সে করতে পারবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আরাম এবং আয়োজনের অনেকটা ফারাক আছে বটে, কিন্তু গতির কোনও ফারাক নেই। দুটো কামরাই একই সময়ে গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজায় ভিড় হয় না ব'লে মাধুরী নেমে আসে সবার আগে। ময়লা-কাপড়-পরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলোর বরং সম্ভ্রমবোধ অনেক বেশি। মেয়েদের গায়ের সঙ্গে স্পর্শ লাগবার সম্ভাবনা আছে মনে ক'রে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে দূরে।

আজও মাধুরী দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চেপে বসল। বেলা নটার মধ্যেই ওর আজ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। ক্লাস শেষ হয়েছে আরও অনেকের। সহপাঠিনী জয়া মল্লিক মাধুরীর ঠিক পাশেই বসে। একই ইস্কুলে ওরা পড়ত। কঠিন পড়াগুলো সে বুঝে নিত মাধুরীর কাছে। আজও নেয়। কলেজে এসে জয়া মল্লিকের অসুবিধে আরও বেড়েছে। লজিকের একটা অক্ষরও ওর মাথায়

ঢোকে না। কমন-রুমে মাধুরী মাঝে মাঝে জয়াকে পড়াতে বসে। তারপরে দুজনে উঠে আসে একই সঙ্গে। রাস্তা পার হয় পাশাপাশি হেঁটে। আলাদা হয়ে যায় ট্রামের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দু কামরার ব্যবধানের মধ্যে। প্রথম প্রথম মনে আঘাত লাগত মাধুরীর। আজ সে আঘাতের কথা ভাবতেই পারে না। সংসারে সুস্থ মন নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে এ সব ছোটখাটো আঘাত ওর অগ্রাহ্য করাই উচিত। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন ব'লে মা নিজেও তো সারাটা জীবন কম আঘাত পান নি! কসবার একটা এঁদো গলিতে মায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মাধুরী যা শিখল, তার শতাংশের এক অংশও সে এতগুলো বই প'ড়ে শিখতে পারে নি। জয়া মল্লিকরা আর ওকে আঘাত দিতে পারবে না।

ট্রামটা এসে থামল রসা রোড আর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ে। দশ-বারোটা কলেজের মেয়ে নেমে গেল এখানে। ট্রামটা এবার বাঁ দিকে ঘুরে যাবে। দু-এক মিনিট সময় লাগল ঘুরতে। ওদিক থেকে অন্য একটা ট্রাম আসছিল। মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাধুরীকে দেখছিল। মুখে যেন সবারই মৃদু হাসির চিহ্ন ভেসে উঠেছে। মাধুরী মুখ নীচু ক'রে হাতের বইটা খুলে ফেলল, পাতা ওলটাতে লাগল তাড়াতাড়ি। কি ভাবছে ওরা? সেকেণ্ড ক্লাসের ছোটলোকদের মধ্যে ব'সে মাধুরী কি ক'রে যাওয়া-আসা করে? হয়তো তাই। ট্রামটা ঘুরে যাওয়ার পরেও মেয়েরা মোড়টাতে দাঁড়িয়েই রইল। মাধুরী চকিতের মধ্যে ওদিক পানে দৃষ্টি ফেলল একবার। হ্যাঁ, মেয়েরা হাসছে, কি যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে! মোড়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছে ওরা। বাড়ি ফেরবার এমন কিছু তাড়া নেই ওদের। মায়ের রান্নাবাড়ার কাজে ওরা কেউ সাহায্য করে না। করবার দরকার হয় না। হয়তো ঠাকুর কিংবা চাকরেরাই রান্নার কাজ চালায়। সেই জন্যেই ওরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাসবার সময় পায়।

কলেজ থেকে ফেরবার পরেই সৌদামিনী দেবী এসে দাঁড়ালেন মাধুরীর কাছে। বললেন তিনি, "মাধু, আমি একটু গড়িহাট বাজার থেকে ঘুরে আসছি। ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেলে তুই নামিয়ে রাখিস।"

"গড়িহাট বাজারে হঠাৎ কি তোমার দরকার পড়ল মা?"

"তোকে যে সন্ধের সময় শশধরবাবু দেখতে আসবেন, মাধু।"
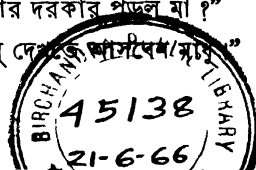
"কিছু মিষ্টি এনে রাখলেই তো হয় মা। বাজারে যাওয়ার দরকার কি?"

"না না, দাদা ব'লে গেছেন যে, দোকানের ভেজাল মিষ্টি খাওয়ালে বুড়ো মানুষের অম্বলের ব্যারাম হবে। ব্যারাম হ'লে বিয়ের তারিখ যে যাবে পিছিয়ে। ছেলে যাঁর শুরুতেই তিন শো টাকা মাইনে পাচ্ছে, তাঁকে মাছের চপ না খাওয়ালে তাঁর মর্যাদার মান নীচু হয়ে যায়। দাদা ঠিকই বলেছেন, তুই উনুনের সামনে একটু ব'স্। আমি চট ক'রে বাজার থেকে ঘুরে আসছি।"

তর্ক করা বৃথা হবে মনে ক'রে মাধুরী বলল, "তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমি যাচ্ছি; টাকা দাও। কি মাছ আনব মা?"

"পোনা মাছের গাদা। এক পোয়া আনলেই হবে।"—সৌদামিনী দেবী আঁচল থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিলেন। মাধুরী বাজারে যেতে চাইল ব'লে মনে মনে তিনি খুশিই হলেন। ভাবী শ্বশুরকে খাওয়াবার জন্যে মাধুরী বোধ হয় নিজে হাতেই আজ সব কিছু তৈরি করবে।

"শুধু মাছ আনলেই কি চলবে মা?"—জিজ্ঞাসা করল মাধুরী।

"আর কি খাওয়াতে চাস মাধু"—আনন্দে সৌদামিনী দেবী যেন নেচে উঠলেন, "বেশ তো, আধ সের মাংস নিয়ে আসিস। যা হয় নতুন রকমের একটা কিছু রান্না করিস তুই। এই নে, আর একটা টাকা নিয়ে যা।"

সময় নষ্ট না ক'রে মাধুরী বাজারের ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে চ'লে এলো গড়িয়াহাট বাজারের দিকে। খুব বেশী এখন আর ভিড় থাকবে না। বেশী দাম দিয়ে তাজা মাছ খাওয়ার লোকেরা খেয়ে-দেয়ে এতক্ষণে অফিসের কামরায় ব'সে কলম নিয়ে খেলা করছে। দশটার পর থেকে মাছের দর একটু কমে। চাহিদা ক'মে যায় ব'লে নয়, মাছগুলো বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প'চে উঠতে থাকে। বরফের ঠাণ্ডা টেনে নেবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে মাছগুলো। অতএব দাম কমিয়ে দিতে বাধ্য হয় মাছ-বিক্রেতারা।

পথ চলতে চলতে মাধুরীর মনে পড়ল রাজমোহনের কথা। কসবার গলিতে রাজমোহন দু কাঠা জমি কিনে একখানা ঘর তুলেছে সেদিন। খোলার ঘর। মাধুরীদের ঘরের চেয়ে ভাল। দুটো বর্ষা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু মাধুরীদের ঘরের মত চাল দিয়ে জল পড়ে না। এই তো সেদিন ঝপ ঝপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। রাত তখন কটা হবে? একটা কি দুটোর কম নয়। বৃষ্টির শব্দে

মাধুরীর ঘুম ভেঙে গেল। মা তখনও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছেন। তাড়াতাড়ি মাধুরী বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ঘরের এক কোণায় একটা জলচৌকি ছিল। জলচৌকির ওপর বই রেখে মাধুরী কলেজের পড়া শেখে। মোটা মোটা সাইজের দু-চারখানা কলেজ স্ট্রীটের নোটবই মাধুরী সাজিয়ে রেখেছিল জলচৌকিটার ওপর। আলো জেলে মাধুরী দেখল, নোটবই ক'খানা বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে নেতিয়ে পড়েছে নটবরবাবুর মত! নটবরবাবু? তিনি কে? তিলজলা রোডের জমিদার, মাধুরীদের বাড়িওয়ালা। মাঝে মাঝে তিনি নিজেই আসেন ভাড়ার টাকা আদায় করতে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই তিনি ভাড়ার টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যান। মাধুরীর হাত থেকে টাকা নিতে তাঁর ভাল লাগলেও ঘরে ঢুকতে সাহস পান না তিনি। মাগো, লোকটা কী মোটা! একটা বাচ্চা হাতী যেন শান্তিপুরের কাঁচিধুতি প'রে দু দিকে দুটো শুঁড়ের মত হাত নাড়াতে নাড়াতে এসে বলেন, "কই মাধু, টাকা দাও।" মাধুরী জানে, কেবলমাত্র কুড়িটা টাকার লোভে নটবরবাবু গলির বাইরে গাড়ি রেখে এতটা পথ হেঁটে আসেন না। মাধুরী জানে, নিজের মুখে অনুরোধ পেশ করলে, নটবরবাবু পুরনো খোলা সব বদলে দিতে একদিনও বিলম্ব করতেন না। কিন্তু মাধুরী তেমন অনুরোধ আজও তাঁর কাছে পেশ করতে পারে নি। কোথায় কি একটা দেনা-পাওনার সম্পর্ক গজিয়ে উঠতে পারে ভেবে মাধুরী আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এসে শুয়ে পড়ে মায়ের পাশে। কলেজ স্ট্রীটের নোটবইগুলো যখন ভিজে ভিজে নটবরবাবুর মত ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে, রাজমোহনের ঘরে তখন এক ফোঁটাও জল পড়ে না। কেবল নতুন খোলা ব'লে নয়, এক নম্বরের খোলা লাগিয়েছে রাজমোহন তার ঘরের চালে।

এক বছর আগেও রাজমোহনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। গড়িয়াহাট বাজারে মাছ বিক্রি ক'রে সে তার সংসার চালাতে পারত না। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসেরই দাম বাড়ল, কিন্তু সেই অনুপাতে মাছের দামটা বাড়ল কই? মাধুরীর স্পষ্ট মনে আছে, টাকার যোগাড় ক'রে উঠতে পারল না ব'লে গেল-বছর রাজমোহনের ছেলেটার মৃত্যু হ'ল কী শোচনীয়ভাবে! জার্মানিতে তৈরি কি একটা ওষুধ যেন ডাক্তারবাবু চেয়েছিলেন ছেলেটাকে খাওয়াবার জন্যে। ওষুধটা পেলে ছেলেটা হয়তো বাঁচত। রাজমোহনকে সঙ্গে নিয়ে মাধুরী গিয়েছিল মাখনবাবুর কাছে। ওষুধের নামটা শোনবার পরে মাখনবাবু

বলেছিলেন, "ওষুধের নামটা তো খুবই চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু আমার বাড়িতে তো ডাক্তারখানা নেই।"

রাগ হয়েছিল মাধুরীর। সে বলেছিল, "ডাক্তারখানা না থাকতে পারে, কিন্তু একটা ওষুধের গুদাম তো আছে মামা। বালিগঞ্জ এবং ভবানীপুরের কে না জানে যে, তুমিই এখন সারা ভারতবর্ষে জার্মান-ওষুধের সবচেয়ে বড় স্টকিস্ট?"

"তুই যে হিটলারকেও হার মানালি, মাধু! তোর মুখ থেকে যে বোমা পড়ছে রে!"—এই বলে মাখনবাবু জানলা দিয়ে একবার আকাশের দিকে চাইলেন, তারপর পুনরায় বলতে লাগলেন, "বোধ হয় ঝড় এলো। কি বলবি তাড়াতাড়ি বল্।"

"তোমার কাছে সত্যি যদি ওষুধটা না থাকে, তা হ'লে অন্য লোকের গুদাম থেকে যোগাড় ক'রে দাও। যত বড় ঝড়ই আসুক, দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ওষুধটা পাওয়া চাই। নইলে রাজমোহনের ছেলেটা যে বাঁচবে না মামা।"

"জন্ম-মৃত্যু কি ওষুধ আর ডাক্তারের ওপরে নির্ভর করে মাধু? কত টাকা এনেছ রাজমোহন?"

"দশটা টাকা এনেছি, বাবু!"

"তা হ'লে ঝড় বোধ হয় এলোই।"—এই ব'লে মাখনবাবু ফস ক'রে বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। মাধুরী বলল, "একটু দাঁড়াও মামা। আকাশে মেঘ নেই, ঝড় দেখছ কোথায়?"

"বলিস কি মাধু! সারা দুনিয়াটা ঝড়ের মুখে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস না? গোটা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আসতে বল্ রাজমোহনকে। জার্মানির ওষুধ অত সস্তায় আমি যোগাড় করতে পারব না। কখন আসছ, রাজমোহন? আমি আবার সাড়ে ন'টায় বেরুব। দশটার মধ্যেই বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে গিয়ে পৌঁছতে হবে। ব্যাঙ্কটা মিনিটে মিনিটে ফেঁপে উঠছে। তবুও যেন এর খিদে মিটছে না।"

কি বলবে মাধুরী ভেবে পাচ্ছিল না। পঞ্চাশটা টাকা যে সাড়ে নটার মধ্যে রাজমোহন যোগাড় করতে পারবে না তা সে জানে। রাজমোহন বলল, "এই দশটা টাকা রাখুন, বাকি টাকা আমি প্রত্যেক দিন কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করব।"

"আজকাল কিস্তিতে যে কোন কাজ হয় না তা কি তুমি জানো না, রাজমোহন? পুরনো নিয়ম সব ভেঙেচুরে বরবাদ হয়ে গেছে।"

মাধুরী বলল, "ঝড তা হলে এবার সত্যিই এলো, মামা "

রাস্তার দিকের জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন মাখন গুপ্ত। উঁকি দিয়ে আকাশ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আকাশ তো পরিষ্কার, ঝড দেখলি কোথায়?"

"তোমার মনে। দয়া, মাযা, নীতি এবং মনুষ্যত্বের খুঁটিগুলো সব ভেঙে-চুরে ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে, মামা!"

"তা তো তুই বলবিই, মাধু। লুকিয়ে লুকিয়ে তুই সুভাষ বোসের ফোটো পুজো করিস, আরকোহাট সাহেব হাতের কাছে থাকলে তোকে আমি ধরিয়ে দিতুম। তোদেরই মাসে মাসে চল্লিশটা ক'রে টাকা দিই আমি—আমি মাখন গুপ্ত, পেনশনপ্রাপ্ত সাব-জজ। এই রে, নটা যে বাজে!"

গড়িযাহাট বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মাধুরী সেদিনের কথাগুলোই ভাবছিল। রাজমোহনের ছেলেটা বাঁচে নি। কিন্তু গত এক বছরের মধ্যে অবস্থা তার অনেক ভাল হয়েছে। সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো উঁচু জায়গায় ব'সে সে এখন মাছ বিক্রি করে। একজন কর্মচারীও রেখেছে রাজমোহন। একই রাস্তায় ওরা বাস করে বটে, কিন্তু আজকাল আর তেমন দেখাসাক্ষাৎ হয় না। ভোরবেলা সে শেয়ালদা চ'লে যায় মাছ কেনবার জন্যে।

অফিসের বাবুদের ভাল মাছ খাওয়াবার জন্যে সে সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরে আসে বাজারে। কাঠের বাক্সে মাছগুলোকে ভর্তি ক'রে সে তাড়াতাড়ি বরফ চাপা দেয়। রাজমোহন সবচেয়ে সেরা মাছ দুটো এনে ধপাস ক'রে ফেলে রাখে সিমেণ্ট-বাঁধানো উঁচু জায়গাটার ওপর। পাকা পোনা। ভিড় জমছে। হাই তুলতে তুলতে অফিসের দু-চারজন বড়বাবু এসে পাকা পোনার রঙ্ দেখে জিজ্ঞাসা করেন, "আঁশের ওপর এমন ক'রে সিঁদুর লেপ্টে দিল কে?"

"সিঁদুর নয় গো বড়বাবু, ওর গতরে রয়েছে সিরাজগঞ্জের স্বাস্থ্য, হলুদ মাখিয়ে কড়াতে ফেললে দেহ থেকে ওর চর্বি বেরুবে বাটি বাটি। মাঠাকরুণের তেলের খরচ কমবে। কতটা দোব?" রাজমোহন এরই মধ্যে নোড়া দিয়ে বঁটির মুখে শান্ তুলেছে। পোনামাছের অ্যানাটমি ও না দেখেই ব'লে দিতে

পারে। ঘাড়ের একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে খুলিটার সূক্ষ্মতম গা দিয়ে মাছটাকে দু ভাগ ক'রে ফেলে রাজমোহন। মুড়োটার সঙ্গে একটুও মাছ থাকে না। সিরাজগঞ্জের স্বাস্থ্য থেকে রক্ত পড়ছে, তাজা রক্ত। কর্মচারীটি মগে ক'রে বেশ খানিকটা রক্ত ধ'রে রাখে। বেলা বাড়লে পচা পোনার গায়-গতরে রক্ত ছিটিয়ে তাজা মাছের বিজ্ঞাপন দেবে রাজমোহন। গড়িয়াহাট বাজারে মাছ বিক্রি করতে করতে সে বিজ্ঞাপনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অন্যায় কিংবা পাপের রক্ত দেখতে পায় না। বিজ্ঞাপনের মধ্যে পাপ নেই। থাকলে শিক্ষিত বাবুরা খবরের কাগজ পড়তেন না। বিজ্ঞাপনের কালিতে যদি পাপের ছাপ না থাকে, তা হ'লে পাকা পোনার ঘাড়ের রক্তে পাপ থাকবে কি ক'রে ?

নাকের কাছে এক টুকরো মাছ তুলে এনে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "কত ক'রে দাম, রাজমোহন ?"

"আরে, দিদিমণি যে ! তোমাকে তো আজকাল আর দেখি না ?"

"মাঝে মাঝে আসি, কিন্তু···পোনামাছ কেনবার দরকার হয় না আমার।"

"কি করি দিদিমণি, পুঁটি কিংবা ট্যাঙরা মাছ বেচে তো কর্পোরেশনের ট্যাক্সো যোগাতে পারতুম না। সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো এই উঁচু জায়গাটুকুর ট্যাক্সো আবার সবচেয়ে বেশী। কতটা চাই ?"

"এক পোয়া। কত ক'রে দাম ?"

"আড়াই টাকা। সকালে এই মাছই ছিল তিন টাকা ক'রে সের।" রাজমোহন মাধুরীর চোখের সামনেই মগ থেকে আঙুলে ক'রে রক্ত নিয়ে কাটা-পোনার গায়ে লেপ্টে দিতে লাগল। রাজমোহন জানে, ভয় করবার কিছু নেই এতে। কেন ভয় করবে সে ? মাধুরী যদি না নেয়, মাছ কেনবার জন্যে আরও অনেক খদ্দের সে পাবে। তা ছাড়া পচা মাছকে তাজা মাছ ব'লে বিজ্ঞাপন দেবার ন্যায্য অধিকার ও া কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

মাছের টুকরোটা সিমেণ্টের ওপর রেখে দিয়ে মাধুরী বলল, "একটু যেন পচা-গন্ধ পেলুম ?"

"এখনও ঠিক পচে নি দিদিমণি। সিরাজগঞ্জের মাছ, চব্বিশ ঘণ্টার ওপর বরফের শয্যায় শুয়ে আছে। এখুনি গিয়ে নুন-হলুদ মেখে ফেললে আর কোন ভয় থাকবে না।"

"তা হ'লে এক পোয়া দাও।" বলল মাধুরী।

মাছের টুকরোটা ওজন করতে গিয়ে রাজমোহন মগ থেকে রক্ত নিয়ে মাছের গায়ে লাগাতে লাগল। মাধুরী বলল, "যত রক্তই মাখাও, একে আর তাজা ক'রে তুলতে পারবে না রাজমোহন।"

"হেঁ-হেঁ, তা যা বলেছ! কিন্তু ব্যাপারটা কি জান দিদি? পচাকে তাজা ব'লে চালাতে গিয়ে রক্ত-মাখানোটা কেমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।"

"পাপ হচ্ছে না রাজমোহন?"

"পাপ? বিশ বছর ধ'রে যখন ব্যবসাটা চালিয়ে আসছি, তখন আর পাপ করছি ব'লে মনে হয় না আজ। সবই অভ্যাস দিদি, সবই অভ্যাস। থাক্, এই মাছটা তোমায় নিতে হবে না। বাক্স থেকে তোমায় টাটকা মাছ দিচ্ছি।" রাজমোহন তার বরফের বাক্স থেকে একটা সের-তিনেক ওজনের পোনামাছ বার ক'রে কাটতে লাগল। কাটতে কাটতে সে বলল, "তোমার তো অনেক বিদ্যে, দিদি। আমাদের বংশে কেউ সাতজন্মে লেখাপড়া করে নি। আমি কোন রকমে নাম সই করতে পারি। আমার মেয়েটার লেখাপড়ার দিকে বড্ড বেশী ঝোঁক ছিল। তোমার কাছে পার্বতীকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? অঙ্ক সে ভাল বুঝতে পারে না।···এক পোয়া থেকে টুকরোটা একটু বেশীই হ'ল দিদি।" ঝপ ক'রে মাছটা মাধুরীর ব্যাগের মধ্যে ফেলে দিয়ে রাজমোহন পুনরায় বলল, "পার্বতীকে আমি কেবল অঙ্কই শেখাতে চাই। আমার তো আর দ্বিতীয় কোন সন্তান নেই। টাকা-পয়সার হিসেব যদি সে ভাল ক'রে রাখতে পারে···না না, দিদি, এক পোয়ার দাম দিলেই চলবে।"

মাধুরী গুনে গুনে পয়সা দিচ্ছিল রাজমোহনের হাতে। পুরো দাম পাওয়ার আগেই রাজমোহন বলল, "থাক্, থাক্, পয়সা আর দিতে হবে না। তুমি বরং এ পয়সাগুলোও নিয়ে নাও দিদি।"

"কেন?" মাধুরী অবাক হ'ল খুবই, "দাম না দিয়ে আমি মাছ নেব কেন?"

"দু-একদিন কি তোমায় আমি মাছ খাওয়াতে পারি না দিদি? ভগবানের কৃপায় অভাব আমার মিটে যাচ্ছে। তা ছাড়া পার্বতী যদি তোমার কাছে রোজই অঙ্ক শিখতে যায়, তা হ'লে তার মূল্যও তো তোমায় কিছু একটা নিতে হবে?"

বাকী পয়সা কটা রাজমোহনের হাতে দিয়ে মাধুরী বলল, "আজ আমাদের

বাড়িতে অতিথি আসবেন, বিনে পয়সার মাছ আমি তাঁদের খাওয়াতে পারি না। তোমার পয়সা খুব বেশি হয়েছে ব'লে আমি কেন তা নিতে যাব ?"

"হেঁ-হেঁ, কী সুন্দর কথাই না বললে দিদি ! পার্বতী যদি তোমার মত হয়—ব্যাপারটা কি জানো দিদি, ঠিকেদারি করছি। মিলিটারিদের মাছ সাপ্লাই দিচ্ছি। আজকেই প্রথম চালান পাঠিয়ে দিলুম।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজমোহনই আবার বলল, "অনেক টাকার কারবার !"

"এত বড় কারবার করতে টাকা পেলে কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করল মাধুরী।

"টাকা ?" রাজমোহন যেন এইমাত্র ডাকাতি ক'রে ফিরছে, "টাকা ? টাকা পেয়েছি বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক থেকে। তোমার মামাবাবুই সব করিয়ে দিলেন। ও মশাই—" দাঁড়ি-পাল্লাটা ডানদিকে সরিয়ে রেখে একটু সুর চড়িয়ে রাজমোহন বলল, "ও মশাই, এসেছেন মাছ কিনতে, মেয়েছেলের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন কেন ?"

ভদ্রলোকটি সরবার আগে স'রে দাঁড়াল মাধুরী। ভিড় একেবারে নেই, তবু ভদ্রলোকটি মাধুরীর গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রামের প্রথম শ্রেণীর দরজায় যা সম্ভব, মাছ-বিক্রেতার সামনে তা সম্ভব হ'ল না। লজ্জা বোধ করল না ভদ্রলোকটি। জিজ্ঞাসা করল, "পোনা মাছ কত করে ?"

"সাড়ে তিন টাকা।"

"সাড়ে তিন টাকা ? এইমাত্র তুমি আড়াই টাকা ক'রে বেচলে যে ?"

"আমার মাছের দাম একটু বেশি।" ইচ্ছে করেই বলল রাজমোহন।

"অন্য দোকানে আড়াই টাকায় বিক্রি হচ্ছে।"

"অন্য দোকানেই যান বাবু।"

ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার সময় মাধুরীর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে গেল। মাধুরী এদের চেনে। চেনে মাছ-বিক্রেতাও। তাই সে বলল, "দিদি, এদেরই মত একজন ভদ্রলোক আজ আমার অনেক টাকা লোকসান ক'রে দিয়ে গেছে। দু সের মাছ কিনে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। দাম দেয় নি। অন্য এক খদ্দেরের হাত থেকে টাকা নেবার সময় বাবুটি স'রে পড়ল। চেহারাটা পর্যন্ত মনে নেই। যাক, রোজ রোজই তো লাভ করা যায় না। দু-একদিন ঠকতেও হয়।···মেয়েটাকে তা হলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব তো ?"

"দিও। বিকেলবেলা যেন আসে। আজ নয়। কাল থেকে এলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।"

মাধুরী বাড়ি ফিরে এসে দেখল, মামা ব'সে আছেন ওরই অপেক্ষায়। সৌদামিনী দেবীর সঙ্গেই তিনি কথা বলছিলেন। কড়াতে আলু সেদ্ধ হচ্ছিল। মাখনবাবু বাজারের ব্যাগটার দিকে চেয়ে বললেন, "চপের মধ্যে মাছের স্টাফিংটা যেন বেশি থাকে মা। হোটেল-রেস্তোরাঁয় তো একদম ফাঁকি চলছে আজকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে কি সর্বনাশই ক'রে গেল সত্ন! ছ আনা দাম নিচ্ছে একটা চপের। আঙুল ঢুকিয়ে দিলেও মাছ-মাংসের স্পর্শ পাওয়া যায় না, কেবল আলু আর আলু—বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে এমন ক'রে ভেজে এনে রাখে সামনে যে, দেখলে মনে হয় ফোলা-ফোলা চপগুলোর গায়ে-গতরে অনেক মাংস। কিন্তু—" মাখনবাবু মাধুরীর দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করলেন, "কিন্তু ভেতরে পুর খুব কম, আলুসেদ্ধ দিয়ে পুরু ক'রে রেখেছে। কি দিনকালই না পড়েছে মাধু, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।…কতটা মাছ আনলি রে?"

"এক পোয়া।"

সৌদামিনী দেবী বললেন, "গোটা দশেক হবে। তোমাকে নিয়ে কজন হবে দাদা?"

"আমাকে আবার হিসেবের মধ্যে ধরছিস কেন? শশধরবাবু আর তাঁর স্ত্রী আসবেন। অতএব, বাইরে থেকে আমরা তিনজন। ভেতরে তো মাধু আছেই।"

"কম পড়বে না। আধ সের মাংস আনিয়েছি। রমাপদ এলে কিন্তু ভাল হ'ত দাদা। আমরাও দেখতুম।"

"রমাপদ পরে আসবে। বাবার সঙ্গে এলে মাধুকে বাজিয়ে দেখতে পারবে না। সমাজের এসব বর্বর ব্যবস্থাগুলো কবে যে দূর হবে, তাই কেবল দিনরাত ভাবি। আজকাল আমি সেইজন্যে লতিকার অনেক রকমের ফোটো তুলিয়ে রেখেছি। ছেলে আগে ফোটো দেখবে, তারপর—" থেমে গেলেন মাখনবাবু।

"তারপর কি দাদা?"

"তারপর দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গেলে, লতিকা বরপক্ষের সামনে আসবে।"

"হাতে ক'রে কি এনেছ মামা ?"—জিজ্ঞাসা করল মাধুরী।

"ওঃ, এই দেখ্, ভুলেই গিয়েছিলাম! আসবার সময় লতিকা তার একখানা শাড়ি দিয়ে দিয়েছে—মহিশূর জর্জেট। বিকেলবেলা চান-টান শেষ ক'রে জর্জেটখানা পরবি।"

"কি দরকার মামা জর্জেটের ? যে-শাড়ি প'রে কলেজে যেতে পারি—"

বাধা দিয়ে মাখনবাবু বললেন, "অধ্যাপকদের সামনে যাওয়া আর ভাবী শ্বশুরের সামনে বেরুনো এক কথা নয়। সেখানে না গেলে অধ্যাপকদের চাকরি থাকবে না। আর এখানে না বেরুলে তোর বিয়ে হবে না। শিক্ষা-টিক্ষা সব শিকেয় তুলে রাখ্। আসলে বেকারসমস্যা সমাধান করবার জন্যেই ভবানীপুর আর কলেজ স্ট্রীট না কোথায় সব গুদাম তৈরি করা হয়েছে। ঘণ্টা বাজলেই গাদা গাদা ছেলেমেয়ে ভেতরে যায় আর আসে। মাধু, সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে বিয়ে করা দরকার। কিন্তু শিক্ষার জন্যে ইট-সুরকি এনে জড়ো করার দরকার নেই। একটা চুলও আমার কাঁচা নেই, শিক্ষার আর বাকি আছে কি ?"

মহিশূর জর্জেট শাড়িখানার প্যাকেটটা মাখনবাবুর হাত থেকে নিয়ে মাধুরী বলল, "তোমার কথা মিথ্যে নয় মামা। আবার যদি নতুন ক'রে সব কিছু তোমায় শিখতে হয়, তা হ'লে জন্মান্তরবাদের রাস্তা ধরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ জন্মের চুলগুলো তো তোমার সব পেকেই গেছে। শিক্ষা যদি আবার নতুন ক'রে শুরু কর, শেষ করবে কবে ?"

"শুনলি ? শুনলি সন্তু, মাধুর কি রকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ? উনিশ শো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তোর যোগ দেওয়া উচিত ছিল। দু-চারখানা ট্রাম পোড়াতে পারলে মনের আগুন তোর নিবে যেত মাধু।"

মাখনবাবু মাধুরীকে ভয় পান। রমাপদর সঙ্গে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল। বিয়ের পর মাধুরী তার মাকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা ক'রে সাহায্য করতে পারবেই। বিধবা বোনের জন্যে তিনি তো কম করেন নি। ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর থেকে গত দশ বছর ধ'রে প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা ক'রে তিনি দিয়ে এসেছেন। এ বছর থেকে ত্রিশ ক'রে

দিচ্ছেন। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে শতকরা ন' টাকা সুদের বন্দোবস্ত তিনিই করেছেন। মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেলে তিনি আর এক পয়সাও দেবেন না। তিন শো টাকা মাইনের পাত্রও তো তিনিই ধ'রে নিয়ে এলেন। লেক অঞ্চলে হাওয়া খেতে না গেলে রমাপদই বা ধরা পড়ত কি ক'রে? যুদ্ধের মধ্যে ভেজাল কুইনিনের দাম হয়েছে পাঁচ শো টাকা পাউণ্ড। বিয়ের বাজারও গরম হযে উঠেছে। ভাল পাত্রের গায়ে হাত দিতে গেলে হাতের চামড়ায় ফোস্কা পড়ে। কলকাতার মার্কেট সম্বন্ধে মাখন গুপ্তর যা জ্ঞান হয়েছে, রামায়ণ সম্বন্ধে বাল্মীকিরও সম্ভবত তত জ্ঞান ছিল না। যদি থাকত, তা হ'লে অতবড় লাভের রাজ্য ছেড়ে দিয়ে রাম কেন বনবাসে যাবে? না চাইতেই প্রজারা খাজনা দিয়ে যায়। পিতা দশরথের কথা রাখবার জন্যে শ্রীমান রামের কেন মাথা-ব্যথা? এখন কি হচ্ছে? ভারতবর্ষে আবার নাকি রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাব জন্যে ষডযন্ত্র হচ্ছে! কিন্তু মাখন গুপ্তরা ষড়যন্ত্র সব ভেঙে দিচ্ছেন। বাল্মীকির ভুল শুধরে দিচ্ছেন এঁরাই। জনক রোডের হরিহর গাঙুলী টের পায় নি যে, তারই নাত-বউ হাজার টাকা দিয়ে দু পাউণ্ড ভেজাল কুইনিন কিনেছে মাখন গুপ্তর কাছ থেকে। অযোধ্যার গোপন ইতিহাস বাল্মীকির জানা ছিল না। কলকাতার সব খবরই জানা আছে মাখন গুপ্তর। শহর কলকাতা যদি আবার কোনদিন সুতানটি না হয়, তা হ'লে জনক রোডের কারবার তাঁর ভালই চলবে। কেয়াতলা লেনের কারবারই তাঁর খারাপ বলবে কে? শশধর সেন মাস্টার ব'লেই তো বাজারের দরদস্তুর সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। নইলে রমাপদর জন্যে পাত্রীপক্ষের কাছে তিনি একটা মোটরগাড়ি চাইতে পারতেন। দানসামগ্রী ছাড়াও, যে-কোন মেয়ের বাপ পাঁচ হাজার টাকার চেকও লিখে দিতে রাজী হতেন। মাখন গুপ্ত নিজে যদি পাত্রীপক্ষ হতেন, তা হ'লে তিনিও সবচেয়ে চড়া দাম নিয়ে রমাপদকে কিনে নিয়ে আসতেন। কিন্তু শশধরবাবু তো জাতমাস্টার, দামদস্তুর সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, একেবারে অজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। শহর কলকাতা যদি সত্যিই কোনদিন সুতানটির অবস্থায় আসে, তখন অবশ্য শশধর সেনদের যুগ আরম্ভ হবে। মাখন গুপ্ত তখন পৃথিবীতে থাকবেন না।

তিনি বললেন, "সন্থ, উনুনে তোর কয়লা নেই। সব ছাই হয়ে গেছে।"

"যা তো মাধু, কিছু কয়লা ভেঙে নিয়ে আয়।"— বললেন সৌদামিনী দেবী।

মাধুরী চ'লে যাচ্ছিল। মাখন গুপ্ত বললেন, "ঘড়ির পকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট রয়েছে দেখছি। নে, টাকা পাঁচটা রেখে দে মাধুরী। একটিন পাউডার কিনে নিস।"

মাধুরী জবাব দিল না। হাত বাড়াল না নোটখানা ধরবার জন্যে। কি হবে ধ'রে? কাগজে আঁকা রাজার মাথায় মুকুট কই? মাখন গুপ্তরা কি তাঁর মাথার মুকুট লোভের উনুনে ফেলে দেন নি? এখনও সময় আছে, তাড়াতাড়ি ক'রে কিছু কয়লা ফেলে দিতে পারলে মাকে আবার নতুন ক'রে উনুন ধরাতে হবে না। দরজার ওপাশ থেকে মাধুরী তাই বলল, "আগুনটা নিবে গেলে মার বড্ড কষ্ট হবে মামা। এখনও তো মাছের চপ তৈরি বাকি। মাংস দিয়ে আবার একটা নতুন রকমের রান্নাও শেষ করতে হবে। তুমি ও-ঘরে গিয়ে ব'স মামা, উনুনের তাপ লাগলে গায়ে তোমার ফোস্কা পড়বে।"

মাধুরী চ'লে গেল। মাখন গুপ্ত টাকাটা বার ক'রে ফেলে রাখলেন উনুনের সামনেই। মাধুরীর জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই। কয়লা ভাঙতে ওর সময় লাগবে। হাতের কব্জির চেয়ে মাধুরীর মনের জোর অনেক বেশি।

"আমি চললুম সদু। সন্ধের একটু পরেই ওঁদের নিয়ে আমি আসব। টাকা পাঁচটা রইল। উনুন তোর নিবেই গেছে দেখছি।"

"দুখানা ঘুঁটে ফেলে দিলেই আবার ধ'রে উঠবে দাদা।"

"নোটখানা সরিয়ে রাখ্ তা হ'লে। আমি চলি। উনুনটা বাইরে নিয়ে যা, ছাই উড়ছে।"

মাখন গুপ্ত বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। বাতাস ছেড়েছে হঠাৎ। বাতাস আসছে লেক-অঞ্চল থেকে। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে এসে ধীরে ধীরে তিনি রেল-লাইন পার হয়ে এলেন। বাতাস ছেড়েছে ঠিকই। এখানেও ছাই উড়ছে। কি পুড়ল? পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বারে বারে প্রশ্ন করতে লাগলেন, কি পুড়ল? কোঁচাটা ডান হাত দিয়ে তুলে এনে মাখন গুপ্ত মুখ মুছতে লাগলেন। না, মুখের চামড়া ঠিকই আছে। ছটাক ওজনের

ঘাম জমেছিল সারা মুখে। বাতাসটা আপাতত ভালই লাগছে। লেক-অঞ্চলের হাওয়া অনেকগুলো রাস্তা পার হয়ে কসবা পর্যন্ত যে পৌঁছুতে পারে, তেমন সম্ভাবনার কথা তিনি আগে কখনও ভেবে দেখেন নি। মাখন গুপ্ত পা চালিয়ে চ'লে এলেন ট্রাম লাইন পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন ট্রামে। পায়ের ওপর বিশ্বাস নেই। বুড়ো ব'লেই পায়ের জোর তাঁর ক'মে এসেছে।

কিন্তু রমাপদ? রমাপদকে নিয়ে তিনি এখন কি করবেন? সব দিকটা ভাল ক'রে না দেখে বিয়ের সম্বন্ধটা তাঁর আনা উচিত হয় নি। রমাপদকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে আসা উচিত ছিল হিন্দুস্থান পার্কে। লতিকার আগে মাধুরীর বিয়ে হয় কি ক'রে? যাক, লতিকা এখনও রমাপদর নামটা শোনে নি। রমাপদ ফসকে যায় নি হাত থেকে। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক যদি তাঁর হাত থেকে না ফসকায়, তা হ'লে কোনও ভয় নেই। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের জন্যে তিনি কি না করছেন!

কসবা থেকে বাড়ি ফেরবার মুখে মাখনবাবু সদাশিব রায়ের বাড়ীর দিকে চললেন।

সদাশিব রায়, তাঁর ছেলে প্রভাসের শ্বশুর, প্রকাণ্ড ধনীলোক। গোটা পাঁচেক ঘানি আছে তাঁর—গরুটানা ঘানি নয়, দশ-ঘোড়ার মোটরে টানা ঘানি। প্রচুর লাভ। সরষের ওপর কণ্ট্রোল থাকলে কি হবে? সদাশিববাবু ঘানিগুলো দিবারাত্র চালিয়ে চালিয়ে টাকা রোজগার করছেন। বিহার থেকে সরষে আসবে ব'লে তিনি হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকেন না। নল দিয়ে তেল বেরুলেই হ'ল। তেল কেবল সরষের মধ্যেই থাকে তেমন কথা কোন্ বিজ্ঞানের বইতে লেখা আছে? সদাশিব রায় বিজ্ঞান কিছু কম জানেন না। সাইন-বোর্ড লিখতেন ব'লে হের হিট্‌লারকে মূর্খ বলবে কে?

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ কোন্ ক্লাস অবধি পড়েছিলেন বেয়াই মশাই?"—জিজ্ঞাসা করলেন সদাশিব রায়।

মাখন গুপ্ত এসেছেন সদাশিব রায়ের কাছে বিশ্ববিহার-ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি করতে। বিক্রি করতে অসুবিধে হ'ল না। দেড় হাজার টাকার চেক-খানা পকেটে রেখে মাখনবাবু জবাব দিলেন, "বাঙালী ছোঁড়াগুলোর কথা আর বলবেন না। দেড় শো বছর ধ'রে কি যে কেবল লেখাপড়া নিয়ে মেতে আছে, আমরা তো তা বুঝতেই পারি না। বিদ্যে শেখা কেন? টাকা রোজ-

গার করবার জন্যে। গাদা গাদা বই মুখস্থ করলে কি হয়? কোটি কোটি বইয়ের পাতা ঘানিতে ফেলে দিনরাত থেতলে দিলে কি হবে, এক ফোঁটা রস বেরুবে না। বেয়াই মশাই, বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক হচ্ছে বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ছ হাজার টাকার শেয়ারের ওপর এখন দেড় হাজার টাকা দিলেন। বাকি টাকা ওরা তিন কিস্তিতে নেবে। শেয়ারের আবেদনপত্রের জন্যে একটা টাকা বেশি দিতে হয়। আপনি চেক দিলেন পনেরো শ টাকার। বাকি আর একটা টাকা দিলেই আমি উঠতে পারি। বেয়ান ঠাকরুণ ভাল আছেন তো? এদিকে প্রভাসের মেয়ে লতিকার তো আজ সকাল থেকে পেট খারাপ। ভাবছি সরষের তেল খাওয়া ছেড়েই দোব। আজকাল শুনছি, আপনি নাকি ব্যবসার প্রতি তেমন ভাবে মনোযোগ দিতে পারছেন না? ব্যাপার কি? দেহটা কি ভাল যাচ্ছে না, বেয়াই মশাই?"

"না, দেহ তো ভালই আছে। উনিশ শো বিশ খ্রীষ্টাব্দের পর আমি আর সরষের তেল স্পর্শ করি নি। দরকার হয় না। প্রচুর দুধ হয়। ছটি ভাগলপুরী গাই আছে। সর থেকে বউমা ঘি তৈরি করেন। রান্নাবান্না সব ঘি থেকেই চ'লে যায়। বড়বাজারের ধনী লোকেরা ঘিয়ের কারবার করছেন কোটি কোটি টাকার। কিন্তু নিজেদের খাবার জন্যে ঘি আসে রাজপুতনা থেকে। ওদের কাছে শেখবার যে কত কিছু আছে, আমি তা জানি। বুড়ো হয়ে গেছি, এখন আর খুব বেশি জেনে লাভও নেই। লতুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আজকাল হপ্তায় পাঁচ দিন ক'রে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি। ব্যবসার প্রতি তেমন আর আকর্ষণ নেই। ঠাকুরের প্রসাদ যদি একবার অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে, লতুর তবে পেটের ব্যারাম সব সেরে যাবে। কোন্ কোম্পানির তেল খাচ্ছেন, বেয়াই মশাই?"

"আপনার রায় অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানির তেল খেয়ে প্রথম দিনই প্রভাসের মা, মানে মিসেস গুপ্ত সারারাত কাউকে ঘুমতে দিলেন না। আলপিনের মাথার মত ক্ষুদে ক্ষুদে সরষেগুলোর মধ্যে যে এত বারুদ আছে, কি ক'রে বুঝব বলুন? আপনার পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয়। ঘানির গর্ত যে কত গভীর, বুড়ো মানুষ তা দেখবে কি ক'রে? লতুকে তা হ'লে আজই পাঠিয়ে দোব। কবে ফিরবে? রমাপদকে আবার খেতে বলতে হবে আসছে রবিবারে। একটা টাকা ক্যাশ বোধ হয় আপনার এখন নেই?"

ফরাসের ওপরে দেহটা যথাসাধ্যভাবে বিস্তার ক'রে দিয়ে সদাশিববাবু বসে ছিলেন। হাত দুটো ফেলে রেখেছিলেন সামনের একটা বালিশের ওপর। বালিশটার তলা থেকে সদাশিববাবু একটা মনিব্যাগ বার করলেন। মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগের মত বড় সাইজের দেখতে। দামী কিড কংবা কাফ-চামড়ার তৈরি নয়, সস্তার ক্রোম-চামডার মনিব্যাগ। দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করলে মোট আযতন হবে আনুমানিক বাহাত্তর বর্গ-ইঞ্চি। দ্বিতীয মহাযুদ্ধের মতই ভয়ঙ্কর এবং বিরাট এর হজমশক্তি। মাখন গুপ্ত দেখলেন, মনিব্যাগের ওপরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটা ত্রিবর্ণের ছবি আঁটা রয়েছে।

একটা টাকা বার করবার জন্যে সদাশিববাবু তাঁর ডান হাতের গোটা পাঞ্জাটাই ঢুকিয়ে দিলেন পার্সটার ভিতর। আঙুলের অনুভব-অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি নোটের রাজ্যে এক টাকার নোট একখানা খুজতে লাগলেন। ঘানির গর্তের মতই মনিব্যাগের গর্তটাও যেন খুব গভীর ব'লে মনে হ'ল মাখনবাবুর। ক্রমে ক্রমে তিনি নেশাগ্রস্ত হতে লাগলেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে লাখ দুই মজুদ রেখে তিনি ভেবেছিলেন যে অনেক টাকা হ'ল। আজ তাঁর মনোভাব বদলাচ্ছে, দু-পাঁচ লাখ কিছু নয়। হিট্‌লার স'রে পডবাব আগে তাঁকে অন্তত আরও লাখ দশেক টেনে আনতে হবে। পানের দোকানে যদি হাজার টাকার নোট ভাঙানো চলে, তাঁর কাছে তবে লাখ টাকার নোট ভাঙানোও চলবে।

খুচরো একটা টাকা দিয়ে সদাশিববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "রমাপদ কে ?"

"আমাদের স্বজাত, গোত্র আলাদা। আজ তা হ'লে চলি। নমস্কার। একদিন আপনার গাডিটা পাঠিয়ে দেবেন, মিসেস্ গুপ্তকে নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বরে। সেখান থেকে টপ ক'রে বেলুড়ে একবার ঢুঁ মেরে আসব। মন্দিরটি বড় সুন্দর হয়েছে। ঠাকুরেরই কৃপা, নইলে হুট্ ক'রে মার্কিন মুল্লুক থেকে মেমসাহেবটি এসে লাখ তিনেক লগ্নি করতে পারতেন না। গ্যালনে ক মাইল যায় আপনার গাড়িটা ? কুপনের তেল দিয়ে তো সারা মাস চলে না। তেলের দামটা আপনাকে কিন্তু নিতেই হবে, বেয়াই মশাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সদাশিব রায় বললেন, "কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হ'লে সংসারে কিছুই হয় না। দেবেন। ত্রিশ অশ্বশক্তির গাড়ি, গ্যালনে মাত্র আট মাইল যায়। তিন গ্যালনের দাম দিলেই চলবে। ব্ল্যাকে আট টাকা ক'রে গ্যালন।"

এ'র পরে আর কোন কথা হ'ল না। ট্রামে চেপে বাড়ির দিকেই চললেন। দুর্বল বোধ করছেন মাখন গুপ্ত। দেয়াল ফুঁড়ে এক লাখ টাকা তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বটে, কিন্তু তাতেই বা তাঁর দুর্বলতা আসবে কেন? চুরি কিংবা ডাকাতির টাকা এ নয়। বাজারে জিনিসের দাম বেড়েছে, তিনি টাকা খাটিয়ে খাটিয়ে লাভ তুলছেন ঘরে। বাজার তিনি সৃষ্টি করেন নি। মালের দর তিনি কণ্ট্রোল করেন না। চার শো টাকার কুইনিন যদি কেউ পাঁচ শো টাকায় কিনতে চায়, তবে তিনি কি করবেন? বেচে দেবেন। লাভ না থাকলে কেউ ব্যবসা করত না। রামরাজ্যেও রাম-লক্ষ্মণেরা ব্যবসা করবে। লাভ না থাকলে ময়ুর-সিংহাসনও শূন্য প'ড়ে থাকত। কিন্তু রমাপদ? রমাপদর সঙ্গে হুট ক'রে মাধুরীর বিয়ের প্রস্তাবটা তিনি তুলতে গেলেন কেন? ভুলটা শুধরে নেবার পথ খুঁজতে লাগলেন মাখন গুপ্ত।

শশধরবাবু বললেন, "সুধা, তুমি তো কোনদিনও জুতো ব্যবহার কর নি, আজ তা হ'লে কি করবে? শুধুপায়ে গেলে মাখনবাবুরা হয়তো হাসবেন।"

"স্যাণ্ডেল না কি নাম যেন, রমাপদ বলছিল কিনে নেবার জন্যে। দশটা টাকা দিয়ে গেছে সে। কিন্তু আমার জুতো পরার তো অভ্যেস নেই। ভাবছি, তুমি একলাই যাও। তোমার যদি মেয়েটিকে পছন্দ হয়, আমারও হবে।"

সুধাময়ী দেবী স্বামীর দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, "জুতো প'রে গেলে হয়তো কেবল ওঁরাই হাসবেন না, তুমিও হেসে ফেলবে।"

"না সুধা, আমি দোকানে যাচ্ছি, এক জোড়া স্যাণ্ডেল কিনে আনব। টাকা দশটা আমায় দাও।"—এই ব'লে শশধরবাবু রমাপদর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে এখনও ওর ছাত্রজীবনের পরিচয় রয়েছে। অতি সস্তা দামের একটা টেবিল শশধরবাবুই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে এনেছিলেন। ফেরিওয়ালারা এখনও কেয়াতলা লেনে প্রবেশ করে না, মোড় থেকে হিন্দুস্থান পার্কের দিকে চ'লে যায়। রমাপদ মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে এম. কম. পরীক্ষার পড়া শিখত।

আজও তিনি ওর ছাত্রজীবনের শুচিতা লক্ষ্য করলেন ঘরটার প্রতি ইঞ্চি আয়তনে। মেঝেয় একটা ময়লা ধুতি প'ড়ে রয়েছে। চৌকির কোণায়

একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ঝুলছে। অফিসে যাওয়ার মুখে রমাপদ বোধ হয় গেঞ্জি দিয়ে তার জুতো সাফ ক'রে গেছে। শশধরবাবু দেখলেন, গেঞ্জির মধ্যে জুতোর কালি লেগে রয়েছে। জুতো পালিশ করবার জন্যে রমাপদ এখনও বুরুশ একটা কিনে উঠতে পারে নি। চাকরি করছে তাও তো প্রায় দু মাস হ'ল।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন শশধরবাবু। বই আর খাতাপত্র সব এলোমেলো হয়ে প'ড়ে রয়েছে। দু-চারখানা বই খুলেই রেখে গেছে রমাপদ। এক টুকরো সাদা কাগজের জন্যে তিনি একটা খাতা টান দিয়ে বার ক'রে নিয়ে এলেন।

সুধাময়ী একটু পরেই এসে দাঁড়ালেন শশধরবাবুর পাশে। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "খাতা পেন্সিল নিয়ে এখানে তুমি কি করছ?"

"তোমার পায়ের মাপ নোব ব'লে কাগজ আর পেন্সিল নিতে এসেছিলুম। সুধা, তোমার পা দুটোর এবার মাপ দাও।"

শশধরবাবু কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে ব'সে পড়লেন মেঝেতে। পা দুটো সরিয়ে নিয়ে সুধাময়ী বললেন, "করছ কি! আমার পায়ে তোমায় হাত দিতে দোব না। জুতো আমি পরব না। বুড়ো বয়সে আমায় আর পাপ করতে ব'লো না।"

"এতে পাপ নেই সুধা। পাঁচ বছর আগে তোমার যখন ম্যালেরিয়া হয়েছিল, তখন তোমার হাত-পা টিপে দিত কে? এস, পা দুটো এগিয়ে দাও দিকি। হ্যাঁ, এবার বাঁ পাটা।"

"তাড়াতাড়ি কর।"—লজ্জায় সুধাময়ীর মুখের সাদা রঙ্ লাল হয়ে উঠল। বাঁ পাটা এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "ছি ছি, কেউ দেখে ফেললে কি হবে বল তো?" পেন্সিল দিয়ে পায়ের চারদিকে কাগজের ওপর রেখা টানতে শশধর-বাবুর এক মিনিটও লাগল না। কিন্তু সুধাময়ী ঘেমে উঠলেন প্রচুর পরিমাণে। চোখ বুজে দাঁত কামড়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত রোমান্টিক মুহূর্তটি টলমল করতে লাগল। রমাপদর ঘর না হ'লে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়তো ভালই লাগত তাঁর। চল্লিশ বছর একসঙ্গে ঘর করবার পরে, পায়ের তলার মুহূর্তটা যেন আজ তাঁর মাথায় উঠে এলো। পাকা চুলগুলো বোধ হয় কালো রেশমী সুতোর মত চকচক করছে। রমাপদর ঘরে হঠাৎ

বুঝি বসন্তের হাওয়া বইছে। কালো কুচকুচে রেশমী সুতোর মত চুলগুলো তাঁর উড়তে লাগল সামনের দিকে। হঠাৎ-পাওয়া মুহূর্তটি বিলম্বিত হতে লাগল বিংশ শতাব্দীর কেয়াতলা লেনে। এমন মুহূর্তের বয়েস বাড়ে না।

শশধরবাবু সুধাময়ীর কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে এলেন রমাপদর ঘর থেকে।

গড়িয়াহাটের মোড় থেকে স্যাণ্ডেল কিনে ফিরে আসতে শশধরবাবুর প্রায় বেলা বারোটা বাজল। অনেকগুলো দোকান তিনি ঘুরে এসেছেন। কোন ডিজাইনই তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। সবই নাকি আধুনিক ফ্যাশানের স্যাণ্ডেল! বুড়ো মানুষের জন্যে বিশেষ কোন মার্কা-দেওয়া স্যাণ্ডেল তৈরি হয় না। সুধাময়ীদের জন্যে দোকানদারদের মাথা-ব্যথা নেই। স্যাণ্ডেলের মধ্যে পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে সুধাময়ী বললেন, "পায়ের সবই যে দেখা যাচ্ছে, ওপর দিকে চামড়া কই? তোমায় নিশ্চযই ঠকিয়ে দিয়েছে। কম চামড়া দিয়ে বেশি দাম নিয়েছে দোকানদার।"

"দাম দিয়েছি ডিজাইনের জন্যে। তোমার পায়ে কিন্তু মানিয়েছে ভাল সুধা।"

"যত্ন ক'রে তুলে রেখে দোব, বউমা এলে ব্যবহার করতে পারবে।" কাগজের বাক্সে স্যাণ্ডেল জোড়া তুলে রাখলেন সুধাময়ী। কসবা যাবার পথে আর কোন বাধা রইল না। সকালবেলায়ই সুধাময়ী শশধরবাবুর পাঞ্জাবিটা সাবান দিয়ে ধুয়ে দিয়েছেন। খদ্দরের কাপড় ব'লে ইস্ত্রি করার দরকার হবে না। সুধাময়ী তবু বলেছিলেন, "খোকার তো তিনটে শার্ট আছে, তুমি একটা প'রে যেতে পার। খোকা বলেছে তোমায় পরতে। একটু ঢিলে হবে, তা হোক। ইস্ত্রি-করা শার্ট পরলে তোমায় ভালই মানাবে।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে শশধরবাবু বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়েন। পুরো কাগজটা পড়া হয় না, তার আগেই ঘুম আসে। বিকেলবেলা বাকি কাগজটা প'ড়ে তিনি লেকের দিকে যান বেড়াতে। আজও তিনি যথারীতি ঘুমিয়ে পড়লেন। লেকের দিকে আজ আর যাবেন না। মাখনবাবু আসবেন বিকেল পাঁচটা নাগাদ, তাঁর সঙ্গে কসবা যেতে হবে মেয়ে দেখতে। রমাপদর কোন অমত নেই। সে সুধাময়ীকে জানিয়েছে, "তোমাদের পছন্দ হ'লে আমারও হবে।"

সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি তোর পছন্দ না হয় খোকা, তখন কি হবে ?"

"বিয়ে ব্যাপারটা হিসেব ক'রে কিছু বলা যায় না মা। কপালের ওপর নির্ভর করতে হয়।"

"তুই ঠিকই বলেছিস খোকা। হিসেব সম্বন্ধে তোর বিদ্যা তো কম নয়। কিন্তু ভাগ্যের হিসেবের সঙ্গে টাকা-পয়সার হিসেব যদি না মেলে, তখন কিন্তু আমাদের অনুযোগ করিস না। মাধুরীকে যদি ওঁর পছন্দ হয়, তা হ'লে কি উনি ওঁদের কথা দিয়ে আসবেন ?"

"হ্যাঁ।"

সুধাময়ীর কাছ থেকে রমাপদর সব কথা শুনে শশধরবাবু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলেন। রান্নাঘরের কাজ শেষ হয়ে গেলে সুধাময়ীও এসে শুয়ে পড়বেন। ইত্যবসরে শশধরবাবু খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। হিট্‌লারের ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হতে আর কতদিন যে লাগবে, তার একটা আনুমানিক সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন শশধর সেন।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা বেজেছে। এত বেশি সময় তিনি কোনদিনও ঘুমোন না! কি হ'ল ? সুধা কই ? মাখনবাবু এসে গেছেন নাকি ? প্রথম দিন ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে আসছেন, অথচ তিনি পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছেন কি ক'রে ? ছি ছি! শশধরবাবু উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। দরজার সামনে এসে তিনি সহসা স'রে এলেন ঘরের মধ্যে। সুধাময়ী স্যাণ্ডেল প'রে রমাপদর ঘরের সামনে হাঁটাহাঁটি করছেন। পা থেকে স্যাণ্ডেল জোড়া বারে বারে খুলে আসছে। তাই তিনি সমস্ত দুপুরই হয়তো স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে হাঁটবার অভ্যাস করছেন কসবা যাবার জন্যে। আজ দুপুরে সুধাময়ী নিশ্চয়ই ঘুমুতে আসে নি, ভাবলেন শশধরবাবু।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই শশধরবাবু ডাকলেন, "সুধা!"

সুধাময়ী একটু পরেই এসে ব'সে পড়লেন বিছানার ওপর। শশধরবাবু দেখলেন, সুধাময়ীর পায়ে স্যাণ্ডেল নেই।

"আমাদের তো যাবার সময় হ'ল। মাখনবাবু তো এলেন না।"

শশধরবাবু সুধাময়ীর পায়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল সুধা ? পায়ে হাত বুলচ্ছ যে ?"

"না, তেমন কিছু না। একটু জ্বালা করছিল। এখান থেকে কসবা পর্যন্ত রিকৃশয় চেপে গেলে কেমন হয়? কত ভাড়া লাগবে?"

"এক টাকার কম নয়।" বললেন শশধর সেন।

"রমাপদ তো চাকরি পেয়েছে, একটা টাকা না হয় আমরা আজ আমোদ ক'রে উড়িয়ে দোব। কসবা যাব রিকৃশ চেপে।"

"ঘুম থেকে উঠে আমিও তাই ভাবছিলাম। আমোদ ক'রে আজ আমরা দুটো টাকাই উড়িয়ে দেব। ফেরবার মুখেও রিকৃশ চেপে আসব। রমাপদর দশ টাকা থেকে তিনটে টাকা বেঁচে গেছে।"

"তা হ'লে আমি গা ধুয়ে আসছি। তুমিও তৈরি হয়ে নাও।"—এই ব'লে সুধাময়ী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি পা দুটো যেন স্বাভাবিকভাবে মেঝেতে ফেলতে পারলেন না। একটু কাত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ঢুকলেন স্নানঘরে। কাল থেকে তিনি আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্নানঘরে ঢুকবেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জুতো পরার অভ্যাস তাঁর পাকা হয়ে যাবে। ছেলে যাঁর শুরুতেই তিন শো টাকা মাইনে পায়, আগামী কল্য তাঁর কাছে জুতোর জ্বালা সত্যিই হাস্যোদ্দীপক মনে হবে। মনে হবে রমাপদর কাছেও। গতকল্য এবং অদ্যকার হস্তবুদ জীবনের ক্যাশবুক থেকে রমাপদ মুছে ফেলে দেবে অতি অনায়াসেই।

ছটা প্রায় বাজতে চলল। মাখন গুপ্ত এলেন না। কেয়াতলা লেনে রাতের ছায়া পড়েছে। হিন্দুস্থান পার্কে অবশ্য এখনও রাত আসতে দেরি আছে। সেখানে সবে সন্ধের শুরু। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে চটকলগুলোর শীর্ষদেশে সূর্য গিয়ে পৌঁছলেও, হিন্দুস্থান পার্কের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় রোদের চিহ্ন দেখা যায়। কেয়াতলা লেনে রোদ দেখবার তেমন সুবিধে নেই। গাছ এবং জঙ্গল খুব বেশি ব'লে সন্ধে এখানে আগে আসে।

শশধরবাবু বললেন, "চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। মাখনবাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নোব।"

"আমি হাঁটতে পারব না। তাঁকে গিয়ে তুমি ট্রামে চেপে যেতে ব'লে এসো। ফেরবার মুখে একটা রিকৃশ ডেকে নিয়ে আসবে।"—বললেন সুধাময়ী।

"গলির মোড়েই রিকৃশ পাওয়া যাবে। চল।"

স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে সুধময়ী শশধরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে এলেন গলির মোড় পর্যন্ত। শশধরবাবু ইচ্ছে ক'রেই স্ত্রীর পায়ের দিকে নজর দিলেন না। গলির মোড়ে কেবল রিকৃশই পাওয়া গেল না, মাখন গুপ্তকেও পাওয়া গেল। কেয়াতলা লেনে তিনি ইচ্ছে ক'রেই ঢোকেন নি। চাকর-দরোয়ান দুজন সঙ্গে না থাকলে, তাঁর পক্ষে ফস ক'রে এ সব জনবিরল গলিতে ঢুকে পড়া ঠিকও নয়। তাই তিনি হিন্দুস্থান পার্ক ও কেয়াতলা লেনের সঙ্গমস্থলে পায়-চারি করছিলেন। শশধরবাবুদের দেখতে পেযে মাখনবাবু এক পা গলির দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ট্রামে, না, বাসে যাবেন? ভাড়া দুটোতেই সমান। ট্রামের ফার্স্ট ক্লাস আর বাসে চার পয়সা লাগে।" শশধরবাবু জবাব দেবার সময় পেলেন না। দরদস্তুর না ক'রেই সুধাময়ী রিকৃশয় চেপে বসেছেন। ঈষৎ আলোয় শশধরবাবু দেখলেন যে, মাখন গুপ্ত চোখের মণি দুটো কপালের দিকে ঠেলে তুলে দিয়ে সুধাময়ীর দিকে চেয়ে আছেন অবাক হয়ে।

"কি ব্যাপার শশধরবাবু? মিসেস সেন বুঝি রিকৃশয় চেপে যাবেন?"

"হ্যাঁ, আপনিও একটা রিকৃশয় উঠে বসুন, গুপ্ত মশাই।"—শশধরবাবু নিজেই ব'সে পডলেন সুধাময়ীর পাশে। নিরুপায় হয়ে মাখন গুপ্তও দ্বিতীয় রিকৃশয় চাপলেন। এক আনার বদলে তাঁকে আজ পনরো আনা বেশি খরচ করতে হবে। তা হোক, পনরো আনার লোকসান তিনি কাল সকলেই পুষিয়ে নিতে পারবেন। দশ হাজার টাকার ইন্‌সুলিন কেনা আছে। জার্মানির শেরিং কোম্পানির ইন্‌সুলিন। পনেরো আনা বেশি নিয়ে রিকৃশ-ওয়ালা আর পালাবে কোথায়? কাল সকালেই অবনী দালাল আসবে, পাঁচ হাজার টাকার স্টক তিনি বেচে দেবেন। শেরিং কোম্পানির ইন্‌সুলিনের অভাবে বাংলা দেশের ব্লাড-সুগার যে কত বেড়ে গেছে, তার খবর অবনী দালালের নোট-বইতে লেখা আছে। এখন কেবল মা-কালীর দয়ায় মিসেস গুপ্তর ডায়বেটিস না হ'লেই তিনি পুরো স্টকটা ক্রমে ক্রমে বেচে ফেলতে পারবেন। সবই মা-কালীর খেলা। বুড়ো মাস্টারটা এসব কিছু দেখতে পান না। অসুখ-বিসুখের কথা উঠলেই তিনি কেবল ভাগীরথার বিশুদ্ধ জল পান করতে বলেন। ত্রিশ বছর মাস্টারি করলে সংসারটা বোধ হয় ওঁদের কাছে জলের মতই মনে হয়। কিন্তু ছেলেটা তাঁর তৈরি হয়েছে ভাল।

বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বোস সাহেবের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ছ মাস পরেই রমাপদর মাইনে বাড়িয়ে দেবেন। এক লাফে পাঁচ শো হবে। এক বছর পরে রমাপদ ব্যাঙ্কের চীফ অ্যাকাউণ্টেণ্ট হবে। তখন মাইনে হবে হাজার। হাজার? মাখন গুপ্ত রিক্‌শয় ব'সেই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলেন। বোস সাহেব তাঁকে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে বলছেন। লোকটা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, না, উন্মাদ? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে কেউ বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে রাখে নাকি? ইংরেজ-রাজত্বের ওপর কারো আর আস্থা নেই বটে, কিন্তু বিলিতী কোম্পানির ওপর শিক্ষিত লোকদের ষোল আনা আস্থা আছে। তিনি নিজে কখনও দিশী কোম্পানির শেয়ার কেনেন না, ভুল ক'রেও দিশী ওষুধের ধারে-কাছে যান না। এমন কি ছ পয়সা দু আনা খরচ ক'রে একখানা দিশী খবরের কাগজ পর্যন্ত কেনেন না। হিন্দুস্থান পার্কের কোন শিক্ষিত লোক কেউ কেনে ব'লে তিনি খবরও পান নি। তবে তাঁর অপরাধ কি? বাংলা দেশের শিক্ষিত এবং ধনী সম্প্রদায়ের যদি অপরাধ না হয়ে থাকে, তবে মাখন গুপ্তরও কোন অপরাধ হয় নি। এ কথা আর কেউ না জানুক, মা-কালী নিশ্চয়ই জানেন। পশ্চিম দিকে ঘুরে মাখনবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। তিনি যাচ্ছিলেন পুব দিকে, কসবায়। কালীঘাট হচ্ছে পশ্চিম দিকে, অতএব দিক্‌নির্ণয়ে তাঁর ভুল হ'ল না।

মেয়ে দেখা শেষ হ'ল। মাধুরী এক মুহূর্তেই জয় ক'রে ফেলল শশধরবাবু আর সুধাময়ীকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোলা-বারুদের মধ্যে বাংলা দেশে এমন মেয়ে বেঁচে-বর্তে আছে কি ক'রে? বিস্মিত বোধ করলেন শশধর সেন। যাওয়ার সময় সুধাময়ী সৌদামিনী দেবীকে বললেন, "মাধুকে নিয়ে আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে আসবেন।"

কথা শুনে মাখন গুপ্ত যেন উড়ো-জাহাজ থেকে ঝুলে পড়লেন মাটিতে। ভদ্রমহিলা বলছেন কি? প্রথম দিনেই তিনি মাধুরীকে মাধু ডাকছেন কেন? মেয়েটার মধ্যে এঁরা দেখলেন কি? মুখে পাউডার মাখে নি, মহিশূর জর্জেট প'ড়ে রইল চৌকির ওপর, সাধারণ একটা সবুজ পাড়ের শাড়ি পরেছে মাধুরী, তবু সে কেমন ক'রে এঁদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল? শাড়ি পরার ধরন দেখলে লতুদিদি হেসে হেসে ম'রে যেত। মিসেস গুপ্ত পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর

বয়সে এমন সাধারণভাবে শাড়ি পরেন না। মাস্টারটার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র-মহিলারও বোধ হয় চোখে ছানি পড়েছে। ছানি? কি রোগ যেন এটা? মাখন গুপ্ত মনে মনে তাঁর স্টক-করা ওষুধের নামগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। না, ছানির কোন ওষুধ তিনি মজুত করেন নি।

শশধরবাবু সুধাময়ীকে নিয়ে চ'লে এলেন বাইরে। মাখনবাবু পরে যাবেন। তিনি বললেন, "সন্তুর সঙ্গে ছু-চারটে কথা আছে। ফেরবার মুখেও কি রিকৃশয় চেপে যাচ্ছেন নাকি সেন মশাই?" সুধাময়ীর পায়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই শশধরবাবু জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। কাল সকালে লেকের দিকে বেড়াতে আসছেন তো?" মাখন গুপ্ত মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শশধরবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীও এলো রাস্তা পর্যন্ত। সে বলল, "এখানে আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি একটা রিকৃশ ডেকে আনছি।"

"না না, মা। ওই তো সামনেই রিকৃশ দাঁড়িয়ে আছে। ছু পা হেঁটে গিয়েই আমরা রিকৃশ নোব। তুমি কবে আসছ আমাদের ওখানে? কাল পরশু তরশু যখন হয়, চ'লে এসো। ওটাও তোমার নিজের বাড়ি।"—বললেন সুধাময়ী।

মাধুরী ছুজনেরই পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "মাকে নিয়ে পরশুদিন যাব। কখন গেলে আপনাদের সুবিধে হবে?" এবার শশধরবাবু জবাব দিলেন, "যে কোন সময়ে। হাতে সময় নিয়ে এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করব। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন ঘর নেই, যেখানে আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধোঁয়া গিয়ে প্রবেশ করে নি। তোমাদের ঘরেই কেবল দেখলুম, ধোঁয়ার মধ্যে বারুদের গন্ধ নেই।"

মাখন গুপ্ত বললেন, "মাধুকে ওঁরা পছন্দ করলেন কি ক'রে বুঝতে পারলুম না। মহিশূর জর্জেটখানা সে স্পর্শ করল না। লতুদিদি তার পাউডারের টিনটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেটা বার করবারও সময় দিল না মাধুরী। ঠোঁটে মাখবার জন্যে শেষ-মুহূর্তে লতু ছুটে এসে তার লিপস্টিকের শিশিটা আমার বুক-পকেটে গুঁজে দিয়ে গেল, তাও রইল পকেটে। যাক, পছন্দ যখন হয়েই গেছে, তখন আর এগুলোর মূল্য কিছুই নেই। কিন্তু বিয়ের তারিখটা যেন ফস ক'রে ঠিক ক'রে ফেলিস না সন্তু। রমাপদর নতুন চাকরি,

তার ওপরে দিশী ব্যাঙ্ক। না সন্থু, ছ-সাত মাস আরও কাটুক, আমি নিজেই তারিখটা ঠিক ক'রে দেব। ততদিনে তোর ফিক্সড ডিপোজিটটা আবার পেকে ওঠবার সময় এসে যাবে। চার শো পঞ্চাশ টাকা স্নুদ পাবি। এই যে মাধু, কেয়াতলা লেনে কবে যাচ্ছিস? হিন্দুস্থান পার্কের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা ওটা নয়। সরু গলি, তার মধ্যে আবার প্রাচীন ভারতের বুনো ঘাস সাঁই সাঁই ক'রে বাড়ছে। এবার আমি চলি সন্থু।"

"একটু দাঁড়াও মামা।"—মাধুরী শোবার ঘর থেকে ফিরে এসে পুনরায় বলল, "এই নাও তোমার মহিশূর জর্জেট। ভাঁজ সব ঠিকই আছে। লতিকাদির শাড়ি আমায় মানাত না মামা।"

"হ্যাঁ, ওঁদের কাণ্ড দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।...রাত্রে আবার রান্না চাপাবি নাকি সন্থু? এত ধোঁয়া আসছে কোত্থেকে?"

ভয়ে মাখন গুপ্ত কোঁচার খুঁট দিয়ে নাক বন্ধ ক'রে তাড়াতাড়ি কসবা থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রথম শ্রেণীর ট্রামের প্রথম আসনটিতে চেপে বসলেন তিনি। সবচেয়ে নিরাপদ আসন এটি। চলন্ত ট্রামের সামনের দিকে ব'সে কেউ থুতু ফেললেও মাখন গুপ্তর গায়ে এসে লাগবে না।

হাওয়া আসছে। আসছে হিন্দুস্থান পার্ক পার হয়ে লেক-অঞ্চল থেকে। বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, লিপস্টিকের শিশিটা ঠিকই আছে। ছিপিটা খুলে গেলে শার্টের কাপড় রাঙা হয়ে যেত। লাল রঙের প্রতি তাঁর আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তিনি পাউডারের ওপরেও। মাখন গুপ্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, মাধুরী যদি মুখে পাউডার না মাখতে পারে, ঠোঁট দুটোকে লাল না করতে পারে, শশধরবাবু তা হ'লে মাধুরীকে পছন্দ করবেন না। তাই তিনি ইচ্ছে ক'রেই পকেট থেকে পাউডারের টিন আর লিপস্টিকের শিশিটা বার করেন নি। কিন্তু ব্যাপারটা তো এখন উল্টো হয়ে দাঁড়াল! মা-কালীর লীলা বোঝা মুশকিল!

ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফিরে এলেন মাখনবাবু। বাইরের কলাপ্সিবল্ গেটের তালা খুলতে দেরি করছিলেন তিনি। লতিকাকে কি জবাব দেবেন মাখনবাবু? সে তো অনেক কথা জানতে চাইবে। জানতে চাইবে, মাধুরীকে ওঁরা পছন্দ করলেন কি না। এ যাবৎকাল কেউ তো লতিকাকে পছন্দ করে নি।

তালা খুলে ভেতরে আসতেই লতিকা সিঁড়ির ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করল, "দাহু এলে না কি ?"

"হ্যাঁ। বুড়ো মানুষের আবার আসা-আসি কি! না এলেই বা অনুযোগ করবে কে ?" ওপরে উঠে আসতেও দেরি করছিলেন মাখনবাবু।

লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল দাহু ?"

"দাঁড়া, বলছি। বড্ড ক্লান্ত আমি।"

"মেয়ে দেখলেন তো ওঁরা, তোমার এত ক্লান্তি এলো কেন ? বলো, মাধুকে ওঁরা পছন্দ করলেন কি না ? জর্জেট শাড়ি প'রে ওকে কেমন মানিয়েছিল ?"

"জর্জেট শাড়ি তো মাধু পরে নি।"

"খুব বেশি ক'রে ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে নি তো ?"

"মাধুর কি আর মাত্রাজ্ঞান আছে!"—থেমে থেমে কথা বলছেন মাখনবাবু। লতিকা যেন একটু বিরক্তির সুরেই এবার জিজ্ঞাসা করল, "ওঁরা লোক কেমন দাহু ?"

"কেরানী, অতি সাধারণ লোক। সেই জন্যেই মাধুকে ওঁরা পছন্দ করলেন না।"

"খুবই আশ্চর্যের কথা দাহু! মাধুকে কেউ পছন্দ করল না বললে মানুষের ওপরে ঘেন্না আসে। এঁরা কারা এসেছিলেন মাধুকে দেখতে ? কেরানী হ'লেই তো মানুষ ছোট হয়ে যায় না।"

"তাই তো বললুম। অতি সাধারণ লোক। পরিচয় কিছু নেই।"—এই ব'লে মাখনবাবু বুক-পকেট থেকে লিপস্টিকের শিশিটা দিয়ে দিলেন লতিকার হাতে। পাউডারের টিনটা তাঁর হাতেই ছিল। লতিকার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "এটাও নে, খরচ হয় নি।"

॥ তিন ॥

তারপর আরও ছ মাস প্রায় কাটল। আজ রবিবার।

সকাল থেকেই লতিকা ব্যস্ত হয়ে আছে। একতলা দোতলার ঘরগুলো সব বড্ড নোংরা হয়ে ছিল। কেষ্টকে দিয়ে ঘরগুলোকে সাফ করাচ্ছে লতিকা। খুবই অবাক হয়েছে ও। একতলায় যে ঘর আছে তা যেন আজ সে প্রথম জানল। একতলা না থাকলে যে দোতলাও থাকে না তাও বুঝি জানত না লতিকা।

বিকেলে রমাপদ আসবে। নেমন্তন্ন ক'রে এসেছেন মাখনবাবু। তিনি কাল গিয়েছিলেন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে। শনিবার ছিল ব'লে বেশিক্ষণ তিনি বসতে পারেন নি। বসবার জন্যে অনুরোধও করে নি রমাপদ। রমাপদ কেবল বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের কর্মচারী নয়, কর্মীও। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বোস সাহেব তা টের পেয়েছেন। নির্ভর করবার মত লোক পেয়েছেন তিনি। রমাপদ কাজ করতে ভালবাসে। ক্রমে ক্রমে নিজের জীবনের চেয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে সে বেশি ভালবাসবে ব'লে বোস সাহেবের বিশ্বাস।

ব্যাঙ্কের উন্নতির মূলে মাখন গুপ্তর প্রচেষ্টাও কম নয়। তিনিও তো লক্ষ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট কর ছেন ব্যাঙ্কে। নিজের টাকা না-ই বা রাখলেন তিনি, বোস সাহেবের তাতে কি যায় আসে! বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের অবিক্রীত শেয়ারগুলো সব মাখনবাবুই তো বেচে দিলেন। তা ছাড়া, বিশ-পঁচিশজন ঠিকেদার পার্টিও তিনি টেনে এনেছেন এখানে। তারা সব মিলিটারী বিভাগে মাল সাপ্লাই দিচ্ছে। মাল কিনতে ঠিকেদারদের পয়সা লাগে না। টাকা দেয় বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক। মাখন গুপ্তর তাতে কমিশন থাকে। বিলের টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজমোহনও এসে কমিশনের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যায় মাখনবাবুকে। ব্যবসা বাড়ছে রাজমোহনের। এক চালান মাছ তো একেবারে প'চে গিয়েছিল। বেশ মোটা টাকার চালান। মাখন গুপ্তই বলেছিলেন সস্তা দরে পচা মাছ কেনবার জন্যে। একটা বিলের মুনাফা থেকে রাজমোহনের হাতে অনেক টাকা পুঁজি আসবে। এলোও। চালানের সঙ্গে সঙ্গে মাখন গুপ্ত নিজে গিয়েই উপস্থিত হলেন পানাগড়ের ক্যাম্পে। পচা মাছকে

তাজা মাছ ব'লে বিল পাস করিয়ে নিয়ে এলেন তিনি। পানাগড় ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন পেরিগ্রীন সাহেবকে মাখনবাবু চিনতেন। বাঁকুড়ায় যখন তিনি মুনসেফ ছিলেন, ক্যাপ্টেন পেরিগ্রীন ছিলেন ছোট পুলিস সাহেব। রাজমোহন ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ওঁরা সব গন্ধ পান নি ?"

"বলিস কি রাজমোহন ? সারা ইয়োরোপ পুড়ছে, এখন কি আর ওদের গন্ধ শুঁকবার সময় আছে। এই বিলের ওপর কত দিবি ? অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে রে। রাঁধুনে-সৈনিকদের দলে টানতে হ'ল। সাহেবরা তো মাছের ঝোল খায় না, সব ভাজা খায়। পেঁয়াজ-রসুনের সঙ্গে মাছটাকে বেটে নিতে বললুম। কিছু ছাড়তে হ'ল রে, রাজমোহন। দে, কত দিবি দে।"— এই ব'লে মাখন গুপ্ত হাত বাড়ালেন। রাজমোহন বলল, "বেশি টাকাই দেব বাবু। কিন্তু আমি ভাবছি, এদের পেটের দফা যদি রফা হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে এরা জাপানীদের সঙ্গে লড়বে কি ক'রে ?"

হাতটা টেনে নিয়ে মাখন গুপ্ত বলেছিলেন, "তুই দেখছি ওয়ার-ক্যাবিনেটের মেম্বারদের মত বড় বড় কথা বলছিস !"

"কি বললেন বাবু ?"

"সুভাষ বসুর নাম শুনিস নি ?"

"তা আর শুনি নি। মাধুদিদি তো ওদিককার কত খবরই না আমায় শোনায়। তিনি তো এলেন ব'লে।

"আমিও তো সুভাষ বোসের দলে। তুইও। পচা মাছ খাইয়ে খাইয়ে যদি ওদের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারিস, তা হ'লেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে রে, রাজমোহন। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। রবিবার দিন সের পাঁচেক পাকা পোনা পৌঁছে দিয়ে যাবি। রমাপদকে খেতে বলেছি। লতিকা নিজে হাতে রাঁধবে।"

"রমাপদ কে বাবু ?"

"একাউন্টেন্ট, বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের সিন্দুক এখন ওর কাছে থাকে। গোত্র আলাদা—"

"কিন্তু মাধুদিদির সঙ্গেই তো তাঁর বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে ব'লে শুনেছি।"

"মন্ত্র পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বিয়েই পাকে না রে রাজমোহন। তা ছাড়া—" একবারে কথাটা শেষ করেন নি মাখনবাবু। একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, "মাধুর বিয়ে তো আমাকেই দিতে হবে। কিন্তু রমাপদর মত চাঁদ ছুঁতে হ'লে হাতটা তো আরও লম্বা হওয়া চাই। কাপড়ের পরিমাণ না মেপে কোট কাটা যায় না। দে, টাকা দে।"

টাকা দিয়ে সেদিন রাজমোহন বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু বাড়ি ফিরে মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়েছিল যে, এ টাকা থেকে বোধ হয় সবটুকু ধর্মই লোপ পেয়েছে। মাধুদি বোধহয় ঠিকই বলেন যে, ঝড় এলো। এ ঝড় থেমে গেলে মানুষকে আর মানুষ ব'লে চেনা যাবে কি না তা নিয়ে মাধুদির মনে তর্ক চলেছে দিনরাত

একতলার ঘরগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে দোতলায় উঠতে লতিকার প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। নটা বেজে গেছে। মিসেস গুপ্ত ঘুম থেকে উঠে এই মাত্র স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তিনি দশটার আগে আর স্নানঘর থেকে বেরুবেন না। লতিকা এই সুযোগে ঢুকে পড়ল মিসেস গুপ্তর ঘরে। মাখন গুপ্ত বাজারে যাবেন ব'লে সিন্দুক থেকে গুনে গুনে টাকা বার করছিলেন। লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কি করছ দাদু? বেলা তো অনেক হ'ল, বাজারে যাবে না? লেকের দিকে আজ বেড়াতে না গেলেই পারতে।"

দশটা একটাকার নোট বার-পাঁচেক গুনলেন তিনি। তারপর সিন্দুকে চাবি লাগিয়ে মাখনবাবু বললেন, "লেকের দিকে আজ তো যাই নি—"

"কোথায় গিয়েছিলে এত ভোরে?"

"কসবায়। রাজমোহনকে ঘুম থেকে তুলতে হ'ল আমায়। ওকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে গেলুম শেয়ালদা। এই তো সেখান থেকে ফিরছি। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আয়, কি এনেছি। সিরাজগঞ্জের পাকা পোনা। রাজমোহনকে দাম দিতে চাইলুম, নিলে না। এখন বল্, গড়িয়াহাট বাজার থেকে কি কি আনতে হবে? ক' সের মাংস চাই? হিসেব ক'রে বলিস। তোর দিদুর তো পেট গরম। শুকতো ছাড়া আর কিছুই চলবে না তাঁর। মাছের চপ করবি নে, লতু?"

"করব। উনি তো বিকেলবেলাতেই আসবেন, এলে চায়ের সঙ্গে মাংসের

ঘুগনি আর মাছের চপ দেব। টপ ক'রে তুমি একবার পার্ক স্ট্রীট থেকে ঘুরে এসো, দাদু। সাহেবদের দোকান থেকে কিছু কেক নিয়ে আসবে। ক' টাকা নিলে সঙ্গে?"

পকেট থেকে চাবি বার ক'রে মাখন গুপ্ত পুনরায় সিন্দুক খুলতে খুলতে বললেন, "ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি, একখানা বড় নোট নিতে ভুলে গিয়েছিলুম।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "মাধুকে একবার ডাকলে কেমন হয়? সত্যদিত্যর হেঁসেলে তো মাছ-মাংসের ব্যাপার নেই। তা ছাড়া, রান্নাঘরে আমায় ও সাহায্যও করতে পারবে। তুমি একবার মাধুরীকে ব'লে এসো। আজ রবিবার, কলেজ নেই।"

রহস্যজনকভাবে হাসতে হাসতে মাখনবাবু বললেন, "অচেনা লোকের সামনে মাধু আসতে চাইবে না।"

"তুমি ওকে নেমন্তন্ন ক'রে এসো, আমার নাম ক'রেই ব'লো ওকে।

"তা বলব। ভুলে গেলে আর একবার মনে করিয়ে দিস। বাজারের লিস্টটা এবার দে। তোর দিদু কি স্নানঘর থেকে বেরিয়েছেন?"

"না, সময় হয় নি। এই নাও লিস্ট। কেষ্টকে নিয়ে যেয়ো না। দোতলার ঘরগুলো সব পরিষ্কার করতে হবে। দাদু, আসবার সময় কিছু ফুল নিয়ে এসো। কোথা থেকে ফুল কিনবে?"

"কেন, গড়িয়াহাট মার্কেটে তো লাল হলদে সাদা কত রকমের ফুল পাওয়া যায়।"

"না, ওখান থেকে ফুল আনলে চলবে না। তুমি বরং নিউ মার্কেটে একবার যাও। গড়িয়াহাট বাজারের সওদা সব বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর যেয়ো। গ্লোব নার্সারি থেকে আনবে—কাচের আলমারির গায়ে দেখবে নার্সারির নাম লেখা আছে। কি ফুল আনবে? সস্তা দামের ফুল এনে বাজি মাত করবার চেষ্টা ক'রো না দাদু।"

"কি যে বলিস লতু! আমি কেবল ভাবছিলাম, তোর দিদুর আবার পেট গরম কিনা, এত ফুল দেখলে—"

"ফুল তো তাঁকে খেতে হবে না। যাচ্ছ?"

"যাই, ভাল জিনিস সব আবার বিক্রি হয়ে না গিয়ে থাকে।"

এই ব'লে মাখন গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চিন্তান্বিতভাবে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। লতুদিদিকে রমাপদ শেষ পর্যন্ত পছন্দ করবে তো? গত দু বছর ধ'রে তিনি ওর বিয়ের তো কম চেষ্টা করেন নি। কেউ তো পছন্দ করল না। বিশ হাজার টাকা নগদ দেবেন ব'লে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। যারা বিয়ে করবে ব'লে এগিয়ে এসেছিল, তারা গিলতে এসেছিল বিশ হাজার টাকা। মাখনবাবুর চোখ দুটোকে ওরা ফাঁকি দিতে পারে নি। মেয়ে না দেখেই কে একটা ছোঁড়া যেন ওকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল? আজ তার নামটাও মনে নেই মাখনবাবুর। একেবারে নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি হঠাৎ একটু হেসে ফেললেন। ছোঁড়াটা বিলেত গিয়ে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করবার জন্যে টাকার লোভে ছুটে এসেছিল আপার সারকুলার রোডের বিজ্ঞান-কলেজ থেকে। হুঃ, সংসারটাকে চিনতে আর তাঁর বাকি নেই। বিজ্ঞানের বাহাদুরি তাঁর জানা আছে। একবার বিলেত গিয়ে পেঁছিতে পারলেই সে আর লতিকার দিকে ফিরেও চাইত না। যার কাছে স্ত্রীর চেয়ে রসায়নশাস্ত্র বড়, তার মনোবিজ্ঞান মাখন গুপ্ত প্রথম দিনেই ধ'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু রমাপদ সে রকম নয়। হুট্ ক'রে শশধরবাবুকে কসবায় নিয়ে যাওয়া ঠিক হয় নি। তাঁর প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল যে, লতিকার বিয়ের আগে মাধুরীর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। তা ছাড়া, তাঁর চোখের সামনে রমাপদর মত এত বড় একটা বিরাট পাত্রের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হ'লে তিনি ভারতবর্ষে আর বাস করতে পারতেন না। তা হ'লে কি তিনি মাধুরীর বিয়েটাকে বন্ধ করবার জন্যেই রমাপদকে নেমন্তন্ন ক'রে এলেন? না না, তা নয়। শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাখন গুপ্ত নিজের মনেই ব'লে উঠলেন, না, না। মাধুরীর পক্ষে রমাপদ 'টপ্-হেভি' হ'ত। ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "কি বললে, দাদু? 'টপ্-হেভি' কি? দাঁড়াও, নীচে আসছি।"

লতিকা নেমে এলো নীচে। মাখনবাবু কথাটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু লতিকা তা বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা করল, "কাল তাঁকে নেমন্তন্ন করতে ভুল হয় নি তো, দাদু? একবার না হয় কেয়াতলা লেন থেকে ঘুরে এসো। সব রেঁধে-বেড়ে ঠিক ক'রে রাখলাম, তিনি হয়তো এলেনই না।"

"না, কাল সে আমার নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে বোস সাহেব দিল্লী গিয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক দিল্লীতে একটা বাড়ি কিনেছে। কত কথা হ'ল রমাপদর সঙ্গে। আমি চললুম রে।"

"মাধুরীকে নেমন্তন্ন করতে কিন্তু ভুলো না।"

না-ভুলবার সম্মতি জানিয়ে মাখন গুপ্ত বেরিয়ে এলেন হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তায়।

গতকাল শনিবার ছিল। রমাপদ শনিবার দিনও চারটে পর্যন্ত ব্যাঙ্কে কাজ করেছে। কাজ করতে ভাল লাগে ওর। বাঙালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব'লেই গর্বে ওর বুক ফুলে ওঠে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের এই তিনতলা বাড়িটার মধ্যে রমাপদ যেন একটা আদর্শও খুঁজে পেয়েছে। ক্যাশ-বই আর লেজার-খাতার অরণ্যে রমাপদ পথ খুঁজছে সেই আদর্শে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে।

চারটে বাজবার পরও রমাপদ ব'সে ছিল। পাশের কামরা থেকে হেড-ক্যাশিয়ার সারদা রায় উঠে এলেন রমাপদর কাছে। বললেন তিনি, "চারটে তো বাজল, আর ব'সে থেকে কি হবে?"

"না, চলুন যাই।"—চেয়ারের কোণা থেকে কোটটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে রমাপদই আবার বলল, "না, আর ব'সে থাকা চলে না। কি জানি, বোস সাহেব হয়তো এর পরে দরওয়ান দিয়ে আমায় এখান থেকে বার ক'রে দেবেন।"

"আশ্চর্য হবার কোন কারণ থাকবে না। সবাই তো ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে এখানে যাওয়া-আসা করে। পাঁচ মিনিটই বা কেউ বেশি খাটবে কেন? আপনি ব'সে থাকেন ব'লে আমাকেও চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হয়—"

"কিন্তু—" ভেবেচিন্তে রমাপদ বলল, "সময়টার কথা ভেবে দেখেছেন কি? সারা পৃথিবী জুড়ে কী প্রবল ঝড় উঠেছে, কত লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে, সারদাবাবু? আমরা কি দু দশ মিনিট সময় বেশি খাটতেও পারব না?"

"না। যুদ্ধ তো আমরা লাগাই নি।"

"না, তা অবিশ্যি আমরা লাগাই নি। লাগাবার চেষ্টা করলেও আমরা পারতুম না।"

"তার মানে?"—হেড ক্যাশিয়ার সারদাবাবু মানে জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

গলার টাইটা শক্ত ক'রে বেঁধে রমাপদ বলল, "কি ক'রে যুদ্ধ করতে হয় তা আমরা ভুলে গেছি।"

"গেলুমই বা ভুলে, ক্ষতি তো কিছু হয় নি। পরের দেশ শোষণ করবার নীতিকে ভারতবর্ষ চিরদিনই অপরাধ ও পাপ ব'লে ভেবে এসেছে।"—এই ব'লে সারদাবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

রমাপদ ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠল, "দাঁড়ান, আমিও যাব। আপনার ঐতিহাসিক উক্তি আমিও সত্য ব'লে জানি। কিন্তু আমি বলছিলুম, আমাদের জীবন-যুদ্ধের কথা। সেখানে আমরা হেরে যাচ্ছি, কারণ আমরা যুদ্ধ করতে জানি না। তা ছাড়া—"

সারদাবাবু আবার একটু এগিয়ে এলেন রমাপদর দিকে। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা ছাড়া কি?"

কামরার বাইরে বড় ঘরটায় এসে রমাপদ বলল, "তা ছাড়া, যুদ্ধ না বাধলে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক বড় হওয়ার সুযোগ পেত না। আমাদের অন্ন আসছে এখান থেকেই। অতএব, দু-দশ মিনিট বেশি খাটলে যদি প্রতিষ্ঠানটা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, আমাদের তাতে উপকারই হবে। ব্যাঙ্কের টাকার চেয়ে কর্মীরাই তো বেশি মূল্যবান।"

হাসতে হাসতে হেড-ক্যাশিয়ার বললেন, "নতুন ঢুকেছেন তো, বড় বড় কথা বলতে ভালই লাগবে। দিল্লী থেকে তো ঘুরে এলেন বোস সাহেবের সঙ্গে, লোকটাকে চিনতে পারেন নি?"

রমাপদ কোন জবাব দিল না।

সারদাবাবুর মুখে হাসি তবুও লেগে রইল। তিনি হালকা সুরেই এবার বললেন, "চলুন, এক সঙ্গে গড়িয়াহাট বাজার পর্যন্ত যাওয়া যাক। ট্রামে ব'সে আলোচনা করবার সময় পাওয়া যাবে অনেক।"

বোস সাহেবের বেয়ারা বিপিন এসে দাঁড়াল রমাপদর সামনে। সে বলল, "আপনাকে একবার দোতলায় উঠতে হবে, বড় সাহেব সেলাম জানিয়েছেন।"

রমাপদর জন্যে সারদাবাবু আর অপেক্ষা করলেন না।

বোস সাহেব তাঁর কামরায় একা ব'সে ছিলেন। মস্ত বড় কামরা। ব্যাঙ্কের বাড়িটার প্ল্যান করেছেন কলকাতার একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু এই কামরাটার প্ল্যান তাঁর নিজের। ঘরের মাঝখানে রয়েছে মাঝারি সাইজের একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। সারা ঘরটায় একটাও আলমারি নেই। চারিদিকের দেওয়াল একেবারে সাদা। আলপিনের মাথা দিয়ে একটা কালির বিন্দু বসিয়ে দিলেও বোস সাহেব তা তাঁর চেয়ারে ব'সেই দেখতে পাবেন। তারিখ দেখবার জন্যে দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। ঘরের কোথাও নেই এক টুকরো আসবাব। টেবিলের পাশে মাত্র একটাই চেয়ার। দুজন লোক একসঙ্গে এলে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

বিরাট একটা শূন্যতা ঘরের চারদিকে যেন ভেসে রয়েছে। এই ঘরটায় ঢুকতে রমাপদ ভয় পায়। এখানে এলে ওর গোটা অস্তিত্বটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে ফানুসের মত হালকা হয়ে ওঠে, মিশে যেতে চায় শূন্যতার গহ্বরে। রমাপদ তখন এগিয়ে বসে টেবিলটার কাছে। হাত দিয়ে চেপে ধরে টেবিলের কোণা।

এই ঘরটায় বাইরের লোক কেউ আসতে পারে না। এখানে তিনি একাই থাকেন। এরই পশ্চিম দিকে আরও একটা ঘর আছে। সেই ঘরটাই বোস সাহেবের অফিস। এখানে বসেন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ললিতবিহারী বসু।

রমাপদকে খবর পাঠিয়ে দিয়ে বোস সাহেব চ'লে এলেন বড় ঘরটায়। দক্ষিণ দিকের জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে কেবল ক্যানিং স্ট্রীট নয়, ক্লাইভ স্ট্রীটও দেখা যায়। অফিস-টাইমে একজন ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়ায় ওখানে। বোস সাহেব ঝুঁকে দাঁড়ালেন জানলার ওপর। দেখলেন চেয়ে, পুলিশটা সেখানে আর নেই। রাস্তার ভিড়ও ক'মে এসেছে, দশ-পনরো মিনিট পরে এই পুরো এলাকাটাই জনশূন্য হয়ে যাবে। অফিসগুলো খুলবে আবার সোমবার। প্রায় চল্লিশ ঘণ্টার জন্যে এ অঞ্চলের কর্মব্যস্ততা বন্ধ হয়ে গেল। বোস সাহেব ভাবলেন, এখানকার দোকান এবং অফিসগুলোর দরজা সব বন্ধ থাকলেও যুদ্ধ কখনো বন্ধ থাকবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের ক্যালেণ্ডারে

রবিবারের ছুটি নেই—প্রতিটি মুহূর্তের বুকে সহস্র মৃত্যুর সাক্ষী রয়েছে, ছুটির অবকাশ সেখানে আর্তনাদের গহ্বরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মুহূর্তগুলো ভেসে যাচ্ছে রক্তের স্রোতে। ভারতবর্ষের অফিসগুলোই কেবল দরজা বন্ধ করে লাল কালিতে ছাপা ক্যালেণ্ডারের তারিখ মিলিয়ে মিলিয়ে। বোস সাহেব স'রে এলেন জানলার কাছ থেকে। ব'সে পড়লেন নিজের চেয়ারে। এখানে তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নন, এখানে তিনি ললিতবাবু। পূর্ববঙ্গের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচয় তিনি বহন করছেন মাত্র। তাঁর মৃত্যুর পরে এ পরিচয়টুকুও আর থাকবে না। তিনি অবিবাহিত। পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেলেন। বোস সাহেবের সামনে আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। যাকে চেয়েছিলেন তাকে যখন তিনি পেলেন না, তখন আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে লাভ কি? না, লাভ কিছু নেই। এখন কেবল ব্যাঙ্কের দেওয়ালে একটা তৈলচিত্রের মধ্যে যদি বেঁচে থাকতে পারেন তা হ'লেই তিনি খুশি।

পকেট থেকে বোস সাহেব দু ইঞ্চি মাপের একটা আয়না বার করলেন। গ্লেস-কিড দিয়ে আয়নাটার জন্যে তিনি একটা কেস তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। সব সময় এটা তাঁর পকেটে থাকে। বিশ মিনিট কি আধ ঘণ্টা পর পর নিজের মুখ দেখা তাঁর মুদ্রাদোষের মত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বড় অঙ্কের চেক কাটবার সময় তিনি বার বার ক'রে আয়নায় মুখ দেখে নেন। নিজের মুখে কি যে তিনি দেখেন কেউ তা জানে না।

আজও তিনি আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগলেন। বয়স বাড়ছে তাঁর। মুখের চামড়ায় ক্রমবিবর্তনের প্রগতি নেই। এখানে সেখানে ভাঁজ পড়েছে ক'টা। সংগ্রাম—কঠিন সংগ্রামের সহস্র চিহ্ন ভাঁজগুলোর অন্তরালে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন এগুলো বেরিয়ে আসবে বাইরে, এ মুখ সেদিন দেখেও চেনা যাবে না। ক্লেদের পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে কদর্য ব'লে নয়, যৌবন তাঁর সবটুকু ক্ষ'য়ে গেছে ব'লেই এ মুখ তাঁর প্রগতি-বিমুখ। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পেছনে কী ভীষণ সংগ্রামের কাহিনীই না তাঁর লুকিয়ে রয়েছে! ক্যানিং স্ট্রীটের একটা আশী বর্গ-ফুট ঘরের ভাড়া যোগাতে তিনি খরচ ক'রে ফেললেন সারা যৌবনটা।

বাংলা দেশের মুখ তিনি উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে হাজার হাজার স্বদেশসেবকের মত তিনিও জেল-খাটার গৌরব অর্জন করতে পারতেন।

কিন্তু বোস সাহেব তা করেন নি। বাংলা দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ ক'রে তোলবার আদর্শ নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন ক্যানিং স্ট্রীটে। আদর্শ ছাড়া তাঁর পুঁজি কিছু ছিল না। সেদিন নিজের চেয়ে দেশই ছিল তাঁর কাছে বড়।

আদর্শের কথা ভাবলে বোস সাহেব আজ ভয় পান। আদর্শটা বল্লমের মুখের মত তীক্ষ্ণ হয়ে তাঁর সারা দেহ-মনে খোঁচা মারতে থাকে। না, তিনি আর সে সব অতীত ইতিহাসের কথা ভাববেন না। ভাববার দরকার নেই মনে ক'রে বোস সাহেব হাঁক দিলেন, "বিপিন—বিপিন—"

"এই যে।"—ও-পাশের ঘর থেকে বিপিন এসে দাঁড়িয়ে রইল বোস সাহেবের সামনে।

"রমাপদবাবুকে খবর দিস নি?"

"হ্যাঁ, তিনি আসছেন।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তুই যা।"

ইচ্ছে করলে রমাপদ লিফ্ট্ দিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারত। তা সে গেল না। কি একটা কথা ভেবে দেখবার জন্যেই রমাপদ ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। এই সময়ে বোস সাহেব ওকে ডাকলেন কেন? শনিবার, চারটে বেজে গেছে, এর পরে আর কি কাজ থাকতে পারে? রমাপদ বোধ হয় এ সব কথা ভাবছিল না। সে ভাবছিল, আজ চারমাস এখানে কাজ করবার পরেও, বোস সাহেবকে সে চিনতে পারে নি। তাঁর প্রতি একজন মানুষও খুশি নয়। বাইরের লোকেরা তো তাঁকে অসাধু ব'লেই জানে। এমন কি, এই ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি কর্মচারী পর্যন্ত তাঁকে গাল না দিয়ে জলগ্রহণ করে না। রমাপদও এই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মিশে যেতে পারত। মিশে যাওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল। এ পর্যন্ত সে বোস সাহেবের কাজকর্ম যা দেখেছে তাতে না মেশবার একটা যুক্তিও রমাপদ দেখাতে পারে না।

সিঁড়ি দিয়ে রমাপদ প্রায় অর্ধেকটা পথ ওপরে উঠে এসেছে। এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। দিল্লী যাওয়ার পথে বোস সাহেবের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল রমাপদ। একই কামরায় বোস সাহেবের সঙ্গে ওকে যেতে হয়েছিল। কেল্‌নার কোম্পানির বেয়ারা এসে কামরায় চা দিয়ে যেত। চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "আর এক পেয়ালা খাবে না?"

"না সার্। আর নয়।"

"দু-পাঁচ মিনিট পরে আবার খাবে কি?"

"না সার্, সারা দিনে দু পেয়ালার বেশি আমি চা খাই না।"

"বেশ, বেশ।"—এই ব'লে বোস সাহেব পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চিনির বাটি থেকে বাড়তি চিনিটুকু সব ঢেলে ফেলতেন তাতে। দিল্লী পৌঁছবার আগে পর্যন্ত যত বার কামরায় চা এলো, ততবারই তিনি বাড়তি চিনি সব বেঁধে ফেললেন রুমালে। শেষবার যখন বাঁধছেন তখন তিনি রমাপদর দিকে চেয়ে বললেন, "পয়সা যখন পুরোই দিয়েছি, তখন চিনি সব ফেলে যাব কেন?"

"কিন্তু—" রমাপদ ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত ব'লেই ফেলল, "কিন্তু আপনি তো চিনি খান না সার্, আপনার ডায়বেটিস—"

একটু হেসে বোস সাহেব নেমে পড়লেন দিল্লী স্টেশনে। কুলীর মাথায় সব মাল চাপিয়ে দিল রমাপদ। কিন্তু রুমালে বাঁধা চিনির পুঁটলিটা তিনি নিজের হাতেই ঝুলিয়ে নিলেন। দু পা এগিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনির ওপরে তো কণ্ট্রোল বসেছে। রমাপদ—"

"বলুন সার্।"

"না, চল, কোন ভয় নেই।"

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রমাপদ সেই ব্যাপারটা বুঝে দেখবার চেষ্টা করছিল। বোস সাহেবের মনটাকে বুঝে দেখা দরকার। চিনি খেতে পারেন না ব'লেই কি চিনির প্রতি লোভ তাঁর বেশি?

বাকি সিঁড়িগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে হয়ে এলো রমাপদ। ভাবতে গেলেই ভাবনা বাড়ে। বোস সাহেবের মনের খবর জেনে আর লাভ কি? তিনি তো হিসেবপত্র সব ছেড়ে দিয়েছেন রমাপদর হাতেই। হিসেব-বিজ্ঞানের বেলতলায় নেড়া বোস আর দ্বিতীয়বার যাবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞাও করেছেন। কেন যাবেন? যাবার জন্যে রামপদই রয়েছে। বরানগর থেকে চেতলা পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটটা গুদাম বেনামীতে ভাড়া নেওয়া আছে। ব্যাঙ্কের খাতায় তার হিসেব নেই বটে, কিন্তু বোস সাহেবের পাঁচ আঙুলে হিসেবের টুঁটি আবদ্ধ হয়ে আছে। এবার তিনি গুপ্ত ব্যবসার হিসেব থেকে আঙুল পাঁচটিকে মুক্ত করতে চান। রমাপদ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ওর কাছে হিসেব-ব্যাটার ট্যাঁ-ফোঁ

করবার সাধ্য থাকবে না। এখন কোটি কোটি বেল পড়ল তো বোস সাহেবের ব'য়েই গেল। গুদামগুলোর মাথায় তো আর টাক পড়ে নি যে, বেল পড়বার ভয়ে বোস সাহেব গিয়ে বাবা-বিশ্বনাথের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বেন ? তা ছাড়া, বেলের দফা রফা ক'রে রেখেছে বিশ্বনাথ চৌবে। চেতলার গুদামগুলো সে নিজেই পাহারা দেয়। পুলিস বিভাগ থেকে মাইনে যা সে পায় তার ডবল মাইনে পাচ্ছে সে বোস সাহেবের কাছে। অতএব, বোস সাহেব ভাবলেন, এ থেকে রমাপদ যা শিখবে তার সিকি ভাগ শিক্ষাও সে লাভ করতে পারবে না বুক-কিপিংয়ের বই থেকে। হাজার টাকা ওর মাইনে হয়েছে। আরও দু-চার শো বেশি মাইনে ওর হতে পারত, কিন্তু—

রমাপদ কখন যে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে বোস সাহেব তা টের পান নি। টের পাওয়ার পরে তিনি বললেন, "এসো রমাপদ।"

মাথা নীচু ক'রে রমাপদ ঢুকে পড়ল ঘরে। চোখ মেলে ঘরটাকে ও দেখতে চায় না। দেখতে গিয়ে অনেক দিনই তো ও আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা আজও ওর মনে আছে। ঘরে ঢুকে দেওয়াল-গুলোর দিকে দৃষ্টি ফেলেছিল রমাপদ। দু-চার মিনিট চেয়ে থাকবার পরে ওর মনে হয়েছিল যে, সাদা দেওয়াল চারটে যেন গলা মোমের মত গ'লে যাচ্ছে। শূন্যতার আয়তন বেড়ে গেল নিমেষের মধ্যে! ঘরটাকে আর ত্রিমাত্রিক মনে হচ্ছে না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সব মিলে গিয়ে এক হয়ে গেছে। জ্যামিতির 'জ্যা'টুকু উধাও হয়ে গেছে 'মিতি'র সামনে থেকে।

রমাপদ এসে ব'সে পড়ল বোস সাহেবের সামনে। চেয়ে রইল ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চোখের দিকে। দেওয়ালগুলোকে বড্ড ভয় পায় সে।

বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তো গাড়ি চালাতে জান ?"

"জানি সার্। প্রাইভেট গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আমার আছে।"

"বেশ, তা হ'লে তো আর কথাই নেই, সোনায় সোহাগা। তিন নম্বর গ্যারেজ থেকে ফোর্ড গাড়িখানা বার ক'রে নিয়ে যাও। গাড়িটা একটু পুরনো, তা হোক—এখনও ভাল আছে। তোমার ব্যবহারের জন্যেই গাড়িটা দিলুম। প্রতিদিন দু গ্যালন ক'রে তেলের খরচা বহন করবে ব্যাঙ্ক। গুলজার আলী ড্রাইভারের কাছে চাবি আছে। একটা রসিদ সই ক'রে গাড়ি আর চাবিটা নিয়ে যেয়ো। গ্যারেজের বন্দোবস্ত করবে কোথায় ?"

"আমাদের বাড়িতে একটা গ্যারেজ আছে। বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দিলে তিনি সেটা ছেড়ে দেবেন।"

"ভেরি গুড্।"—বললেন বোস সাহেব। রমাপদ উঠে পড়বার জন্যে এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। উঠে পড়লও সে। বোস সাহেব বললেন, "ব'স, আরও কথা আছে।" ব'সে পড়ল রমাপদ।

ক্যানিং স্ট্রীটে বিন্দুমাত্র আর কোলাহল নেই। সন্ধে হতে এখনো ঘণ্টা-খানেক বাকি। জানলার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিলেন বোস সাহেব। প্রায় বিশ বছর ধ'রে রাস্তাটা দেখছেন তিনি। রাস্তাটা আজও তাঁর কাছে পুরনো হ'ল না। মুখ ঘুরিয়ে বোস সাহেব রমাপদকে বললেন, "এই মাত্র একটা মজা দেখলুম।"

"কোথায় দেখলেন সার্?" কিছু একটা বলা উচিত ব'লেই রমাপদ প্রশ্ন করতে বাধ্য হ'ল। জবাব দিতে দেরি করছিলেন ললিতবিহারী বসু। পকেট থেকে আয়না বার ক'রে নিজের মুখ দেখছিলেন তিনি। রমাপদ জবাব শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বোস সাহেব বললেন, "মজা দেখছিলুম ক্যানিং স্ট্রীটে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন এখানে পায়ের ধুলো দেয়। গায়ের সঙ্গে গা না লাগিয়ে এখানে কেউ হাঁটতেও পারে না। কত উত্থান-পতনের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে ক্যানিং স্ট্রীটের খোয়াগুলোর নীচে। কিন্তু এখন রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা।" এই ব'লে তিনি থামলেন। ছ' ইঞ্চি আয়নাটা তুলে ধরলেন একেবারে তাঁর নাকের ডগা অবধি।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "মজাটা কি দেখলেন তা তো বললেন না সার্?"

আয়নাটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বোস সাহেব বললেন, "জনশূন্য ক্যানিং স্ট্রীটে কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এলো। আমি ওকে লক্ষ্য করছিলুম, দেখছিলুম ক্যানিং স্ট্রীটে ও কেন এসেছে। এখানে তো উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। ও-পাশের বড় বাড়িটার সামনে গিয়ে নেমে পড়ল একবার, তারপর উড়ে এসে কাকটা ব'সে পড়ল আমাদের ব্যাঙ্কের বড় গেটের সামনে। সেখানেও তো উদ্বৃত্তের ছিটেফোঁটাও থাকবার কথা নয়। কিন্তু কাকটা দেখলুম ঠোঁটে ক'রে একটা ভাঁজ-করা কাগজ নিয়ে উড়ে গেল। রমাপদ, কাগজটা কি জানো?"

"না সার্।"

"একখানা বড় নোট ব'লে মনে হ'ল আমার। বোধ হয় কারো পকেট থেকে প'ড়ে গিয়ে থাকবে। ইচ্ছে ক'রে কেউ ফেলে গেছে ব'লে তো মনে হয় না।"

"জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। বাবার বিশ্বাস, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড় থেমে গেলে মানুষ বোধ হয় আর মানুষ থাকবে না।"

বোস সাহেবের যেন সহসা ধ্যান ভেঙে গেল। চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কোনদিন থামবে না কি? আমার বিশ্বাস, থামবে না। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলেও মানুষের মনে মনে যুদ্ধ চলবে। কিন্তু আমি ভাবছি, কাগজখানা যদি একটা বড় নোটই হয় তা হ'লে সেটা তো কাকের কোন প্রয়োজনে আসবে না। কাকটা কোথায় গিয়ে বসল জানো?"

"আমি তো দেখি নি সার্।"

"মনে হ'ল, কাকটা উড়ে গেল বিড়লাদের অফিসের দিকে। রমাপদ—"

"আজ্ঞে—"

"ওদের ছাদের ওপরেই বোধ হয় নোটখানা ফেলে দেবে। কিন্তু বলতে পার, কাকটা ভুল ক'রে চিৎপুরের বস্তির দিকে গেল না কেন?"

"বোধ হয় বড় নোট ব'লেই বিড়লারা ওকে টেনে নিয়ে গেল, উল্টো দিকে।" এতক্ষণ পরে রমাপদ এবার রসিকতার সুর তুলল তার জবাবের মধ্যে। সম্ভবত সেই কারণেই বোস সাহেব চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের হিসেবরক্ষকের মুখে রসিকতার কথা শুনবেন ব'লে তিনি আশা করেন নি। কাকটাকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু বিড়লা আর বড় নোটখানাকে তো হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শীতের সূর্য নেমে গেছে ক্যানিং স্ট্রীটের শেষ সীমায়। জানলায় দাঁড়িয়ে বোস সাহেব দেখলেন, চওড়া রাস্তাটার ওপর লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। একটু পরেই রাস্তার আলোগুলো সব জ্বলে উঠবে। রিজেণ্ট পার্কের নতুন বাড়িতে তাঁর হয়তো আলো জ্বলছে সন্ধে হওয়ার আগেই। সন্ধেবেলা কোন দিনও তিনি বাড়ি ফিরেছেন ব'লে তাঁর মনে পড়ল না।

রমাপদর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "তুমি আসবার পরে ব্যাঙ্কের উন্নতি হচ্ছে প্রতি মিনিটে মিনিটে। ছ' মাস আগেও আমার হাতে উদ্বৃত্ত টাকা

ছিল না।" রমাপদ একটু বিব্রত বোধ করল। টেবিলের দিকে মুখ নীচু ক'রে সে বলল, "ব্যাঙ্কের উন্নতির মূলে আপনারই কৃতিত্ব রয়েছে। আমি তো ব্যাঙ্ক থেকে কেবল নিচ্ছি, এনে দিতে পারি নি কিছুই।"

"এনে দেওয়ার জন্যে তো মাখন গুপ্তরাই রয়েছেন। প্রায় বিশটা বছর বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের দরজা খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে ব'সে ছিলুম। ইচ্ছে ক'রে একটা লোকও সামনের দরজা দিয়ে এখানে ঢুকত না। আমার ঘর থেকে বাইরের দরজাটা দেখবার জন্যে পার্টিশনটা ফুটো ক'রে নিয়েছিলুম। আমার কৃতিত্বের সবটুকুই গ'লে বেরিয়ে গেছে পার্টিশনের ওই ছিদ্র দিয়ে। বিশটা বছর—" এই পর্যন্ত ব'লে বোস সাহেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। স্থির হয়ে ব'সে রইল রমাপদ। ঘরের আবহাওয়ায় অপরিমিত গাম্ভীর্য। বিগত দিনের শত লক্ষ ব্যর্থতার বাষ্পে ঘরটার দেওয়ালগুলো বুঝি ভিজে উঠেছে। রমাপদ ভাবল, বাষ্পটা অপসারিত হয়ে গেলে বোস সাহেবের চরিত্রটা বোধ হয় চলচ্চিত্রের মত ভেসে উঠবে দেয়ালের গায়ে। দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল রমাপদ।

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বোস সাহেব বলতে লাগলেন, "একশোটা টাকা পকেটে নিয়ে আমি কোনদিন একটু শৌখিনতাও করতে পারি নি। প্রায় গোটা ইয়োরোপটাই হিট্‌লারের পদানত হ'ল, আমার পায়ের তলায় মাটি তবু শক্ত হ'ল না। তারপর—"

তারপর রমাপদর মনে হ'ল, বোস সাহেব পা দিয়ে কি যেন একটা টিপে দিলেন। বোস সাহেব বললেন, "তারপর টাকা যখন স্রোতের মত ঢুকে পড়তে লাগল বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে, আমার কৃতিত্বের উৎস তখন শুকিয়ে গেছে। কৃতিত্বের প্রয়োজনই হ'ল না। রমাপদ, ঘুরে ব'সো।"

"কেন সার্?"

"পুব দিকের দেয়ালটায় কি আছে দেখ।"

"দেয়ালটায়?" ঢোক গিলল রমাপদ।

"হ্যাঁ, দেয়ালটায়।"

রমাপদ এবার সত্যিই ঘুরে বসবার চেষ্টা করতে লাগল। ঘুরে বসতে সময় লাগল ওর। অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল, "দেয়ালটায় গর্ত কেন সার্?"

"এটা আমার প্রাইভেট ভল্ট।" এই ব'লে বোস সাহেব এগিয়ে গেলেন

দেয়ালের কাছে। গর্তের দিকে মুখ ক'রে ঘন ঘন নিশ্বাস টানতে লাগলেন তিনি। রমাপদ যেন ব'সে ব'সে ম্যাজিক দেখছে!

"রমাপদ, এগিয়ে এসো এখানে।"

"আসছি সার্।"

বোস সাহেব নীচু হয়ে দুটো হাতই নামিয়ে দিলেন গর্তটার মধ্যে, তারপরে হাত দুটো ওপরে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলো কি?"

গলা শুকিয়ে এসেছে রমাপদর। তা সত্ত্বেও সে জবাব দিল, "এগুলো তো সব গিনি।"

"হ্যাঁ, গিনি। গিনি দিয়ে' গোটা ভল্টটাই ভর্তি ক'রে রেখেছি। রমাপদ—"

গলার স্বর তাঁর চড়তে লাগল। তিনি আবার ডাকলেন, "রমাপদ—।" এর পরে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "রমাপদ, এগুলো সব আমার! এগুলো সব আমার, রমাপদ!!"

রবিবার দিন দুপুরবেলার দিকেই মাধুরী এলো হিন্দুস্থান পার্কে। মাখনবাবু বাড়ি ছিলেন না। পার্ক স্ট্রীটের সাহেব কোম্পানি থেকে কেক কিনতে যাচ্ছেন ব'লে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন বেলা একটার সময়। লতিকা একতলাতেই ছিল। ঠাকুরকে আদা পেঁয়াজ বাটবার হুকুম দিয়ে লতিকা এসে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার দিকের ফটকে। পেছন দিকের উঠোন পার হয়ে লেক অঞ্চলের হাওয়া এসে চ'লে যাচ্ছে কলাপ্সিবল্ গেটের ফাঁক দিয়ে। ঝিরঝিরে হাওয়া। শীতকাল হ'লেও গায়ে হাওয়া লাগাতে ভাল লাগছিল লতিকার। শীত বোধ হয় শেষ হয়ে এলো, বাতাস আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। লতিকার মনের রাজ্যে আজ আর পুব-পশ্চিম-উত্তর ব'লে কিছু নেই, সবটাই দক্ষিণ। কলাপ্সিব্ল্ গেটের ফাঁকে বসন্তের সূচনা ময়ূরের মত পেখম মেলেছে আজ। বাড়ির সামনের পিচঢালা রাস্তাটা পর্যন্ত সুন্দর লাগছে ওর। এই পথ দিয়েই রমাপদ এখানে এসেছে তিন-চার দিন, আজও সে আসবে এই পথেই।

মাধুরী এসে দাঁড়াল গেটের বাইরে। লতিকা বলল, "একটু দাঁড়া ভাই। দিদুর কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে আসি। দাদুর কাণ্ড তো জানিস।

বাইরে থেকে চাবি লাগিয়ে গেছেন।" একটু বাদেই চাবি নিয়ে ফিরে এলো লতিকা। ফাঁক দিয়ে চাবিটা মাধুরীর হাতে দিয়ে সে বলল, "খুলে আয়।"

মাধুরী ভেতরে আসার পর লতিকা আবার বন্ধ ক'রে দিল গেট। উঠোনের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে খুবই বিস্ময়ের সুরে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে ঘরটা তো ছিল না, কবে তৈরি হ'ল?"

"ও মা, তুই কি আগে এটা দেখিস নি?"

"না তো।"

"তা হবে। গত তিন-চার মাসের মধ্যে তো এদিকে আসিস নি। খুব পড়ছিস, না?"

"না, তেমন আর পড়তে পারি কই? আই.এ. পরীক্ষাটা আর একবার তুমি দিয়ে দিতে পারতে।"

"দুবারে যখন পাস করতে পারলুম না—"

কথাটা শেষ করবার আগেই মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি গরু কিনেছ না কি লতুদি? ঘরটা তো গোয়ালের মত মনে হচ্ছে।"

মাধুরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে লতিকা ফিসফিস ক'রে বলল, "দাদুর ওটা কামুফ্ল্যাজ। মাটির নীচে মস্ত বড় একটা ঘর তৈরি করিয়েছেন তিনি। ওখানে সব দামী দামী ওষুধ থাকে। দাদুর সত্যিই ভাই ব্যবসাবুদ্ধি আছে। তাঁর বয়স নেই, নইলে তিনিও সার্ রাজেন মুখার্জির চেয়ে বড় হতে পারতেন।"

চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "মামা তোমায় বুঝিয়েছেন বুঝি? যাক গে এ সব কথা। মামা তো সব সময় আমাদের বলেন যে, তাঁর নাকি টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে। আসছে মাস থেকে আমাদের আর টাকা দেওয়ার দরকার নেই। মামা কোথায় লতুদি?"

"বাড়ি নেই। তোদের ওখানে যান নি তিনি?"

"কই, না তো। আমি কসবার প্রাইমারী ইস্কুলে একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনে যা পাব তাতে আমাদের চ'লে যাবে। তা ছাড়া—"

বাধা দিয়ে লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "কলেজ যাবি কি ক'রে?"

"আমি আর এখন পড়ব না। যদি পারি তা হ'লে বিয়ের পরে।"

"ও মা আমি তো কিছুই জানি না তোর বিয়ের খবর! যাক, ভালই

হ'ল। আমারও সব ঠিক"—এই ব'লে লতিকা মাধুরীকে নিয়ে চ'লে এলো রান্নাঘরে। রান্নার বিরাট ব্যবস্থা দেখে মাধুরী খুবই অবাক হয়েছে। লতিকা বুঝতে পেরে বলল, "দাদু তোকে নেমন্তন্ন করতে নিশ্চয়ই যাবেন। এত রান্না আমি একসঙ্গে পেরে উঠব না ব'লে তোকে খবর দিতে বলেছিলুম। কেবল লেখাপড়া নয়, রান্নাও তুই আমার চেয়ে ভাল জানিস।"

"থাক্ থাক্, এত প্রশংসা ক'রো না। অল্প বয়সে মাথা আমার ফুলে উঠতে পারে।" হাসতে হাসতে মাধুরীই আবার বলল, "বল, কি করতে হবে ?"

"মাছের চপটা বরং তুই কর্, মাধু।"

মেঝের ওপর ব'সে পড়ল মাধুরী। বড একটা ডেকচির মধ্যে ঠাকুর পোনামাছ সেদ্ধ ক'রে রেখেছিল। মাধুরী ডেকচিটা সামনে টেনে নিয়ে পুরটা তৈরি করতে করতে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা লতুদি, আমায় একটা খবর দাও নি কেন ? বিয়ে ঠিক হ'ল, অথচ আমরা জানলুম না !"

"বিয়ে ঠিক কিছু হয় নি, তবে ভদ্রলোকটিকে—" উনোনে চাপানো কড়াইটার দিকে চেয়ে লতিকা বলল, "বোধ হয় ভদ্রলোকটিকে আমি ভাল-বেসেছি।"

ঠিক এই সময় চেঁচিয়ে উঠল ঠাকুর, "কেবল কথাই বলে যাচ্ছ দিদিমণি, এদিকে যে সব পুড়ে গেল !"

"পুড়ে গেল !"—ব'লে উঠল লতিকা।

"কি পুড়ে গেল, ঠাকুর ?"—উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল মাধুরী।

ঠাকুর জবাব দিল, "আমার কপাল দিদিমণি, আমার কপাল। এই দেখ, আলুগুলো সব ধ'রে গেছে। সর দিকি।" লতিকা স'রে এলো মাধুরীর দিকে, একটা কথাও সে বলল না।

নিঃশব্দে কাজ করতে লাগল মাধুরী, করল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। লতিকা চুপ ক'রে ব'সে ছিল মাধুরীর পাশে। ক'টা আলুর টুকরো ধ'রে গেছে ব'লে ঠাকুরটা এমন অদ্ভুত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল কেন ?

হঠাৎ এক সময়ে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "কিসমিস নেই ঠাকুর ?"

"আছে, ওই ঠোঙাটা টেনে নাও।" ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে আলু ভাজতে লাগল। বেশিক্ষণ আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয় মনে ক'রে মাধুরী বলল,

"তোমার হ'ল কি লতুদি? চপ তো আমার হয়ে এলো। নাও, রান্নাবান্না সেরে ফেলো। এর পর গা ধুয়ে কাপড়চোপড় পরতেও তোমার সময় লাগবে। কি রঙের শাড়ি পরবে আজ? ব্লু তোমার রঙ্ নয়। আমি বলি কি, গত পুজোয় যে শাড়িটা মামা তোমায় কিনে দিয়েছিলেন সেটাই আজ পরবে তুমি। এই রইল তোমার চপ। এবার খাওয়ার আগে ঠাকুর যেন শুধু ভেজে দেয়। চল লতুদি, তোমাদের বসবার ঘরটা একবার দেখে নিই। তোমরা কোথায় ব'সে গল্প করবে?"

কোন জবাব দিল না লতিকা। সে উঠে এলো ওখান থেকে। মাধুরীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলো ড্রয়িং-রূমে। মাধুরী দেখল, সেন্টার-টেবিলের ওপর মস্তবড় একটা ফুলের গোছা প'ড়ে রয়েছে। লতিকা বলল, "রান্না শেষ ক'রে ভেবেছিলুম, ঘরটা সাজাব।"

"তোমায় কিছু করতে হবে না। আমিই সব ঠিক ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছি।"

নিজের পছন্দমত ঘর সাজাতে লাগল মাধুরী। চিনেমাটির বড় ফুলদানিটায় ছু ডজন ডালিয়া গুঁজে দিয়ে সেটা বসিয়ে রাখল সেন্টার-টেবিলের মাঝখানে। লম্বা ধরনের ফুলদানিটা রাখল পিয়ানোর ওপর। মাধুরী জানে, পিয়ানোটা কেউ বাজায় না, এটা ড্রইং-রূমের আসবাব। জানলায় পর্দাগুলো সব লাগানোই ছিল। বাড়ির ভেতরের দিকের একটা জানলায়, মাধুরী দেখল, পর্দাটা এক দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সেটাকে টেনে টেনে মেলে দিতে দিতে মাধুরী বলল, "এই জানলাটার দিকে নজর রেখো, লতুদি। মামা কিন্তু করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পর্দা সরিয়ে এখান দিয়ে উঁকি দিতে পারেন। চল এবার তোমার ঘরে। শাড়ির স্টকটা তোমার দেখে আসি।"

আলমারি থেকে এক গাদা শাড়ি বার ক'রে খাটের ওপর ফেলে রাখল লতিকা। ছু নম্বর তাক থেকে টেনে [illegible]মাল ব্লাউজের গাদা। তিন নম্বর তাক থেকে ডজন খানেক পেটিকোটও নামিয়ে আনল সে। সেগুলোকে হাত দিয়ে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে মাধুরী বলল, "সাদা পেটিকোট চলবে না, লতুদি। এসব শাড়ির সঙ্গে সাদা একেবারেই মানায় না। ড্রইং-রূমের আলোর যা রঙ দেখলুম তাতে সাদা পেটিকোট শাড়ির ওপর দিয়ে ফুটে বেরুবে। কিন্তু শাড়ির রঙ কি ঠিক করব? তোমার একলার পছন্দই তো সব নয়, ভদ্রলোকটির পছন্দের কথাও তোমায় ভাবতে হবে। মানুষটি কি রকম, লতুদি?"

"খুব গম্ভীরপ্রকৃতির।"

"তা হ'লে তো খুবই ভাল। তুমি তো গম্ভীর লোকই পছন্দ কর। রুচি কেমন?"

"সে তো ভাই আমায় দেখেই বুঝতে পারছিস।"

"ছি, নিজেকে কখনো ছোট ভাবতে নেই। যাক গে। ভদ্রলোক খুবই শিক্ষিত নিশ্চয়ই? শিক্ষিত না হ'লে মামা বিয়ে দেবেন না তা এক রকম ধ'রেই নেওয়া যেতে পারে। কি করেন ভদ্রলোকটি, লতুদি?"

"ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেণ্ট—এম. কম. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন।"

মাধুরীর হাতে খান তিনেক শাড়ি ছিল। সহসা শাড়ি তিনখানা হাত থেকে প'ড়ে গেল মেঝের ওপর। মুহূর্তের জন্য মাধুরী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রলোকটির নাম কি? অবিশ্যি মুখে যদি তাঁর নাম আনতে তোমার আপত্তি না থাকে—"

"বলিস কি মাধু? কবে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই, নাম মুখে আনতে আপত্তি উঠবে কেন? ভদ্রলোকটির নাম রমাপদ সেন।"

"তা হ'লে এই শাড়িটাই তোমায় মানাবে। রঙটা ভাল। সাচ্চা জরির পাড়। কিন্তু পাড়টা একটু চওড়া বেশি। চওড়া পাড় আজকাল একেবারে উঠেই যাচ্ছে। তোমার জুতোর স্টকটা কোথায়?"

"ওই তো আলনাটার তলায়, কাঠের বাক্সটাতে রয়েছে।"

নিজেকে ভাল ক'রে সামলে নেবার সময় পেল মাধুরী। মুখ ঘুরিয়ে কাঠের বাক্সটার সামনে ব'সে পড়ল। ধীরে ধীরে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলল। বাক্সের ভেতরটা দেখবার জন্যে মুখটা নীচুও করল সে। চোখ দুটোকে শুকনো রাখবার জন্যে একটু আড়াল পেল মাধুরী।

বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে একটা কালো ভেলভেটের চটি বার ক'রে নিয়ে এলো মাধুরী। অত্যন্ত সহজ গলায় সে বলল, "ওই শাড়ির সঙ্গে এটা চমৎকার মানাবে।"

"তা হ'লে এটা এখানেই রাখ্। চল্, একবার রান্নাঘরে যাই। মাধু—" খাটের ওপর থেকে নীল রঙের একটা শাড়ি তুলে নিয়ে এসে লতিকাই বলল, "মাধু, তোর জন্যে এই শাড়িটা রাখলুম।"

"না, লতুদি, আমি তো থাকতে পারব না। চারটে বোধ হয় বাজল। আমি চলি এবার।"

"খেয়ে যাবি না?"

"না।"

"এত কষ্ট ক'রে দাদু বাজার করলেন। সেই ভোরবেলা রাজমোহন শেয়ালদা গিয়ে মাছ যোগাড় ক'রে দিল, চমৎকার মাছ! মাধু, এখানে যদি না খাস, কেষ্টকে দিয়ে রাত্রিতে তোর খাবার আমি পাঠিয়ে দেব।"

"না না লতুদি, কখনো পাঠিয়ো না।" ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে মাধুরী বলল, "মামাকে খবরটা দিয়ো।"

"কি যেন খবরটা?"

সিঁড়ির ওপরে পা রেখে মাধুরী জবাব দিল, "আসছে মাস থেকে আমাদের আর টাকা দিতে হবে না। তালাটা খুলে দিয়ে যাও, লতুদি।"

হিন্দুস্থান পার্কের পিচ-ঢালাই রাস্তাটা পার হতে মাধুরীর আজ অনেকটা সময় লাগল।

কেয়াতলা লেনে এরই মধ্যে অনেক রকমের পরিবর্তন এসে গেছে। রাস্তার দু ধারের গাছগুলো আর নেই। জঙ্গলও অনেক সাফ হয়ে গেছে। যুদ্ধের যত বয়েস বাড়ছে, বড় বড় জমির খণ্ডগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তত বেশি। টুকরোগুলোর চার ধারে প্রাচীর উঠছে। মিত্রশক্তি ইয়োরোপে ফিরে আসার পরে জমির দাম আর উঠছে না। গত ক'বছর ধ'রে তো জমিগুলো কেবল হাত বদলেছে। মালিকেরা কেউ কেয়াতলা লেনে এসে জমিগুলো দেখেও যেতেন না। উনিশ শো বিয়াল্লিশ সনের মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত শশধরবাবুর বাড়ির উল্টো দিকের জমির মালিক ছিলেন এলাহাবাদের নবীন মুখুজ্জে। এপ্রিল থেকে জুলাই মাস অবধি মালিক ছিলেন ঢাকা শহরের সতীশ সরকার। পরের বছরটার খবর আর শশধরবাবু রাখতে পারেন নি। মাসে মাসে নাম বদলাতে লাগল।

ওই জমিটায় এখন বাড়ি উঠছে। বিরাট একটা ম্যানশন। স্বদেশীযুগের কোন্ এক জেল-খাটা কর্মী ব্যবসা ক'রে নাকি দু-তিন বছরের মধ্যে কোটিপতি হয়েছেন। শশধরবাবুর বাড়িওয়ালাও যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে একতলা থেকে দুতলা

পর্যন্ত উঠে এসেছেন। তিনখানা বড় বড় ঘর তুলে ফেলেছেন এরই মধ্যে। রমাপদ বেশি টাকা দিয়ে গোটা বাড়িটাই ভাড়া নিয়ে নিয়েছে। অত অল্প সময়ের মধ্যে কি ক'রে যে এত বিরাট বিরাট ব্যাপার ঘ'টে যাচ্ছে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন শশধরবাবু। রমাপদর জন্যেও অস্থিরতা তাঁর কম নয়। মানুষ তো হেঁটে পথ চলে। রমাপদরও হাঁটবার কথা ছিল। কিন্তু সে তো হাঁটে না, দৌড়য়। না দৌড়লে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি সে করতে পারত না। শশধরবাবু বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

রবিবার দিন বেলা তিনটে না বাজতেই শশধরবাবু বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"সাদার্ন অ্যাভিন্যু আর রসা রোডের মোড়ে। একটু কাজ আছে সেখানে। কেন, কিছু বলবে?"

দরজার দিকে এগিয়ে এসে সুধাময়ী বললেন, "আমায় একটু কসবা নিয়ে চল।"

চাদরটা ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কেন?"

"দোতলার ঘরগুলো তুমি দেখেছ?"

"না, রমাপদর এলাকায় আমার যাওয়ার দরকার নেই।"

"আমি তো আর চোখে দেখতে পারছি না, ঘর তিনখানা দিনরাত খাঁ-খাঁ করে

চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে শশধরবাবু বললেন, "রমাপদ তো দুজন লোক রেখেছে, তারা তো ওর সংসারটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখতে পারে। আমি চলি, সাড়ে তিনটের মধ্যে পৌঁছতে হবে।"

"মাধুরীর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।"

"কাল গেলেই চলবে। তা ছাড়া, মাধুরীকে বিয়ে করবার মত উপযুক্ত পাত্র নয় রমাপদ।"

"ওমা সে কি কথা! হাজার টাকা মাইনে হয়েছে, কোম্পানি থেকে গাড়ি পেল, দোতলায় তিনখানা ঘর—কাল থেকে তো খোকা টেবিলে ব'সে ভাত খাবে। কি সুন্দর একটা টেবিল কিনেছে খোকা!"

"অমন সুন্দর টেবিলটা এঁটো করতে খোকার সংস্কারে বাধবে না?"

"কাঠ তো কখনো এঁটো হয় না। হাজার টাকার মাইনের লোক যদি টেবিলে ব'সে না খায়, তবে কোম্পানি ওকে এত টাকা মাইনে দেবে কেন ?"

কথা শুনে শশধরবাবু একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। ঘাড়ের ওপর চাদরটা ঠিকমত বসানো আছে কি না দেখে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

বাইরে বেরিয়ে এসেই শশধরবাবু যেন ধাক্কা খেলেন বড় ম্যানশনটার সঙ্গে। সবে তো কেবল তিনতলা উঠেছে, আরও তিনতলা উঠবে। ম্যানশনটা যেন শশধরবাবুর নাকের সামনে লম্বা হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। মাথা নিচু ক'রে শশধরবাবু চ'লেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় ডান দিক থেকে একজন রাজমিস্ত্রী এসে বলল, "এই যে বাবু, সেলাম। এই বাড়িটায় আমি কাজ করছি। আর আট মাস খানেক লাগবে। আপনার বাড়ির কি হবে ? আরো দুটো তলা যদি না তুলতে পারেন তা হ'লে ওখানে থাকবেন কি ক'রে ? রোদ আর বাতাস তো সব রুখে দেবে এই বাড়িটা। আমার নাম আকবর আলি মিস্ত্রি। বালিগঞ্জের বাড়িওলা বাবুরা সবাই চেনেন আমায়।"

"ওটা তো আমার ভা়ড়া বাড়ি—মাসে মাসে টাকা গুনে দিতে হয়।"

আকবর আলি মিস্ত্রি পলক ফেলবার আগেই ডান দিকে ইটের পাঁজার পেছনে স'রে পড়তে যাচ্ছিল। শশধরবাবু ডাকলেন, "একটু দাঁড়াও মিস্ত্রি।"

"তাড়াতাড়ি বলুন বাবু, ওদিকে কাজের বড্ড তাড়া আছে। সময় নেই।"

হাসলেন শশধরবাবু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ে সাধারণ মানুষেরও মনের বাঁধন ভেঙে গেছে। কী আশ্চর্যরকম ভাবে সব রকম মূল্যবোধে পরিবর্তন এসেছে। বাড়ির ওপরতলা তুলবার প্রতিশ্রুতি দিলে আকবর আলির সময়ের অভাব হ'ত না, থাকত না কাজের তাড়া। তেমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না ব'লে আকবর আলী যাওয়ার সময় একটা সেলাম পর্যন্ত জানাতে ভুলে গেল।

এসব কথা আকবর আলীকে ব'লে কিছু লাভ হবে না। বললেনও না। ইটের পাঁজার দিকে এগিয়ে শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ির মালিক কে মিস্ত্রি সাহেব ?"

প্রশ্ন শুনে আকবর আলী এমন একটা মুখের ভঙ্গি করলে যে, শশধরবাবু এবার স্পষ্টভাবেই হেসে উঠলেন।

"হাসছেন যে বাবু ?"

"না, এমনিই। বাড়িটা বেশ বডই হচ্ছে।"

"তা হবে না, বাবুর যে অনেক টাকা।"

"কি নাম ?"

"মতিলাল সেন। বড্ড ভাল মানুষ। খদ্দর পরেন। হাঁটুর নীচে কাপড় নামে না। কত টাকা যে তিনি গরীবের জন্যে বিলিযে দিয়েছেন তার হিসেব কেউ রাখে না।"

"কি ব্যবসা করেন মতিলালবাবু ?"

"ঠিকেদার। তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে রাস্তা তৈরি করছেন। বর্মার জঙ্গলে গিয়ে দেখুন, মিলিটারিদের পৌঁছবার আগে মতিবাবু গিযে পৌঁছে গেছেন। তিনি রাস্তা তৈরি ক'রে না দিলে মিলিটারিরা চলবে কি ক'রে ? আর এই ইংরেজই মতিবাবুকে একদিন জেলে পাঠিযেছিল! কি বাবু, চুপ মেরে গেলেন যে ?"

"না, চুপ মেরে যাই নি, ভাবছিলুম ইংরেজদের কথা। ওরা বড্ড চালাক জাত হে মিস্ত্রি। জেলে গিয়ে মতিবাবু ভেবেছিলেন, ইংরেজরা তাঁকে শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয মতিবাবুর সেটা ভুল ধারণা। ওরা মতি-বাবুকে শাস্তি দিচ্ছে এখন। তাঁর টাকা যত বাড়বে শাস্তি বাড়বে তত বেশি।"

"কি যে বলেন বাবু!" আকবর আলী স'রে পড়ল। শশধরবাবুও আর অপেক্ষা করলেন না। সাড়ে তিনটের মধ্যে রসা রোডের মোড়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে। মারওয়াড়ী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আজ পাকা কথা হযে যাবে। রবিবার ব'লে তিনি বাড়ি থাকবেন আজ। শশধরবাবু পা চালিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন সাদার্ন অ্যাভিন্যুর দিকে। তিরিশ বছর মাষ্টারি করবার পরেও তাঁর পথ চলতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। কেয়াতলা লেনের দক্ষিণ দিকের মোড়ে এসে থামলেন তিনি। এখানেও একটা মস্ত বড় ম্যানশন তৈরি হচ্ছে। এগুলো সব দাঁড়িয়ে থাকবে কিসের ওপরে ? চরিত্র ছাড়া সংসারের কোন কিছুই তো দাঁড়াতে পারে না ব'লে শশধরবাবুর বিশ্বাস ছিল।

রমাপদ তৈরি হচ্ছিল। চারটে বাজতে আর বেশি দেরি নেই। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু রমাপদর ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে সম্পর্ক নেই অনেক দিন থেকে। ওর ধারণা, বাংলা দেশের অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণটা ও খুঁজে বার করতে পারে ওই সব ধুতি-পাঞ্জাবির মধ্যে। সেই জন্যেই বাঙালীরা ব্যবসা করতে পারে নি। ওর হাতে ক্ষমতা থাকলে ধুতি-তৈরির কলগুলো সব বন্ধ ক'রে দিত। ইংরেজদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। বিলেত থেকে কাপড়ের কল আমদানির জন্যে বাঙালীদের অনেক রকমের সুবিধা ক'রে দিচ্ছে ওরা।

বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় 'টাই' বাঁধছিল রমাপদ। এই টাই-টা লতিকা ওকে উপহার দিয়েছে। নতুন ডিজাইনের জিনিস এটা। ছোট্ট এক টুকরো কাপড় বটে, কিন্তু ওর ওপরে বড় বড় গাছ আঁকা রয়েছে। গাছের তলায় সবুজ রঙের বুনো ঘাস। ছ মাস আগেও কেয়াতলা লেনে রমাপদ প্রত্যেক দিনই এই রকমের বুনো ঘাস দেখতে পেত। এখন সেসব নেই। আয়নার দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল রমাপদ। লম্বা লম্বা বুনো ঘাসগুলোর ফাঁক দিয়ে কি একটা দেখা যাচ্ছে যেন? একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ। লতিকা ভাল টাই কিনেছে। আমেরিকা থেকে নতুন আমদানি হয়েছে এগুলো। আমেরিকার সৈন্য সব ভারতবর্ষে আসছে ব'লে কি অদ্ভুত উপায়েই না ভারতবর্ষেব সব প্রসিদ্ধ জিনিসের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছে। শুধু এই টাইটার মধ্যেই ভারতবর্ষের তিনটে প্রসিদ্ধ জিনিস দেখতে পেল রমাপদ—বড় গাছ, বুনো ঘাস আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ভাল ক'রে নজর দিতে গিয়ে আরও একটা প্রসিদ্ধ জিনিস চোখে পড়ল ওর। জিনিসটা ভারতবর্ষের নয়, আমেরিকার। একটি যুবতী মেম সাহেব রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পিঠে ব'সে লাকি স্ট্রাইক ফুঁকছে। সিগারেটের নামটা খুব ছোট ক'রে লেখা বটে, কিন্তু রমাপদ পড়তে পারল তা। লতিকার রুচির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল ওর। ভারত-মার্কিন সংস্কৃতি বিনিময়ের প্রতীক হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা চলবে। গলার নীচে গিঁট বাঁধল রমাপদ।

ঘরে ঢুকলেন সুধাময়ী দেবী। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "এমন সঙ্ সেজে কোথায় যাচ্ছিস রে, খোকা? ছি-ছি, এমন দৃশ্য দেখলে মাধুরী বোধ হয় ভয়ই পাবে।" বলতে বলতে সুধাময়ী দেবী এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন রমাপদর

পাশে, আয়নাটার সামনে। লজ্জা পেয়ে তিনি এক ধারে স'রে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, "ছি-ছি, শরীরের সব কিছুই যে এতে ভেসে ওঠে! এত বড় আয়না কিনলি কেন খোকা?"

রমাপদ মায়ের ছু কাঁধে হাত রেখে বলল, "রাত্রিতে খাব না। ফিরতে দেরি হবে মা। নেমন্তন্ন আছে।"

"আমি যে নতুন গুড় দিয়ে পায়েস তৈরি করলুম!"

"রেখে দাও, কাল খাব।"

"তুই কিসমিস খেতে ভালবাসিস ব'লে ওতে কিসমিস দিয়েছি খোকা। কোথায় যাচ্ছিস নেমন্তন্ন খেতে?"

জবাব দিতে দেরি করল রমাপদ। জবাব যখন দিল তখন সে সত্যি জবাব দিল না।

একটু পরে সুধাময়ী দেবী বললেন, "মাধুরীর মা তোকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবেন ব'লে কতদিনই তো আমায় বললেন। কিন্তু তোর হয়ে তাঁর নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে আমি সাহস পাই নে।"

"কেন মা?"

"আজকাল তোকে আমি ভয় পাই খোকা, যদি ওদের অপমান করিস?"

তর্ক ক'রে কোন কিছুই আর বোঝাতে চাইল না রমাপদ। সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার সময় লতিকার উপহার দেওয়া টাই-টা গলা থেকে খুলে ফেলে রেখে দিয়ে গেল আলনার ওপর।

মাধুরী চলে যাওয়ার পরে লতিকা রান্নাঘরের কাজ শেষ ক'রে গা ধুতে গেল। ওর মনের রাজ্যে দক্ষিণের হাওয়া বইলেও চান-ঘরের ঠাণ্ডা ও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। মাধুরীর পছন্দ ক'রে দেওয়া শাড়িটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল লতিকা। এত বেশি ক'রে নিজেকে সাজাবার কোন দরকার আছে কি? বিয়ের রাত্রি পার হয়ে গেলেই তো রমাপদ ওর স্বাভাবিক চেহারাটাই দেখবে। তখন যদি ওর ভাল না লাগে? যে ক'দিন রমাপদ এখানে এসেছে সব ক'দিনই তো লতিকার আসল চেহারা সে দেখতে পায় নি। লতিকার বিশ্বাস, তার গায়ের রঙ কালো না ফরসা তাও রমাপদ

সঠিক ভাবে বলতে পারবে না। দাদুর মতলব যাই হোক, তার নিজের মতলবে যেন কোন রকম ফাঁকি না থাকে। রমাপদর সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মিশতে চায় লতিকা। ঘরে যেমন ক'রে মিলের শাড়ি পরে ঠিক তেমনি ভাবে শাড়ি প'রে লতিকা রমাপদর সঙ্গে লেকের দিকে বেড়াতে যেতে চায়। রমাপদ ওর সব দেখুক। যতটা কাছে আসা চলে ততটা কাছে আসুক সে। এমন ব্যবস্থার মধ্যে ভয় আছে অনেক, কিন্তু অপমান নেই। দাদুর সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে ভাল। এ পর্যন্ত তিনি মেয়ে দেখাবার জন্যে কম লোক তো ডেকে আনেন নি। পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে লতিকা সেজে-গুজে উপস্থিত হয়েছে পাত্র-পক্ষের সামনে। তাঁরা দেখে গেছেন। ব'লে গেছেন চিঠি লিখে দাদুকে তাঁরা তাঁদের মত জানিয়ে দেবেন। একটা চিঠিও দাদুর কাছে আসে নি। চিঠি পাওয়ার জন্যে যতদিন দাদু অপেক্ষা ক'রে থাকতেন ততগুলো দিনই লতিকা অপমানের জ্বালায় তিলে তিলে পুড়ে মরত।

এবার আর পুড়ে মরবার ভয় নেই। রমাপদ যদি কাছে এসেও ওকে একদিন প্রত্যাখান করে, তাতে অপমানের কিছু থাকবে না। রমাপদকে সে ভালবাসার চেষ্টা করছে। রূপগুণের অভাব আছে ওর। ভালবাসার তো অভাব নেই। আই. এ. পাশ করবার জন্যে কি কঠোর পরিশ্রমই না সে করেছে, কিন্তু ভালবাসা ! কি তা জানবার জন্যে এক ইউনিট ইলেকট্রিসিটিও পোড়ায় নি। দাদুর সংসারে এমন একজন লোকের সঙ্গেও পরিচয় হয় নি, যার কাছে ভালবাসার অর্থ সে বুঝতে পারত। দেশ যদি সভ্য হ'ত, তা হলে দাদু কখনো বিচারকের আসনে বসতে পারতেন না। বিচারকের যত আইন-জ্ঞানই থাক না কেন, ভালবাসার আইন তাঁকে জানতে হবে আগে।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল লতিকা। ডান দিকে একটা পিরিচের ওপরে দৃষ্টি পড়ল ওর। পেস্টাটাক পুরু সর রয়েছে ওখানে। বেশ হলদে সর। প্রত্যেক দিনই দুপুরের দিকে মুখে আর হাতে সর মেখে লতিকা শুতে যায়। বেলা চারটে পর্যন্ত শুয়ে থাকে। তারপর মুখ ধুয়ে আবার তাতে নতুন প্রসাধনের প্রলেপ লাগায় সে। কালো রঙটাকে লুকিয়ে রাখতে অসুবিধে হয় না ওর।

আজ সে কিছুই আর লুকবে না ব'লে ঠিক করল। শাড়ি-ব্লাউজের স্তূপ প'ড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। সে দিকে দৃষ্টি দিল না লতিকা। জর্জেট,

শিফন, সিল্ক আজ থাক্। ঢাকাই বুটিদারেরই বা দরকার কি? গৃহলক্ষ্মী-মার্কা শাড়ির ষাট নম্বর সুতোর স্বল্প-মসৃণতা আজ ওর গায়ে লাগুক।

মাধুরী চ'লে যাওযার পরে বাইরের গেটে তালা লাগায নি লতিকা। খোলাই ছিল। আবার এসে লতিকা এখানে দাঁড়াল। ঝিরঝিরে হাওয়া তখনো বন্ধ হয নি। রমাপদর আসবার সময় হয়েছে। পাঁচটাই বোধ হয বাজে। উল্টো দিকের বাড়ির ওপরের তলার ভদ্রলোকটি গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করছেন। একটু পরে ভদ্রমহিলাও নেমে এলেন। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন? ছবি দেখতে। সামনের দিকে গাড়িটা বার ক'রে নিযে এসে ভদ্রলোকটি বললেন, "শিগগির এসো, টিকিট কাটতে হবে।"

মহিলাটিকে দেখে লতিকা অবাক হয়ে গেল। এই তো সেদিন ওঁদের বিয়ে হ'ল, এর মধ্যেই মহিলাটি মা হতে যাচ্ছেন! ওঁদের বিয়ের মাসটা স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল লতিকা। দু দিন বিরামহীন বৃষ্টি হচ্ছিল কলকাতায়। লতিকার স্পষ্ট মনে আছে, ট্যাক্সি থেকে বউকে নিয়ে ভদ্র-লোকটি নামলেন। বাডির চাকর দৌডে এসে ওঁদের মাথায় ছাতি ধরল। আত্মীয়-স্বজন কেউ এখানে থাকেন না, সেদিন যে কেউ ছিলেন না সে সম্বন্ধে লতিকার কোন সন্দেহ নেই। পরে শোনা গেল, ওঁদের তিন আইনে বিয়ে হয়েছে। আরও দু-চারটে কথা যে লতিকার কানে আসে নি তা নয়।

লতিকা এবার মনে মনে মাসগুলো গুনতে লাগল। গুনতে ওর কোন ভুল হ'ল না। ছ মাসের বেশি হয় নি। দুটো মাস যদি ফাউ দিয়েও দেয় লতিকা, তা হ'লেও যে আট মাসের বেশি হচ্ছে না? সঙ্গে সঙ্গে রমাপদর কথা মনে পড়ল। আতঙ্কে সারা শরীরটা কেঁপে উঠল ওর। ভদ্রলোকটি রমাপদর চেয়ে কম শিক্ষিত নন। তবে? না, লেকের দিকে বেড়াতে যাওয়ার দরকার নেই। হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতেই রমাপদ ওকে দেখুক। সেইটেই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হবে মনে ক'রে লতিকা ফটকটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। রমাপদ এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কেকের বাক্স হাতে নিয়ে মাখনবাবুও এলেন।

রমাপদ গাড়িতে আসে নি। ড্রইং-রুমে পৌঁছবার পরে মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "অফিস থেকে একটা গাড়ি পেয়েছ শুনলুম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে গাড়িতে এলে না কেন?"

জবাব দিল লতিকা। সে বললে, "এইটুকু তো রাস্তা, গাড়িতে আসবার দরকার কি, দাদু? গাড়ি একটা থাকলেই দেখাতে হবে নাকি?" গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরে ব'সে আছেন ভদ্রলোকটি, সেই ছবিটা ভেসে উঠল লতিকার চোখের সামনে। মাখনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "না না, দেখাতে হবে কেন? গাড়ি ক'রে তোরা তো একটু লেকের দিকটা ঘুরে আসতে পারতিস। তোমরা ব'সো—" ঘরের বাইরে গিয়ে তিনিই আবার বললেন, "জায়গা থাকলে আমিও না হয় তোদের সঙ্গে একটু হাওয়া খেয়ে আসতুম।"

লতিকা জানে, গাড়ি ক'রে লেকের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দাদু এসে আগেই ব'সে থাকতেন রমাপদর পাশে।

মাখনবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পরে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার তোমার, সাজসজ্জা নেই কেন?"

"সবই তো আছে। কোন কিছু কম দেখছ নাকি?"

হাসল রমাপদ। হিসেব-বিজ্ঞানে সে কৃতীপুরুষ। যা ছিল তা থেকে কিছু খোয়া গেলে সে যদি ধরতে না পারে তবে বোস সাহেব ওকে এত টাকা মাইনে দিচ্ছেন কেন?

এই কথাটাই সরলভাবে বলল রমাপদ, "জমার অঙ্ক থেকে অনেকগুলো জিনিস আজ বাদ পড়েছে। এই ধর, প্রথম যেদিন এলুম সেদিন তোমার কানে ছিল দুল। ভয় পেয়েছিলুম দেখে।"

"কেন?"

"ডিজাইনটা ছিল নেপালীদের ভোজালির মত।"

"ইস্পাতের তো ছিল না। সোনার ভোজালি কাটে না।"

হিসেব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পরীক্ষা দেবার জন্যেই যেন রমাপদ আবার বলল, "পরের দিন যখন এলুম, তখন তোমার কানে ছিল কানপাশা। করাতের ডিজাইন, কানের গায়ে লেপ্টে ছিল। ওটার তো যেতে আসতে দুদিকেই কাটবার কথা। কিন্তু দেখলুম তোমাকে কাটে নি। তাই দ্বিতীয় দিন আমি আর ভয় পেলুম না।"

এরই মধ্যে মাখনবাবু জানলার পর্দা সরিয়ে দুবার উঁকি দিয়ে ঘরটা দেখে

গেছেন। লতিকা লক্ষ্য করেছে দুবারই। এতে অপমান বোধ করে লতিকা, কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায় নেই ওর।

বাইরের দরজায় কলিং-বেল বাজছিল। লতিকা বলল, "তুমি একটু ব'স, দেখে আসি। দাদু তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিলেন, কাজের সময় তিনি আর নেই। তুমি ব'সে চা খাও, আমি এলুম ব'লে।"

কেষ্ট চা নিয়ে এসেছে। চায়ের সঙ্গে এনেছে মাংসের ঘুগনি আর চপ। লতিকা সব রমাপদর সামনে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বাইরের ফটকের দিকে।

লতিকা পৌঁছবার আগে মাখনবাবু পৌঁছে গেছেন। গাড়িতে সদাশিব রায় ব'সে ছিলেন। মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "পায়ের ধুলো দেবেন না বেয়াই মশাই?"

"দিতে পারলে ভালই হত, কিন্তু দেহটা আমার দেখছেন তো, ওঠানামা করতে গেলে মনে হয় গিরিলঙ্ঘন করছি। ত্রিশ অশ্বশক্তির ফোর্ড গাড়িও বেলুড় পর্যন্ত পৌঁছতে হাঁপিয়ে পড়ে। ওখানে কে? লতু মা নাকি?"

"হ্যাঁ, দাদু।"

"কাছে আয় মা।"—অনুরোধ করলেন সদাশিব রায়।

লতিকা গাড়ির সঙ্গে লেগে দাঁড়াল। সদাশিব রায় দু বারের চেষ্টায় ডান হাতটা তুলে এনে ফেলে রাখলেন গাড়ির দরজার ওপর। আঙুলগুলো কোন রকমে লতিকার ঘাড়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছিস, লতু? চেহারার এমন হাল হয়েছে কেন? চ'লে আয় আমার ওখানে, হপ্তায় পাঁচ বার ক'রে আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতে পারবি—ব্যারাম সব সেরে যাবে।"

"ব্যারাম? আমার তো কোন ব্যারাম নেই, দাদু।"

"মানুষ হ'লেই তার ব্যারাম থাকবে রে, লতু। এখুনি চল্ না আমার সঙ্গে?"

মাখনবাবু এবার বললেন, "রমাপদ এসেছে বেয়াই মশাই।"

"তাই নাকি? ডাক্ না ছোঁড়াটাকে একবার দেখি। লতু, তোদের ওই বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে বেয়াই মশাই তো আমার অনেক টাকা নিয়ে মজুত করলেন। ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞাসা করিস তো, কবে ওরা দরজা বন্ধ করবে।"

লতিকার রাগ হ'ল খুব। ঘাড়টা সে একটু সরিয়ে নিয়ে এলো বাইরের দিকে। ওর ঘাড় থেকে সদাশিব রায়ের আঙুলগুলো আলগা হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সদাশিব রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "রাগ করলি নাকি, লতু?"

"তোমার অনেক টাকা আছে ব'লে এমন আস্পর্ধার কথা বলতে পারলে! বাঙালী ছেলেরা এই তো সবে ব্যবসা শুরু করল। ওদের ব্যবসা-বুদ্ধি নেই এখন তো আর তুমি তা বলতে পারবে না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি ব্যবসা মাড়োয়ারীরাও করতে পারত না। দাদু, বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে তুমি আরও টাকা দাও।"

"তুই যখন বলছিস, নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু বাঙালী ছেলেদের ব্যবসা-বুদ্ধি বেড়েছে ব'লে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে আমি টাকা রাখি নি।"

"তবে?"—জিজ্ঞাসা করল লতিকা।

"টাকা দিয়েছি রমাপদর জন্যে। ও-ব্যাঙ্কের চল্লিশ ভাগ শেয়ার আমিই তো কিনে ফেললুম। লতু, এক কাজ কর্ না। রমাপদকে বল্ একটা আলাদা ব্যাঙ্ক চালু করতে। আমি একাই পাঁচ-দশ লাখ দিতে পারব। তোরা দুজনে মিলেই যদি ব্যাঙ্কটা চালাতে পারিস, তা হ'লে রাত্রিতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। ..সেস গুপ্ত কেমন আছেন বেয়াই মশাই?"

মাখনবাবু যেন ধ্যানে ব'সে ছিলেন। তন্ময় হয়ে তিনি সদাশিব রায়ের পাঁচ-দশ লাখের বর্ণনা শুনছিলেন। সাপুড়ে সদাশিব রায়ের পাঁচ-দশ লাখের বাঁশী শুনে অজগর মাখন গুপ্ত যেন এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর দিকে। মাখন গুপ্তর পেটের পরিধি কম নয়।

সদাশিব রায়ের প্রশ্ন শুনে মাখনবাবু এবার বললেন, "মিসেস গুপ্তের তো পেট গরম—দিনরাত শুয়েই থাকেন। তিনি আজও দক্ষিণেশ্বরের নাম শোনেন নি।"

"বলেন কি বেয়াই মশাই? সারা জীবন তবে তিনি শুনলেন কি? কথামৃতের দু-চার পাতাও কি তিনি পড়েন নি?"

"না।"

"তা হ'লে সারা জীবন তিনি পড়লেনই বা কি?"

"ফিকশন, বেয়াই মশাই, ফিকশন। 'চরিত্রহীন' তাঁর আগাগোড়া মুখস্থ।"

"এমন মানুষের পেট গরম তো হবেই।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সদাশিব রায় আবার বললেন, "আমি চলি লতু। আমার ওখানে কবে আসছিস? রমাপদকে সঙ্গে নিয়ে আসিস।"

"আমিও ওদের সঙ্গে আসব বেযাই মশাই।"

"আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার আর কষ্ট করার দরকার নেই। ড্রাইভার, চলো।"

"কিন্তু ওদের তো এখনো বিয়ে হয় নি, একসঙ্গে যাবে কি ক'রে?"

কথা শুনে সদাশিব রায় হেসে উঠলেন। হাসি থামবার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "রমাপদর গাড়ি নেই?"

"আছে।"

"তা হ'লে লতু মা যেন দরজার দিকে একটু হেলে বসে। দু'জনের মাঝখানে একটু ফাঁক থাকলেই হ'ল। ভয় পাচ্ছেন কেন বেযাই মশাই? লতু মাও কি 'চরিত্রহীন' মুখস্থ করেছে নাকি? চলো ড্রাইভার।"

ত্রিশ অশ্বশক্তির গাড়িতে টান পড়ল। বুড়ো ফোর্ডের পেছনের পাইপ দিয়ে ধোঁয়া বেরল প্রচুর। বাড়ির সামনেই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কোথায় গেলি, লতু?"

দুজনের মাঝখানে যেন ধোঁযার প্রাচীর উঠেছে আজ!

লতিকার মনের রাজ্যে আনন্দের ঝড় এলো। রমাপদর মুখে ও শুনেছে, বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের একজন কেবল বেশি-মাইনে-পাওয়া কর্মচারী সে নয়, ব্যাঙ্কের অংশও রমাপদ। বাঙালী-প্রতিষ্ঠানটি পুঁজির অভাবে আর কোনদিনও কষ্ট পাবে না। লতিকার কথায় দাদু ওদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে পারেন। ব্যাঙ্কটা যেন একদিন বিরাট বটবৃক্ষের মত ডালপালা ছড়িয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তেমন স্বপ্ন দেখে রমাপদ। ললিতা এখন রমাপদর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার পথ পেয়েছে। এমনি ক'রেই ব্যাঙ্কের মত লতিকারও ভালবাসার বটবৃক্ষ একদিন শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে চারদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করবে। রমাপদর কাজের অংশ নিচ্ছে সে। লেকের দিকে না গিয়েও যে লতিকা তার রূপগুণহীন জীবনটা রমাপদর সামনে খুলে ধরতে পারবে তেমন আত্মবিশ্বাসের মধ্যে ও সত্যিকার ভালবাসার স্বাদ পেল আজ। যে ভালবাসার মধ্যে ত্যাগের মহিমা নেই তার প্রতি লোভ নেই লতিকার। ড্রইং-

রুমে এসে পৌঁছবার আগে আরও একটা কথা মনে হ'ল ওর। ভালবাসার বিশেষণ কি কেবল ত্যাগের মহিমা? স্থূল এই দেহটার বাইরে কি ভালবাসার প্রকাশ নেই? আছে কি নেই তা ভেবে দেখবার অনেক সময় পাবে লতিকা। রমাপদর খুব কাছে যাওয়ার এখন দরকার নেই। দুজনের মাঝখানে যে দূরত্বটুকু আছে তা এখন থাক্। দূরত্ব না থাকলে বোধ হয় আকর্ষণও থাকে না।

কথা হচ্ছিল রমাপদর সঙ্গে। সদাশিব রায়ের প্রত্যেকটি কথা লতিকার মুখ থেকে শুনল রমাপদ। উত্তেজনার তাপে রমাপদর সর্বাঙ্গ উষ্ণ হয়ে উঠেছে। বিলিতী সার্জের গরম কোট পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বরকত আলী দর্জির পাকা হাতের সেলাই-করা কোট না হ'লে রমাপদ বোধ হয় ফেটে চৌচির হয়ে যেত। ওর আজ এই প্রথম মনে হ'ল যে, লতিকার বাইরেটা দেখে যে চ'লে যাবে সে ঠকবে। বিয়ের আগেই যে-মেয়ে তার ভবিষ্যৎ-জীবনের অংশীদারকে এমন সহজ ও সাবলীল ভাবে বুঝতে পেরেছে তাকে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। এমন মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখতে গেলে তিনগুণ মূল্য দিয়ে নিজের হাতে একদিন সে-দূরত্বকে মুছে দিতে হবে। রমাপদ ভাবল, মাখন গুপ্তকে বাবা চেনেন, লতিকাকে চেনেন না।

খাওয়ার টেবিলে ব'সে মাপদ ভাল ক'রে খেতে পারলে না। ওর স্বপ্নের জাল ছেয়ে ফেলল সারা টেবিলটাকে। বিরিয়ানি কখন খেল মনে রইল না ওর। মাংসের প্যাটিলের স্বাদ স্মরণ নেই। চোখের সামনে কোরমার টুকরোগুলো প'ড়ে রয়েছে তাও সে দেখতে পাচ্ছে না। খাওয়ার টেবিলটা যেন হয়ে উঠল বাংলা দেশের মানচিত্র। সোনার বাংলা! কলকারখানায় সারা দেশ ছেয়ে গিয়েছে। কলকাতা ছাড়াও আরও বন্দর উঠেছে গজিয়ে। দিনরাত মাল উঠছে বড় বড় জাহাজে। তিনতলা বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ওপর আরও তিনতলা উঠেছে। রমাপদ সেখানে ব'সে কেবল টাকা দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে বাঙালী-ব্যবসায়ীদের। নতুন বাংলার ব্যবসায়ী পুরুষ এরা।

নিঃশব্দে কোরমার টুকরোগুলো নাড়াচাড়া করছিল রমাপদ। মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "খাচ্ছ না যে? কি ভাবছ?"

"বাঙালী ছেলেরাই বোধ হয় বাংলা দেশে এবার শিল্প-বিপ্লব আনবে।

আপনার কি মনে হয়?" এক টুকরো মাংস এবার রমাপদ মুখে তুলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মাখনবাবু বললেন, "এটা খেয়ো না, এটা খেয়ো না—ওতে একটুও মাংস নেই, সবটুকু চর্বি।"

"দাদু, এ মাংস তো গড়িয়াহাট বাজারের নয়? বড্ড বেশি চর্বি।"

"ঠিকই ধরেছিস। হগ্ সাহেবের বাজার থেকে এনেছি। গ্র্যাম-ফেড, ছোলা ছাড়া খাসীগুলোকে আর কিছু খেতে দেয় না। পেট ভ'রে খাও রমাপদ, দায়িত্ব বহন করতে শক্তির দরকার।"

"খাচ্ছি। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের কথাটা কি আপনি স্বীকার করেন না?" —নতুন একটা মাংসের টুকরো চিবতে চিবতে প্রশ্ন করল রমাপদ।

"আরে ভাই, আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার বয়েসের লোক বিপ্লব কথাটার মানেই ভুলে গেছে! তবে হ্যাঁ, বিপ্লব তো আসবে কারখানায়, কিন্তু বাঙালীর হাতে কারখানা কই? যা আছে তাতো সব কুটিরশিল্প। ও কি, আর খাবে না?"

"আর খিদে নেই। অনেক খেয়েছি। সন্ধের সময় সবগুলো চপই খেয়ে ফেলেছি। এত ভাল চপ আমি কখনো খাই নি।"

রমাপদর মন্তব্য শুনে মাখনবাবু আনন্দের আতিশয্যে প্রায় লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু লতিকার পরের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। লতিকা বলল, "চপ তৈরি করেছে মাধুরী।"

"মাধুরী এসেছিল না কি?" জিজ্ঞাসা করলেন মাখন গুপ্ত।

"দুপুরের দিকে এসেছিল "

"ও, হ্যাঁ, আসবেই তো। আমিই বোধ হয় আসতে বলেছিলাম।"

"না দাদু, তুমি ওকে বলতে ভুলে গেছ।"

"ও, হ্যাঁ, ভুলেই গেছি, তাই তো! কেন এসেছিল রে?"

"আসছে মাস থেকে ওদের আর মাসে মাসে টাকা দিতে হবে না। কসবার প্রাইমারী ইস্কুলে মাধুরী একটা চাকরি পেয়েছে।"

মাখন গুপ্ত যেন নিজেকে আহত মনে করলেন। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন কাজ মাধু করতে গেল কেন? লেখাপড়াটা বন্ধ করা খুবই অন্যায় হবে। কালই আমি ওকে চাকরি নিতে বারণ ক'রে দিয়ে আসব। ওদের তো আমি কোন অভাবই রাখি নি।"

"চল্লিশ টাকায় সব অভাব মেটে না দাদু। তাও কলেজে পড়তে মাধুরীর তো পয়সাই লাগে না।"

"না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়," মাখনবাবু উঠলেন, "ব্যাপারটা কি জানিস? মাধু হচ্ছে গিয়ে টেররিস্ট—সুভাষ বোসের ফোটো পুজো করে। কোন্ দলের সঙ্গে যে কখন মিশছে মাধুরীকে দেখে বোঝাই যায় না। তোমরা ব'স, দেখি মিসেস গুপ্তর একবার খবর নিই।"

রমাপদ হঠাৎ ব'লে বসল, "চলুন না, আমিও যাই আপনার সঙ্গে? তিনি তো আমায় একদিনও দেখলেন না—"

"দেখেছেন তোমায় তিনি। তুমি ব'স রমাপদ।"

"কবে দেখলেন?" রমাপদ মাখনবাবুর পেছনে পেছনে প্রায় চৌকাঠ পর্যন্ত গেল।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাখনবাবু বললেন, "সেদিন যখন তুমি রাস্তা দিয়ে আসছিলে তখন তিনি বিছানায় ব'সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে তোমায় দেখে নিয়েছেন। তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে।"

মাখনবাবু ওপরে উঠে যাওয়ার পরে রমাপদ বলল, "রাত হয়েছে, আমি এবার চলি।"

"আবার কবে আসবে?"

"যদি বল, রোজই আসতে পারি।"

"তা হ'লে অফিসে যাওয়ার পথে রোজই তুমি আমাদের এখানে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবে। মা কিছু মনে করবেন না তো? তুমি একছেলে কি না!"

"তা হলেও তিনি বোধ হয় কিছু মনে করবেন না।"

একটু ভেবে নিয়ে লতিকা বলল, "আমার হাতেও কিছু দায়িত্ব থাকা ভাল।"

ফুলদানি থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে রমাপদ লতিকার মাথায় গুঁজে দিয়ে বলল, 'অলঙ্কারহীনার এটাই আজ সবচেয়ে দামী অলঙ্কার হোক।"

বাইরের গেট পর্যন্ত লতিকাও গেল রমাপদর সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় নেমে হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমন ভাব দেখিয়ে রমাপদ বলল, "মাধুরীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে।"

এতক্ষণে রমাপদ নিশ্চয়ই কেয়াতলা লেনে পৌঁছে গেছে, লতিকা তবু দোতলায় পৌঁছতে পারল না। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে। ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বইছে। কিন্তু এটা দক্ষিণের হাওয়া কি না লতিকা তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারল না আজ।

॥ চার ॥

কসবার এই সরু গলিটায় যখন সন্ধে হয় হিন্দুস্থান পার্কে তখনো আলো থাকে। এখন সন্ধেও পার হয়ে গেছে। ও-বেলার উনুন কোনদিনও নিবিয়ে দেন না সৌদামিনী দেবী। সকালের রান্না রাত্রিবেলা গরম না, ক'রে দিলে মাধুরীর খেতে ভাল লাগে না। তিনি নিজেও দুপুরের পরে বার তিনেক চা খান। রাত্রির আহার তো তাঁর নেই বললেই চলে।

উনুনে গুঁড়ো কয়লা দিয়ে একটু আগে যখন তিনি বারান্দা থেকে ঘরে আসছিলেন বাইরের দরজায় তখন কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। ইস্কুল থেকে ফিরে মাধুরী এইমাত্র স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সৌদামিনী দেবী ভাবলেন, হয়তো দাদা এসেছেন, অনেক দিন হ'ল তিনি এদিকে আর আসেন না।

দরজায় দ্বিতীয়বার কড়া নাড়ার শব্দ পেলেন তিনি। দাদা কিন্তু এমনি ভাবে কড়া নাড়েন না। সৌদামিনী দেবী বারান্দা থেকে উঠনে নেমে অপেক্ষা করতে লাগলেন তৃতীয় বারের আওয়াজ শোনবার জন্যে। মনোযোগ দিয়ে এবারও তিনি আওয়াজ শুনলেন—না, দাদা নয়। বোধ হয় কেয়াতলা লেন থেকে শশধরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এসেছেন। সৌদামিনী দেবী ঘর আর বারান্দার আলো দুটো জ্বালিয়ে দিলেন। স্নান-ঘরের দরজার এক-পাশ থেকে তিনি বেশ একটু জোরে জোরে বললেন, "মাধু, রমাপদর বাবা আর মা বোধ হয় এসেছেন। তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে আয়।"

সৌদামিনী দেবী এর মধ্যে চতুর্থ বার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেছেন। তিনি দরজা খুলে সহসা এক পাশে স'রে দাঁড়ালেন। যিনি ঢুকলেন তাঁকে তিনি চেনেন না। অত অল্প বয়েসের ছেলে কেউ রেল-লাইন পার হয়ে কসবা পর্যন্ত আসতে পারে তা তিনি আজ নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতেন না।

সৌদামিনী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চাই?"

"মাধুরীকে। তাকে বলুন পরেশ গুহ এসেছেন।"

"একটু অপেক্ষা করুন খবর দিচ্ছি।"

স্নান-ঘরের দরজার এপাশ থেকে সৌদামিনী দেবী আবার বললেন, "মাধু, কেয়াতলা লেনের কেউ নয়, পরেশ গুহ এসেছেন।"

স্নান-ঘরে কল থেকে জল পড়ছিল। আওয়াজটাকে বন্ধ করবার জন্যেই মাধুরী কলটাকে দিলে বন্ধ ক'রে। আওয়াজ আর নেই। মাধুরীর কথাগুলো স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন সৌদামিনী দেবী। মাধুরী বলল, "আমি আসছি, বারান্দায় তাঁকে বসতে দাও মা। আর—" কলটা আবার খুলতে যাচ্ছিল মাধুরী, এমন সময় সৌদামিনী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি?"

"আর, তিন পেয়ালা চায়ের জল চাপাতে হবে মা।"

"চাপাচ্ছি। কিন্তু স্নান-ঘরে এতক্ষণ কি করছিস? আবার কল খুলছিস কেন রে? দুবার ক'রে সাবান মাখছিস বুঝি? এত বেশি পরিষ্কার হবার হঠাৎ কি কারণ ঘটল?"

কলটা বন্ধ ক'রে মাধুরী জবাব দিল, "রাস্তায় কত ধুলো তা তো তুমি জান না মা! ধুলোগুলোও কম বজ্জাত নয়। গরীব লোক দেখলে আরও বেশি ক'রে ঢুকে পড়ে গায়ে আর মাথায়। ওঁকে বসতে দাও।"

বসতে দেওয়ার দরকার হ'ল না। পরেশবাবু নিজেই ব'সে পড়েছেন বারান্দায়, মোড়ার ওপরে। বারান্দার পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ক'রে তিনি জুতো জোড়াটা খুলে রাখলেন উঠোনে। সৌদামিনী দেবী ঘর থেকেই লক্ষ্য করলেন সব। এখন আর কিছুই তাঁর করবার নেই। মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে দেয়ালঘেঁষে পরেশবাবুর পেছন দিকের রাস্তা ধ'রে চ'লে গেলেন রান্নাঘরে।

একটু বাদেই বেরিয়ে এলো মাধুরী। সামনের দিকে এসে সে বলল, "নমস্কার সার্। ঠিকানা খুঁজে পেলেন কি ক'রে?"

"কলেজের অফিস থেকে। খবর কি তোমার? কলেজে যাচ্ছ না যে?"

জবাব দেয়ার আগে দু মিনিট ভাবল মাধুরী। প্রথম প্রশ্নটার জবাব একটা দেওয়া খুব কঠিন নয়। পরে আরও প্রশ্ন তুলবেন ইতিহাসের অধ্যাপক পরেশ গুহ। আনুমানিক প্রশ্নগুলোর জবাব কি দেবে তার একটা খসড়া সে মনে মনে তৈরি করতে লাগল।

পরেশবাবু প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করলেন, ভাষাটা একটু অদলবদল ক'রে, "কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি?"

"হ্যাঁ, সার্। কলেজে আমি আর পড়ব না। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব।"

"কেন? কলেজে পড়তে তো তোমার পয়সা লাগে না?"

"সে জন্যে নয়। সংসারে আমাদের আরও পয়সার দরকার। আমি এই পাড়াতেই ছোট একটা ইস্কুলে চাকরি নিয়েছি।"

মাধুরী ভেবেছিল, এইখানেই পরেশবাবুর জিজ্ঞাসার শেষ হবে। কলেজে যাওয়া বন্ধ করার আরও যে একটা কারণ ছিল তা পরেশবাবু কোনদিনও জানতে পারবেন না। কিন্তু পরেশবাবুর বয়েস কম ব'লেই খুঁটিনাটি খবর জানবার আগ্রহও তাঁর বেশি। যা জানবার বাইরে থেকে তা তিনি মোটামুটি জেনেই এসেছেন। তিনি বললেন, "শুনলুম, তোমার নাকি বিয়ে হচ্ছে? তা না হয় হবে, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দেবে কেন?"

"একটু বসুন সার্, আমি আসছি।" এই ব'লে মাধুরী গেল রান্নাঘরে।

সৌদামিনী দেবী নেকড়া দিয়ে চা ছাঁকছিলেন। মাধুরীকে ঢুকতে দেখে বললেন, "ছাঁকনিটা ভেঙে গেছে।"

"এ মাসের মাইনে পেয়ে ছাঁকনি একটা কিনব। এবার একটু বেশি দাম দিয়ে পেতলের ছাঁকনি কিনব মা।"

"হ্যাঁ রে মাধু, ছেলেটি তো বেশ দেখতে, কি চাকরি করে?"

হেসে উঠল মাধুরী, "ছেলে কি বলছ মা? উনি তো আমাদের কলেজে ইতিহাস পড়ান।"

"আমাদের স্বজাত না কি?"

"না।"

"ও, হ্যাঁ, নাম তো বলছিল—পরেশ গুহ। তা বাপু, রেল-লাইন পার হয়ে এত কষ্ট ক'রে এখানে আসবার মানে কি?"

"আমি কেন কলেজে যাই না, তার কারণ জানতে এসেছেন।"

দুটো পেয়ালা এক পাশে সরিয়ে রেখে সৌদামিনী দেবী কাচের গেলাসে নিজের জন্যে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, "কলেজ ছেড়ে দেওয়া তোর উচিত হয় নি। এখন যখন রমাপদ কবে বিয়ে করবে তার ঠিক নেই, তখন যা আবার কলেজে পড়তে।"

"না মা। মামার কাছ থেকে আমরা আর টাকা নেব না।"

দু হাতে দু পেয়ালা চা নিয়ে মাধুরী ফিরে এলো বারান্দায়। পরেশবাবু বললেন, "আবার চায়ের হাঙ্গামা করতে গেলে কেন?"

"হাঙ্গামা কিছু নয় সার্, আমরা তো এখন চা খেতুমই। বাড়িটা খুঁজে পেতে আপনার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে সার্?" নিজের চায়ে চুমুক দিল মাধুরী।

"না, কষ্ট কিছু হয় নি। দিনের বেলায় এলে কোন অসুবিধেই হ'ত না।"

"তা ঠিক।" এক ঢোক চা গিলে মাধুরী বলল, ' কসবার এই গলিটায় আলো খুব কম।"

"হ্যাঁ, রাস্তাটা খুবই সরু।" পরেশবাবু সিগারেট ধরালেন।

"সেই জন্মেই এখান দিয়ে মিলিটারী লরি যাওয়া আসা করতে পারে না, সার্।"

"হ্যাঁ, তাও এটা কম সুবিধের কথা নয়। আমার বাড়ির সামনে রাস্তাটা বেশ চওড়াই—কিন্তু একবার দেখে এসো, কী কুৎসিত হয়েছে তার চেহারা! দিনরাত মিলিটারী লরি চলে। সারা রাস্তাটায় বিরাট বিরাট গর্ত হয়েছে—সেদিন তো অমনি একটা গর্তের মধ্যে প'ড়ে ডান পা-টা আমার মচকে গেল। এখন তো আমায় সাবধানে পা ফেলতে হয়।"

চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে মাধুরী বলল, "সাবধান না হ'লে, মচকানো পা আবার গর্তেই পড়ে ব'লে শুনেছি, সার্। আর এক পেয়ালা চা খাবেন?"

"না, না।" পরেশবাবু মুখ তুলে চেয়ে রইলেন মাধুরীর দিকে। মেয়েটা ভারি হাসিখুশী তো! কসবার এই সরু গলিটায় আলো ঢোকে না, কিন্তু মাধুরীর মুখে একটুও অন্ধকার নেই। পরেশবাবু এবার ফিরে এলেন কলেজের আলোচনায়। তিনি বললেন, "আমাদের প্রিন্‌সিপাল প্রিয়রঞ্জনবাবু তোমার খোঁজ নিতে বললেন। তোমার মত ছাত্রী যদি লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তা হ'লে কলেজের চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে—ও কি, তুমি উঠছ যে? ব'স। বিয়ে ঠিক হ'ল কোথায়?"

"কলেজ যখন ছাড়ি, তখন ঠিক হয়েছিল কেয়াতলা লেনের এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে।"

"এখন আবার বদলে গেছে না কি? বিয়ের ব্যাপারটা এখন তা হ'লে বন্ধই ক'রে দাও, মাধুরী। তোমাকে বিয়ে করবার লোকের অভাব হবে না। কাল তা হ'লে কলেজে আসছ?"

"না, সার্। ইস্কুলের কাজ এখন ছাড়তে পারব না। মতিলালবাবু অনেক টাকা দিয়েছেন ইস্কুলটার জন্যে। একে গ'ড়ে তুলতে হবে। বড় করতে হবে।"

"কিন্তু—"—পরেশবাবু উঠলেন, "কিন্তু তুমি নিজে যদি বড় না হও—" পোড়া সিগারেটের সর্বশেষ অংশটুকু বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, "মতিলালবাবুর অনেক উদ্বৃত্ত, ভাল কাজের জন্যে টাকা না ফেললে তাঁর মনের বিকার ঘটবে। খরচ না ক'রে তাঁর উপায় নেই। কিন্তু তোমার—"

বাধা দিয়ে মাধুরী বলল, "খারাপ কাজের জন্যেও তো তিনি টাকা নষ্ট করতে পারতেন?"

"না, খারাপ কাজ করবার মত বয়েস নেই তাঁর। এমন কি পাহাড়ের উচ্চতায় উঠে পরিষ্কার হাওয়ায় নিশ্বাস টানবার ক্ষমতা পর্যন্ত মতিলালবাবুর নেই। দার্জিলিংয়ে একটা অতি সুন্দর বাড়ি তৈরি করেছেন তিনি। গত বছর গরমের বন্ধে আমি সেখানে গিয়েছিলুম। দেখলুম, তাঁর কে এক বন্ধু সেখানে আছেন। মতিলালবাবুর হার্ট খুব দুর্বল ব'লে তিনি পাহাড়ে উঠতে পারেন না। বিনা ভাড়ায় বন্ধুটি তাঁর বাড়িটা পেয়েছেন ব'লে কত সুখ্যাতিই যে করলেন দানবীর মতিলালবাবুর। মাধুরী, আমাদের কলেজের ব্যায়াম-বীর শক্তিপদকে চিনতে? থার্ড ইয়ারে পড়ত?"

"নাম শুনেছি সার্। খবরের কাগজে তার ছবিও দেখেছি।"

"ব্যায়াম সে ছেড়ে দিয়েছে। গরীবের ঘরের ছেলে, ব্যায়াম করলে বেশি খিদে পেত ব'লে তার আর ব্যায়াম করা হ'ল না। শক্তিপদর কেরানী বাবা বলেন যে, শক্তিপদ নাকি অত্যন্ত সংযমী। কম খাদ্য খায়। শক্তিপদর সংযম যতটা মিথ্যে, মতিলালবাবুর দানের মহত্বও ততটা মিথ্যে। মাধুরী, নিজেকে তুমি তৈরি করো, লেখাপড়া শেখো, মতিলালবাবুদের দানের প্রয়োজন তোমার হবে না।" পরেশবাবু উঠোনটা পার হয়ে বাইরের দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। মাধুরীও গেল পেছনে পেছনে। পরেশবাবু দরজা খুললেন।

মাধুরী বলল, "আমি প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব সার্। আমি যদি কোন কোন রবিবার আপনার বাড়ি গিয়ে খানিকটা সাহায্য নিই—"

ঘুরে দাঁড়িয়ে পরেশবাবু বললেন, "কোন কোন রবিবারে কেন, তুমি প্রত্যেক রবিবারে আসবে। ইংরেজী ডিপার্টমেণ্টের মহীতোষকেও আমি ব'লে দেব। সেও তোমায় সাহায্য করবে। মহীতোষের কোন অসুবিধেই নেই, কিন্তু আমার—"

"আপনার অসুবিধে আছে নাকি সার্?"

"মহীতোষ বিবাহিত। আমি নই। আমার ফ্ল্যাটে দ্বিতীয় কোন লোক নেই, একমাত্র রান্নার লোক ছাড়া। আমার ওখানে যাওয়ার আগে তোমার মাকে এই পরিস্থিতির কথাটা জানিযে এসো।"

"আমার ওপর মার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সার্।"

"তা হ'লে চলি। তুমি এসো যখন তোমার সুবিধা হয়।"

"আচ্ছা।" দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে মাধুরী একটু জোরে জোরেই বলল, "রেল-লাইনটার কথা ভুলে যাবেন না, সার্। একটু সাবধানে, দু দিক দেখে তবে পার হবেন।"

পরেশবাবু পথ চলতে চলতে হঠাৎ পেছন ফিরে দেখলেন, কসবার এই সরু গলিতে আজ অনেক আলো।

দরজা বন্ধ ক'রে মাধুরীর ঘরে পৌঁছতে একটুও দেরি হ ল না। সৌদামিনী দেবী রান্নাঘর থেকে মাধুরীকে দেখছিলেন। দেখবার দরকার ছিল। বিয়ের আগে কাউকে ভালবাসতে গেলে যে কী ভীষণ মূল্য দিতে হয়, তার নির্ম্মম অভিজ্ঞতার কথা তিনি আজও ভোলেন নি। এমন অভিজ্ঞতা মানুষ সারা-জীবনেও ভুলতে পারে না। মূল্য দিলেও যে আকাঙ্ক্ষিত মানুষকে পাওয়া যায় না, তেমন সত্য তিনি তাঁর নিজের জীবনে দেখতে পেযেছেন। মাধুরী যেন কচি বয়েসে সাদা মন নিয়ে সামাজিক ভাবে রমাপদর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তেমন ইচ্ছাই তিনি করেছিলেন। সৌদামিনী দেবী জানেন, নতুন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অতীতের কণ্টকিত স্মৃতি বহন করতে গেলে ক্ষতের পরিধিটাই কেবল বাড়ে, আরোগ্যের সৌভাগ্য তাতে থাকে না।

পরেশবাবুকে দেখে তিনি মাধুরীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পেলেন আজ। ওর মুখে পরেশবাবুর নাম তিনি কখনো শোনেন নি। অধুনা

রমাপদর প্রতি যে মাধুরীর নির্বাক-অবহেলা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তার কারণ কি এই পরেশবাবু?

হিন্দুস্থান পার্কে দাদার কাছে তিনি একবার যাবেন ব'লে ভাবলেন। অনেক দিন হ'ল এদিকে তিনি আসেন না। শশধরবাবুকে বলা দরকার যে, রমাপদর এখন বিয়ে করবার মত যথেষ্ট মাইনে বেড়েছে। অপেক্ষা করবার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

বাইরের দরজায় আবার কড়া-নাড়ার শব্দ হ'ল। মাধুরী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বোধ হয় পার্বতী এসেছে। সৌদামিনী দেবীকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "মা, তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ? আমি ভাবলুম, তুমি রান্নাঘরে। কি হয়েছে তোমার মা?"

"দরজা খুলে দে মাধু। পার্বতী নিশ্চয়ই।"

সোমবার আর শুক্রবাব পার্বতী অঙ্ক শিখতে আসে মাধুরীর কাছে। পার্বতী আর কিছু শেখে না। রাজমোহন অঙ্ক ছাড়া আর কিছু শেখাতে চায় না ওকে। খাতা আর অঙ্কের বই নিয়ে পার্বতী এলো। অন্য দিনের মত এসে ঘরের মেঝেতে বসল ওরা। পার্বতীর বছর দশেক বয়েস হয়েছে। আজ ক'দিন থেকে সে শাড়ি পড়তে শুরু করেছে। পার্বতীকে অঙ্ক কষতে দিয়ে মাধুরী নিঃশব্দে সেলাই করতে লাগল। তেমন কঠিন সেলাই কিছু নয়। পুরনো একটা শাড়ির মাঝখানটা লম্বাভাবে প্রায় ইঞ্চি তিন ছিঁড়ে গিয়েছিল এক মাস আগে। সময়মত সেলাই ক'রে রাখলে আজকে আর ওকে ছ ইঞ্চি সেলাই করবার মেহনত করতে হ'ত না।

খাতায় দাগকাটবার আগে পার্বতী তার শাড়ির আঁচল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আঁচলটা বার বার ক'রে প'ড়ে যাচ্ছে খাতার ওপর। যতবার প'ড়ে যাচ্ছে ততবার ও আঁচলটা গুছিয়ে ঘাড়ের ওপর টেনে তুলছে। মাত্র সাত দিন আগেও আঁচলটা গুছিয়ে কোন কিছু গোপন করবার প্রয়োজন ছিল না পার্বতীর। মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল রে পার্বতী?"

"এই দেখো না, ভদ্দরলোকদের মত মা আমায় কি রকম সাজিয়ে দিয়েছেন। মাগো, এতগুলো কাপড় গায়ে রেখে লাভ কি?"

"অঙ্কটা হ'ল না?" মাধুরী যেন একটু ধমকে উঠল।

"বকছ কেন, দিদিমণি? দিনরাত তো কেবল অঙ্কই কষছি। সকালবেলা

ঘুম থেকে উঠে বাবা সব বড় বড় অঙ্ক নিয়ে আসেন। তুমি চেক দেখেছ দিদিমণি ?”

“না, দেখি নি।” বিরক্তির সুরে জবাব দিল মাধুরী।

“আমি দেখেছি। প্রায় প্রত্যেক দিনই বাবা এতগুলো ক’রে চেক নিয়ে আসেন। কখনো তিনের পিঠে চারটে শূন্য। কখনো চারটে শূন্যর আগে পাঁচ। বাবা বলেন শূন্যগুলোও সব টাকা। মাগো, দিনরাত শুধু অঙ্ক আর অঙ্ক।”

সেলাই বন্ধ ক’রে পার্বতীর কথা শুনছিল মাধুরী। এসব কথা সেলাই করতে করতে শোনাও যায় না। এত অল্প দিনের মধ্যে পার্বতীর যখন এতটা পরিবর্তন হয়েছে, রাজমোহনের যে কি হয়েছে ভেবে ঠিক করতে পারল না মাধুরী। প্রায় তিন মাস হ’ল রাজমোহনেব চেহারা দেখে নি সে। এখন আর তার ছোট অঙ্কের হিসেব নেই ব’লেই বোধ হয রাজমোহন আসে না মাধুরীর কাছে। তিন মাস আগেও রাজমোহন প্রত্যেক দিন মাধুরীর কাছে তার সব হিসেব ঠিক না ক’রে রাত্রে বাড়ি ফিরত না।

“দিদিমণি, আজ আমায় ছুটি দেবে ?”

“কেন রে ?”

“বাড়ি যাব। অঙ্ক কষতে ভাল লাগছে না।”

“বেশ তো, বাংলা বই একটা দিচ্ছি ব’সে ব’সে পড়।”

হাসির হিল্লোলে পার্বতীর ঠোঁটের দুটো দিকই বিস্ফারিত হ’ল। সে বলল, “বাড়ি গিয়ে আমি বাংলা বই-ই পড়ব।”

“কি বই পড়ছিস রে ?”

প’ড়ে-যাওয়া শাড়ির আঁচলটা এদিক ওদিক গুছতে গুছতে পার্বতী বলল, “বইটার নাম শুনতে চাও বুঝি ?”

“হ্যাঁ।”

“পতিতার আত্মচরিত।”

ভূতে-পাওয়া লোকের মত মাধুরীর মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। একটু পরেই স্বাভাবিক সুরে সে জিজ্ঞাসা করল, “এ বই তুই কোথায় পেলি ?”

“ড্রাইভারের ঘর থেকে চুরি ক’রে এনেছি।”

"ড্রাইভার? তোদের ড্রাইভার আছে নাকি?" মাধুরীর আজ বিস্ময়ের সীমা নেই।

খাতা-বই গুছতে গুছতে পার্বতী জবাব দিল, "বাবা যে গাড়ি কিনেছেন। সেদিন তো লেকের দিকে আমরা হাওয়া খেতে গিয়েছিলুম। তোমার মামাবাবুও সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। দিদিমণি, এবার থেকে আমি বাংলা বই পড়ব। কাল টাকা নিয়ে আসব, তুমি আমায় বই কিনে দেবে?"

"দেব। নিশ্চয়ই দেব, পার্বতী। ও-বইটা তুই আজ ড্রাইভারের ঘরে গিয়ে রেখে দিয়ে আসিস। ওসব বই ভদ্রলোকেরা পড়ে না।"

"আচ্ছা দিদিমণি, রেখে দিয়ে আসব। আমরাও তোমাদের মত ভদ্দর-লোক, না?"

"হ্যাঁ আমাদের মতই। যাচ্ছিস?"

"নমস্কার দিদিমণি, যাই।"

পার্বতী চ'লে যাওয়ার পরে ছেঁড়া শাড়িটা ছেঁড়াই রইল, মাধুরী আর সেলাই করল না।

ক'দিন দোতলায় উঠতে পারেন নি সুধাময়ী দেবী। বাতের ব্যথায় নড়াচড়া করতে কষ্টই হ'ল তাঁর। বয়স তো কম হ'ল না। ষাটে পৌঁছতে বোধ হয় বছর দুই আর বাকি।

আজ সকালে বাতের ব্যথা অনেক কম। দোতলায় একবার যাওয়া দরকার। যামিনী ব'লে যে লোকটিকে রমাপদ অনেক মাইনে দিয়ে রেখেছে তার কাজে সন্তুষ্ট নন সুধাময়ী। বড্ড বেশি বাবু, বড্ড বেশি পোশাকী মানুষ সে। রমাপদর মতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্যাণ্টকোট পরে যামিনী। কিন্তু দোতলার তিনখানা ঘর সব সময়ে পরিষ্কার রাখতে পারে না লোকটা। ঘরগুলো তাঁর একবার দেখা দরকার। আজকে অফিস ছুটি, রমাপদর সঙ্গেও কথা হবে ভাল ক'রে।

ঘরের বাইরে এসে সুধাময়ী দেখলেন, বেলা কম হয় নি। শশধরবাবুর বাজার থেকে ফেরবার সময় হ'ল। বামুন ঠাকুরকে ওপরে দু পেয়ালা চা পাঠিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে সুধাময়ী দোতলায় উঠতে লাগলেন।

রমাপদ ব্রেকফাস্ট আজ বাড়িতেই খেয়েছে। বাইরে যায় নি। বিছানায়

উপুড় হয়ে শুযে একটা মানচিত্রের ওপর লাল পেন্সিল দিযে দাগ কাটছিল। ওর ঘরের দক্ষিণ দিকটা এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানশনটা শেষ হযে গেছে দু-এক মাস আগেই। ও-বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাট থেকে রমাপদর ঘরের ভেতরটা দেখা যায ব'লে সে জানলাগুলো সব সকাল থেকেই বন্ধ ক'রে দিযেছে। বাইরের লোকের কাছে নিজেকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ ক'রে দেওয়ার মত সাধারণ মানুষ সে নয। বিরাট বিরাট পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করতে হয ওকে। ওর কলমের মুখ দিযে লক্ষ লক্ষ টাকা তুবড়ী-বাজির মত ছড়িয়ে পড়ছে বাঙালী-পরিচালিত কলকারখানার ওপর। দিনরাত চেকের পাতার বাঁ দিকে সই করছে রমাপদ। ডান দিকে জাযগা রাখতে হয় বোস সাহেবের জন্যে।

আজ বন্ধের দিনে রমাপদ বিছানায শুযে মানচিত্রে লাল পেন্সিল দিযে টিপ লাগাচ্ছিল। সোনার বাংলার মানচিত্র এটা নয, এটা ইযোরোপের সামবিক ম্যাপ।

সুধাময়ী দেবী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ব'সে পডলেন রমাপদর পাশে। জিজ্ঞাসা কবলেন, "হ্যাঁবে খোকা, দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে লুকিয়ে লুকিযে এসব কি করছিস?"

মানচিত্রেব পাশে দৈনিক কাগজখানাও প'ডে ছিল। সেটা এক দিকে সরিয়ে বেখে সে বললে "ম্যাপ দেখছি। মিত্রশক্তি গতকাল এই পর্যন্ত এগিযেছে।" লাল পেন্সিল দিযে টিপ মাবল রমাপদ।

"এই পর্যন্ত মানে কি খোকা? হিটলাবের বাড়ি থেকে কতদূর, তাই বল্।"

"কেন মা? হিটলার হেবে গেলে তুমি খুব খুশী হও, না?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"আমি হই না।" এই ব'লে উঠে বসল রমাপদ।

"কেন রে?" রমাপদর গাযে হাত রাখলেন সুধাময়ী দেবী।

"হিটলার হেরে গেলে, আমাদের সুভাষ বোসও হেরে যাবেন।"

"তা যাক বাপু, আমাদের গান্ধীজী থাকবেন। ওরা কতদূর এগিয়েছে তাই বল্।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমাপদ ঘোষণা করল, "জার্মানির সীমান্ত প্রায় অতিক্রম করল! মুসোলিনী নেই!"

"নেই ?" সুধাময়ী ঘুরে বসলেন রমাপদর মুখোমুখি হ'য়ে।

"না, নেই। লাশটা যে তাঁর কোথায় নিয়ে গেছে, কেউ জানে না। মৃতদেহের যা হয় হোক, কিন্তু মরবার আগে দেশের লোকেরা তাঁর মুখে থুতু দিয়েছে। পুরুষমানুষরা দিলেও আমি কিছু বলতুম না, কিন্তু দিয়েছে মেয়েরা। তুমি কি বলবে, এবার বলো। বাবার কথা তুমি মুখস্থ ব'লো না, তোমার মত আমি শুনতে চাই।"

"ওঁর মতই আমার মত, খোকা। মেয়েরা যদি থুতু দিয়ে থাকে, তা হ'লে রাগ ক'রে দেয় নি।"

"তুমি বলতে চাও ভালবেসে দিয়েছে ?"

"না।"

"তবে ? ঘৃণায় ?"

"না। দিয়েছে দুঃখে। যুবক স্বামী কিংবা মায়ের একমাত্র জোয়ান ছেলেকে হারাতে হয়েছে ওদের। যে মরল সে তো চ'লে গেল। কিন্তু যে রইল সে কি নিয়ে থাকবে বল্ ? মায়ের দুঃখ তুই বুঝবি কি করে খোকা ?"

"বাবা তোমায় এসব শিখিয়ে দিয়েছেন।"

সুধাময়ী দেবী ভাবলেন একটু। তারপরে বললেন, "হিটলার হেরে গেলে তোদের ব্যবসার খুব ক্ষতি হবে। সুভাষ বোসের জন্যে তোদের কোন মাথাব্যথা নেই। উনি বলেন, সুভাষ বোস বাংলা দেশেই পাত্তা পান নি।"

"তোমার গান্ধীজী সেই জন্যে দায়ী।"

"ছিঃ, খোকা! তোদের ব্যাঙ্কের টাকা বাড়বে ব'লে ইয়োরোপের তাজা তাজা ছেলেগুলো আর কতদিন মরবে বল্ তো ? এমন ব্যবসা তোদের না চলাই ভাল।"

রমাপদ মুখ নীচু ক'রে ব'সে রইল, কথা বলল না।

"খোকা, বিয়ে করবি কবে ?" আবার কথা শুরু করলেন সুধাময়ী দেবী।

"এখনো সময় হয় নি।" ধীরে ধীরে জবাব দিল রমাপদ।

"কত মাইনে হয়েছে তোর ?"

"তোমার সামনে মাইনের কথা বলতে লজ্জা করছে মা।"

"কেন, কম মাইনে ব'লে বুঝি ?"

"না, বেশি ব'লে।"

"কত টাকা রে ?"

"এখন বারো শো পাচ্ছি।"

"বলিস কি খোকা! তবু বলছিস, বিয়ের এখনো সময় হয় নি ? না বাপু, ওঁদের আমি অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারি নে। বিয়ে হবে ব'লে মেয়েটা কলেজ ছেড়ে দিল। তাও তো কম দিন হ'ল না—"

"মাইনে খানিকটা কমুক, তারপর দেখা যাবে।"

"তোর এসব উল্টো কথার মানে বুঝতে পারি নে আমি। ওদের আজ এখানে দুপুরবেলা খেতে বলেছি। আযোজন বিশেষ কিছু করি নি, ব'সে ব'সে গল্প করব ব'লেই ডেকেছি।"

রমাপদ বিছানা থেকে নেনে এলো। রাতের পোশাকটা পরিবর্তন করবার জন্যেই এগিয়ে গেল আলনার ধারে। সুধাময়ী দেবী আদেশের সুরেই বললেন, "আজ কোথাও বেরুতে পারবি নে। আমরা চারজনাতে একসঙ্গে বসে গল্প করব।"

"বাবাকে বাদ দিলে কেন ?"

"না, তাঁর মন মেজাজ আজকাল ভাল নেই। রবিবার দিন তিনি আবার দুটো না বাজতে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় যাচ্ছিস তুই, খোকা ?"

"বাজারে যেতে হবে না ?" একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করল রমাপদ।

"উনিই গেছেন বাজারে। কি রান্না করতে হবে বামুন ঠাকুরকে সব বলে দিয়েছি। সেই কবে মাধুরীকে একদিন দেখেছিস—খোকা, আজ তুই কিছুতেই বাইরে যেতে পারবি নে।"

"আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব, মা। কথা দিচ্ছি।"

রমাপদ বেরিয়েই যাচ্ছিল। সুধাময়ী দেবী পেছন থেকে ডাকলেন ওকে, "রমাপদ—"

"মা—" রমাপদ দেখল, সুধাময়ীর হাতে লতিকার ফোটোখানা রয়েছে। প্রায় এক বছরের পুরনো ফোটো এটা। তোশকের নীচে না কোথায় যে সে ফোটোখানা রেখেছিল মনে ছিল না ওর। এখন সে বুঝতে পারল সেটা তোশকের তলায়ই ছিল। ছিল নিশ্চয়ই, নইলে মেঝেতে ওটা পড়ে থাকত না। সুধাময়ী দেবী মেঝে থেকে ফোটোখানা তুলে নিয়ে বললেন, "রমাপদ, এই ছবিটা কার ? আমার চশমাটা নিয়ে আয় তো।"

মুহূর্তের জন্যে বিব্রত বোধ করল রমাপদ। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বেশি দেরি করলে মায়ের বিশ্বাসের ভূমিতে ফাটল ধরতে পারে। রমাপদ খুব ভাল ক'রেই জানে, এ ফাটল সে সারা জীবনেও জুড়ে দিতে পারবে না। বাবা কেবল ত্রিশ বছর ইস্কুলে মাস্টারি করেন নি, মাস্টারি করেছেন মায়ের সংসারেও। মায়ের হাত থেকে ফোটোখানা নিয়ে রমাপদ হাল্কা স্বরে বলল, "সেই বুড়োটা কবে যে আমায় একটা ফোটো দিয়েছিলেন মনেও নেই। ধুলো জ'মে জ'মে ফোটোর মুখ তো আর চেনাই যায় না। বড় মাইনের চাকরি হ'লে মানুষ যে কি রকম বিরক্ত করে, তা তো তুমি জান না মা।"

রমাপদর স্বর হাল্কা বটে, কিন্তু সুধাময়ী গম্ভীর স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, "বুড়োটা কে, রমাপদ?"

"বাবার বন্ধু—মাখন গুপ্ত। তিনি কেবল ব্যাঙ্কের দালাল নন, বিয়ের বাজারেরও দালাল।"

বিশ্বাসযোগ্য কথা বলেছে রমাপদ। সুধাময়ীর মুখ দেখে সে বুঝতে পারল যে, মায়ের মন থেকে সন্দেহের মেঘ কেটে যাচ্ছে। সবটুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে রমাপদ এবার ফোটোখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল।

"কোথায় ফেলব মা?" দক্ষিণ দিকের জানলা খুলে টুকরোগুলো সব ফেলে দিয়ে রমাপদ বলল, "প্রকাশ্য রাস্তায় সব প'ড়ে থাক্। এতে গোপন করবার কিছু নেই।"

খুশী হলেন সুধাময়ী দেবী। তিনি বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস খোকা।"

"মাধু, আর একবার ভেবে দেখ্—"

"আমার চটি তোমার পায়ে লাগে মা, এটা প'রে যাও।"

"কিন্তু তুই যদি না যাস, রমাপদর মা-বাবা বড্ড দুঃখ পাবেন মাধু।"

"আমার জাহাজ তো আর ঝড়ের মুখে পড়ে নি যে, যে-কোন একটা বন্দরে গিয়ে উঠলেই হ'ল?"

সৌদামিনী দেবী এবার গম্ভীর স্বরেই বললেন, "শান্ত জলেও সারাজীবন ভেসে বেড়ানো চলে না। বন্দর একটা চাই-ই। তোর মনের কথাটা আমায়

খুলে বল্, মাধুরী। যদি নতুন বন্দরের খোঁজ পেয়ে থাকিস, আমায় বল্, আমি তোর মা।"

হেসে ফেলল মাধুরী: "কি যে সব যা-তা বল! খেযেদেয়ে বখন ফিরবে? তাড়াতাড়ি ক'রে ফেরবার দরকার নেই। আজ রবিবার, আমি নিজের জন্যে ডালভাত রান্না ক'রে নেব। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাও। গড়িয়া-হাটের মোড থেকে একটা রিক্শা নিয়ে নিযো। এই টাকাটা হাতে রাখো। কই দেখি, আঁচলটা দাও তো টাকাটা বেঁধে দি।"

সৌদামিনী দেবী বেরিয়ে এলেন কসবার সরু রাস্তায। মাথার ওপর চাদরটা টেনে দিয়ে তিনি পথ চলতে লাগলেন। কোন পরিচিত লোককে তিনি রাস্তায় চিনতে চান না। নিজেকেও চেনা দিতে চান না সৌদামিনী দেবী। লুকিয়ে থাকবার পক্ষে কসবার সরু গলিটার চেযে আদর্শ জাযগা পৃথিবীর আর কোথায় আছে? যে-নারীকে অল্প বযেসেই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে হযেছে তার সামনে রাস্তা কই? সবগুলো রাস্তাই তো ভগ্ন —লক্ষ্যে পৌঁছবার মত সবল পরিসর তাতে নেই।

রাজমোহনের বাডির ফটক তাঁকে পার হয়ে যেতে হবে। আগেকার মত ছোট দরজা থাকলে পার হয়ে যেতে একটুও অসুবিধে হ'ত না। কিন্তু এখন সেখানে মস্তবড চওডা লোহার গেট বসিযেছে রাজমোহন। প্রায় সব সমযেই লোকজনের ভিড থাকে গেটের সামনে। মাথার ওপর বেশি ক'রে কাপড়টা টেনে দিয়ে সৌদামিনী দেবী সতর্কভাবে গেট পর্যন্ত পৌছে গেলেন। পার হতে পারলেন না। রাজমোহন গাড়িতে উঠছিল।

"মা? আপনি কোথায যাচ্ছেন?" রাজমোহন গাড়ির পাদানি থেকে পা-টা নামিয়ে ফেলল। চীনেবাড়ির নতুন জুতোর জেল্লা দেখে সে নিজেই একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। জুতো জোডাটা খুলে ফেলল রাজমোহন। ঠেলা দিযে পাদানির তলায সরিযে রেখে সে চলে এলো গাড়ির এপাশে। পায়ের ধুলো নিল সৌদামিনী দেবীর। ওকে দেখে সৌদামিনী দেবীর মনে হ'ল, আসামীর কাঠগড়ায় যেন দাঁড়িয়ে আছে রাজমোহন।

"আপনি কোথায যাচ্ছেন, মা? মধুদিদির সঙ্গে দেখা করতে পারি না আজকাল, বড্ড বেশি ডুবে গেছি কাজের মধ্যে।"

"একদিন এসো যখন তোমার সুবিধে হয়। এখন চলি। যেতে হবে কেয়াতলা লেনে।"

"রমাপদবাবুর বাড়ি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি একবার মাধুদিদির কাছে যাই। ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। গাড়ি-বাড়ি সবই তো আপনাদের আশীর্বাদের জন্যেই হয়েছে মা। যতক্ষণ দরকার গাড়িটা রেখে দেবেন।"

"না, রাজমোহন। তুমি কাজের লোক, কাজে যাও। রেল-লাইনের ওপারেই তো বাস পাব।"

রাজমোহন নিজেকে আহত বোধ করল। বোধ হয় সেই জন্যেই সে বলল, "হিন্দুস্থান পার্কের মামাবাবু তো আমার গাড়িতে প্রায়ই চড়েন।"

"রাজমোহন !"

ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল রাজমোহন। দু-একটা গরম কথা না বলতে পারলে সে বোধ হয় বরফের মত জ'মে যেত। সৌদামিনী দেবী চলতে আরম্ভ করেছিলেন। থামতে তিনি বাধ্য হলেন। রাজমোহন বলছিল, "রমাপদবাবুর কাছে গিয়ে আর লাভ নেই, মা। তিনি লতুদিদিকে ভালবাসেন।"

তবুও সৌদামিনী দেবী রেল-লাইন পার হয়ে এলেন। পরেশবাবুর চেহারাটা তিনি আর কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারলেন না।

কষ্ট পাচ্ছে মাধুরী।

এক ঘণ্টা বাদেই রমাপদ ফিরে এলো। গাড়ি ক'রে অনেক খাবার সে কিনে নিয়ে এসেছে। দই, মিষ্টি, ফল এনেছে প্রচুর। সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কি হবে রে ?"

"উনি তো বিধবা, সেই জন্যেই নিয়ে এলুম। যামিনীকে ব'লো, গাড়িতে কিছু এঁটো জিনিসও আছে। বড় হোটেল থেকে ক'টা চপও ভাজিয়ে নিয়ে এলুম মা।"

সুধাময়ীর সারা মুখে হাসি। যাক, ফোটোর ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু সন্দেহের কারণ নেই। পাত্র যদি উপযুক্ত হয় তা হ'লে তার কাছে দু-দশটা ফোটো তো আসবেই। রমাপদ যে বারো শো টাকা মাইনে পাচ্ছে সেই

খবরটা অনেকেই জানে না নিশ্চয়ই। জানলে, সুধাময়ী ভাবলেন, রমাপদর মাথায় ফোটোর বৃষ্টি ভেঙে পড়ত চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির মত।

"খোকা, মাধুর জন্যে আমি দুগাছা চুড়ি তৈরি ক'রে রেখেছি। তোর বাবাকে কিছু বলি নি।"

"না, বাবাকে কিছু বলবার দরকার নেই। টাকা দিচ্ছি।"

"টাকা, আমিই দিয়ে দিয়েছি। লাগবে না।"

"লাগবে মা, লাগবে। এক গাছা হার কিনে দাও না।"

সুধাময়ী এবার ফিসফিস ক'রে বললেন, "চল্‌ না খোকা, গড়িয়াহাট থেকে একবার ঘুরে আসি। তোর বাবা জানলে খুব রাগ করবেন।"

"বাবাকে জানিয়ে দরকার নেই। এই নাও টাকা।" দুখানা এক শো টাকার নোট রমাপদ এগিয়ে ধরল সুধাময়ীর দিকে। রমাপদকে সন্দেহ করবার আর কি রইল? সুধাময়ী বললেন, "টাকা তোর কাছেই থাক্‌। চল, যাই।"

"ছুটোর সময় বাবা তো বেরিয়ে যাবেন, তখন যাব। কেমন?"

"বেশ তাই হবে। মাধু আর তার মাকে বলব একটু বিশ্রাম করতে। সেই ফাঁকে—"

"হ্যাঁ মা, সেই ফাঁকে—" রমাপদ সিঁড়ি দিয়ে তখন প্রায় দোতলায় উঠে গেছে, "বাবা আসছেন মা।"

শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এত খাবার আনিয়েছ কেন সুধা?"

"আমি আনাই নি।" তিনি শশধরবাবুর আরও কাছে এগিছে গিয়ে নীচু স্বরে বললেন, "খোকা এনেছে। ওদের ভাল ক'রে খোকা খাওয়াতে চায়।"

"ওদের? রমাপদ কি মাখনবাবু আর তাঁর নাতনীকেও নেমন্তন্ন ক'রে এসেছে?"

দোতলার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিল রমাপদ।

বেলা বারোটার একটু পরেই সৌদামিনী দেবী কেয়াতলা লেনে এসে পৌঁছে গেলেন। রমাপদ অনেকক্ষণ থেকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। দক্ষিণ দিকের একটা জানলা সে খুলে রেখেছে। জানলা দিয়ে কেয়াতলা

লেনের রাস্তাটা দেখা যায়। ওঁরা হেঁটে আসবেন, না, রিকৃশায় চেপে আসবেন ? রিকৃশা ক'রে আসাই তো ভাল। পিচের রাস্তা তো আগুন হয়ে আছে।

একটু পরেই যামিনী এলো ওপরে। রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "নীচে কার গলা শুনছি রে ? কেউ নতুন লোক নাকি ?"

"হ্যাঁ, কসবা থেকে মা এসেছেন।"

"শুধু মা এসেছেন ? মেয়ে কই ? মানে, আরও কে না আসবে ব'লে শুনেছিলুম ?"

"আর কাউকে তো দেখলুম না।"

রমাপদর আর সময় কাটতে চায় না। মাধুরী কেন এলো না ? আসবে না বোধ হয়। যদি না আসে তা হ'লে ওকে খবরটা কেউ ওপরে এসে দিয়ে যাচ্ছে না কেন ? দু-তিনটে টান দিয়ে নতুন সিগারেটের গোটাটাই রমাপদ ফেলে দিল রাস্তায়। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়েই ফেলল সে। একটু পরেই হয়তো মাধুরী আসবে। পিচের রাস্তা তো আগুন হয়ে আছে, কি ক'রে আসবে মাধুরী ? রমাপদ সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়াল।

শশধরবাবু বলছিলেন, "আমি গিয়ে নিয়ে আসছি। মাধু-মা আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

সৌদামিনী দেবী বললেন, "এত রোদ্দুরে আপনি যাবেন কি ক'রে ?"

সুধাময়ী বললেন, "খোকা তোমায় গাড়ি ক'রে নিয়ে যাক।"

পকেটের মধ্যে গাড়ির চাবিটা খুঁজতে খুঁজতে রমাপদ প্রায় জোরে জোরেই ব'লে ফেলেছিল, "আমি আসছি।"

শশধরবাবু বাইরের দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "রিকৃশটা দাঁড়িয়ে আছে। ওতে ক'রে আমি যাচ্ছি। গাড়ি দেখলে মাধু-মা হয়তো আসতে চাইবে না।"

ঘরে এসে রমাপদ আবার সিগারেট ধরাল।

ফিরে আসতে শশধরবাবুর প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি লাগল। রিকৃশার আওয়াজ পেয়ে রমাপদ এরই মধ্যে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। মাধুরী আসে নি। শশধরবাবুর কথা শোনবার জন্যে রমাপদ আবার চ'লে এলো সিঁড়ির

ওপরে। রমাপদ মনে মনে ঠিকই আন্দাজ করেছিল যে, মাধুরী আসবে না। কিন্তু লতিকা হ'লে আসত।

শশধরবাবু বললেন, "মাধু বাড়ি নেই।"

উদ্বিগ্নভাবে সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "নেই? কোথায় গেল এই রোদ্দুরে? মামার বাড়ি যায় নি তো?"

শশধরবাবু বললেন, "আমি হিন্দুস্থান পার্ক হয়ে এসেছি। সেখানেও নেই।"

রমাপদ ঝুঁকে দাঁড়াল বাকি কথাগুলো সব শোনবার জন্যে।

এবার সৌদামিনী দেবী বললেন, "বোধ হয় কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকবে।"

রমাপদ মনে মনে বলল, তা যাক। কিন্তু মাখনবাবুর সঙ্গে বাবার কি কথা হ'ল?

রমাপদর মনের প্রশ্নের জবাব দিলেন না শশধরবাবু। তিনি কেবল বললেন, "বাইরের দরজায় তালা ঝুলছে।"

সৌদামিনী দেবীর চোখের সামনে পরেশবাবুর মুখখানা আবার একবার ভেসে উঠল।

রান্নাঘরে ঢুকে মাধুরী দেখল, উনোনের আঁচ প্রায় নিবে গেছে। আবার এতে কয়লা দিতে হবে। আজ বাইরে কোথাও খেয়ে নিলে কেমন হয়? মাসের মাইনে তো হাতে এসেছে দু'দিন আগে। টাকায় টান পড়তে দেরি হবে। অতএব, মাধুরী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। চান শেষ করে ফেলতে দশ মিনিটও লাগল না। পার্বতীর মত সেও হাতে বই আর খাতা নিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। বাইরের দরজায় তালা লাগাতে ভুল করল না মাধুরী।

দেশপ্রিয় পার্কের সামনে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল সে। রাস্তার কোণার দিকে রেস্তরাঁটার সামনে এসে দেখল, বড্ড ভিড় এখানে। সঙ্গে কোন লোক না নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকতে ভয় পেল মাধুরী।

রেস্তরাঁয় ও খেলো না বটে, কিন্তু রাস্তা থেকে রেস্তরাঁর দেওয়াল ঘড়িটায় সময় দেখে নিল, বারোটা বেজেছে। ইতিহাসের অধ্যাপক পরেশ গুহ এত-

ক্ষণে নিশ্চয়ই খেয়ে উঠেছেন। তাঁর রান্নার লোকটা বেশ চটপটে। নাম তার রজনী, কিন্তু মুখে তার অন্ধকার নেই। সব সময় মুখে তার হাসি লেগেই রয়েছে। বাবুর সংসারে বেশী কাজ নেই ব'লে রজনী মাধুরীর কাছে প্রথম দিনই অভিযোগ জানিয়েছিল। কাজের চাপ না বাড়লে ওর শক্তির অপচয় হচ্ছে। জোয়ান এবং শক্তিমান পুরুষ পরেশবাবুর এই লোকটি। হুকুম পাওয়ার আগেই চা নিয়ে আসে। চা তৈরি করবার আগে নিয়ে আসে খাবার।

ল্যান্সডাউন রোড ধ'রে মাধুরী হাঁটতে লাগল উত্তর দিকে। রোদের তাপ বাড়ছে। বাঁ দিকের বাড়িগুলোর সামনে ছায়া পড়েছে। লম্বা ছায়া নয়, ছোট ছোট ছায়া। মাধুরী হাঁটতে লাগল সেই ছায়াগুলোর ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে বাড়ির নম্বরগুলো দেখে নিচ্ছে সে। পরেশবাবুর বাড়ির নম্বর পেরিয়ে গেলে আবার খানিকটা বেশী পথ হাঁটতে হবে উল্টো দিকে ফিরে আসবার জন্যে। সতর্ক হ'ল মাধুরী। পরেশবাবুর বাড়ি পৌঁছতে বেশী পথ হাঁটতে সে রাজী নয়।

লম্বা ধাঁজের চারতলা বাড়িটার কাছে এসেই মাধুরী একটু থামে। এ অঞ্চলে এই বাড়িটাই কেবল নম্বর না দেখে খুঁজে বার করা যায়। এখান থেকে পরেশবাবুর বাড়ি আর বেশী দূর নয়। মাধুরী আজও এসে এখানে থামল। গম্বুজের মত উঁচু বাড়িটার দিকে দৃষ্টি দিল একবার। তারপর বাঁ দিকের একটা গলির রাস্তা পার হয়ে মাধুরী চ'লে এলো পরেশবাবুর ঠিকানায়।

সামনেই সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। মাধুরীও উঠল। ডান দিকের ফ্ল্যাটটাই পরেশবাবুর। নাম লেখা আছে বাইরের দরজায়। হাতে ওর তখনও বই এবং খাতাখানা আছে কি না একবার দেখে নিয়ে মাধুরী দরজায় টোকা দিল দুবার।

দরজা খুলে দিল রজনী। ভেতরে এসে বসল মাধুরী। অধ্যাপকের বসবার এবং অপরকে বসাবার ঘর এইটে। এখানে ব'সেই তিনি লেখাপড়া করেন। কেবল লেখাপড়াই। শোবার ঘর আলাদা।

মাধুরী দেখল, দিনের বেলাতেই টেবিলের ওপরে আলো জ্বলছে। চীনে-মাটির টেবিল-ল্যাম্প। এক হাত লম্বা চিনেমাটির একটি ওরিয়েণ্টাল মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে কোন দেশের ভৌগোলিক বিশেষত্ব ধরা যায় না। মেয়েটির

ডান হাতে মুদ্রার ভঙ্গি, তার নীচে স্ক্রু দিয়ে আঁটা রয়েছে ছোট্ট একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌। মুদ্রাটা শাস্ত্রমতে বিশুদ্ধ কি না মাধুরী তা বুঝতে পারল না। সে দেখল, আলোর নীচে একটা বই খোলা প'ড়ে রয়েছে। পরেশবাবু বোধ হয় বইখানা একটু আগে পর্যন্তও পড়ছিলেন। কৌতূহল মেটাবার জন্যে মাধুরী দেখল, বইখানা ইতিহাসেরই বটে, উপন্যাস নয়।

উপন্যাস পড়বার মত তরলমতির মানুষ নন পরেশবাবু। এতটা জানার পরেও মাধুরী বইখানাকে উপন্যাস ভাবছিল কেন? আজ নিয়ে মাধুরী পরেশ-বাবুর কাছে তিন দিন এলো। প্রথম দু দিন এখানে এই টেবিলল্যাম্পটা সে দেখতে পায় নি। অন্য যেটা ছিল সেটাতে কোন ডিজাইন ছিল না। থাকলেও তাতে ওরিয়েণ্টাল নারী কিংবা তার মুদ্রা ব'লে কিছু ছিল না। শুধু এই কারণেই মাধুরী উপন্যাসের কথাটা ভাবে নি। যে-সোফাটায় মাধুরী বসেছে, সেখানে একটু আগে অন্য কেউ বসেছিল। বিলিতী সেণ্টের গন্ধে ঘরের বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। কেবল সেণ্ট নয়, চুলের তেলের সেই এক বিশেষ ধরণের হাল্কা আমেজ যেন এখন পর্যন্তও সোফার কাপড়টাকে স্বাভাবিক হতে দেয় নি। মাধুরী জানে, পরেশবাবু প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু ক'রে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে বিলিতী সেণ্টের অনুপ্রবেশ এক রকম অসম্ভব ব'লেই জানত মাধুরী। এখন ওর সন্দেহ হ'ল, শতাব্দীর বন্ধন তাঁর আর নেই। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী সমকালীন সেণ্টে সিক্ত হয়ে বিংশ শতাব্দীর পায়ে মাথা ঠুকে মরছে।

বসতে ব'লে রজনী চ'লে গিয়েছিল ভেতরে। একটু পরেই সে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। রজনী বলল, "চা খেয়ে নাও। পরে আবার চা আর খাবার দেব।"

"দাদাবাবু কি করছেন রজনী?"

"চান ক'রে এইমাত্র খেতে বসলেন।"

"এত বেলা কেন আজ?"

"আর বল কেন, সেই মেয়েটা পড়তে এসেছিল যে! এই তো গেল।"

মাধুরী টেবিল-ল্যাম্পটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "রোজই তিনি পড়তে আসেন নাকি? কখন আসেন?"

"আসবার কোন বাঁধা টাইম নেই।" রজনী একটু বিরক্তির সুরেই যেন শেষের কথাগুলো বলল, "ওরা সব বড়লোকের মেয়ে, পড়ার নামে তো ঘাম ছাড়ে! একটা প্রকাণ্ড গাড়ি চেপে আসে। ড্রাইভারটা গোটা কুড়ি মোটা মোটা বই নিয়ে ওপরে উঠে আসে—ওসব লোক-দেখানো লেখাপড়া আমি জানি।"

"তোমার দাদাবাবু জানেন না?"

"চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও। দেখি, ওদিকে আবার কি হ'ল।" চ'লে যাওয়ার সময় রজনী যে মাধুরীকে একবার পেছন ফিরে দেখে গেল তা সে লক্ষ করল। রজনী সত্যি সত্যি ভেতরে গেল কি না দেখবার জন্যে মাধুরী উঠে এলো দরজা পর্যন্ত। উঁকি দিয়ে দেখল, রজনী সেখানে নেই।

মাধুরী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দরজাটা খুলল যেমন আস্তে, বন্ধও করল তেমনি ভাবে। সিঁড়িতে এসে এক রকম দৌড়তে দৌড়তে চ'লে এলো রাস্তায়। সেই গম্বুজের মত উঁচু বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল একটু। পেছন ফিরে দেখল, রজনী কিংবা পরেশবাবু ওর পেছনে পেছনে ছুটে আসছে কি না! দেশপ্রিয় পার্কের কোণা পর্যন্ত হেঁটে এসে মাধুরী বুঝতে পারল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওর পেছনে ছোটবার মত কলকাতায় একটি লোকও নেই।

ট্রামে চেপে বসল মাধুরী। গলাটা শুকিয়ে গেছে। পরেশবাবুর বাড়ির চা-টুকু খেয়ে এলেই হ'ত। ট্রামের পয়সা দিতে গিয়ে মাধুরীর মনে পড়ল, পরেশবাবুর ফ্ল্যাটে বই আর খাতাখানা সে ফেলে এসেছে। পরেশবাবুর ফ্ল্যাটের সঙ্গে সম্পর্ক তার কাটল না। আবার একদিন দরজায় গিয়ে টোকা মারবার সুযোগ রইল মাধুরীর।

বিকেলের দিকে রমাপদ নেমে এলো দোতলা থেকে। খুঁজে খুঁজে আলমারি থেকে ধুতি পাঞ্জাবি বার করেছে সে। কোঁচা ঝুলিয়ে, ঘাড়-কাটা পাঞ্জাবি পরে সে বেশ ব্যস্তভাবে এসে ঢুকে পড়ল সুধাময়ীর ঘরে। সৌদামিনী দেবীও ছিলেন সেখানে। রমাপদ সেই মধ্যযুগীয় নিয়মকানুন মানবার জন্যে খুবই উৎসাহ দেখাচ্ছে। মায়ের পা থেকে ধুলো নিয়ে, সৌদামিনী দেবীর পায়েও হাত ঠেকাল সে। লতিকার ফোটোর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহও আর

সে থাকতে দেবে না। পকেট থেকে সেই দুখানা এক শো টাকার নোট বার ক'রে মায়ের হাতে দিয়ে সে বলল, "এই রইল, যা হয় কিনে দিয়ো।"

রমাপদ বেরিয়ে যাওয়ার পরে সুধাময়ী হাসতে হাসতে বললেন, "মাধুর জন্যে একটা হার কিনতে বলেছিল সকালেই। মাধু তো এলো না। ও বোধ হয় একটু ব্যথাই পেয়েছে। সারাদিন ঘরে ব'সে থাকবার ছেলে নয় রমাপদ।"

কথা শুনে সৌদামিনী দেবীর মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজমোহন মিছে কথা বলেছে।

গাড়ি নিয়ে রমাপদ প্রথমে চ'লে এলো লেকের দিকে। অনেক দিন এদিকে আসে নি। পুরনো লেক-অঞ্চল আজ আর চেনাই যায় না। মিলিটারী ক্যাম্প হয়েছে চারদিকে। লোকের ভিড় তাই খুবই কম। একা একা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না ওর। লতিকাদের বাড়ি যাওয়াই ভাল। হিন্দুস্থান পার্কের পুব দিক দিয়ে ঢুকে পড়ল সে। বেরিয়ে এলো পশ্চিমের রাস্তা দিয়ে। লতিকাদের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল না। বাবার সঙ্গে মাখনবাবুর কি কি কথা হয়েছে তার পূর্ব-জ্ঞান নেই ব'লে হঠাৎ গিয়ে সেখানে আজ রমাপদ উঠতে পারল না। গাড়ি চালিয়ে সে চ'লে গেল গঙ্গার দিকে।

কেযাতলা লেনে সন্ধে পার হয়ে গেছে। বাতাস আর গরম নেই। পিচের রাস্তার বুকও ঠাণ্ডা হয়ে এলো। সৌদামিনী দেবী বললেন, "এবার আমি উঠি। দেখি গিয়ে মেয়েটা কি করছে। হয়তো সারাদিন কিছুই খায় নি।"

সুধাময়ী বললেন, "উনি তো বেরুবার সময় টিফিন কেরিয়ারে ক'রে মাধুর জন্যে খাবার নিয়ে বেরিয়েছেন।"

"তাই নাকি?" খুবই আশ্চর্য বোধ করলেন মাধুরীর মা।

ওঁরা দুজনেই সামনের দিকের বারান্দায় এলেন। যামিনী গেছে রিক্শা ডাকতে। সুধাময়ী বললেন, "মাধু যখন এলো না, পরের রবিবারে আমরা যাব।"

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। বাইরের দরজাটা খোলা ছিল।

"রমাপদ বাড়ি আছ নাকি?—রমাপদ—" বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডারেক্টার শ্রীললিতবিহারী বসু।

সুধাময়ী বললেন, "রমাপদ বেরিয়েছে।"

"যদি তাড়াতাড়ি ফেরে আমার ওখানে একবার যেতে বলবেন। আমি এক ঘণ্টা পরেই বাড়ি ফিরব।" এই ব'লে বোস সাহেব চ'লেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ডান দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে? সদু? না, না—আমি যাচ্ছি। ভুল দেখেছি।"

তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তার আগেই সৌদামিনী দেবী মাথার কাপড়টা টেনে দিয়েছিলেন সামনের দিকে।

এক ঘণ্টা নয়, তক্ষুনি বোস সাহেব ফিরে গেলেন রিজেণ্ট পার্কে। যাওয়ার দরকার বোধ করলেন তিনি। বাংলা দেশের সম্পদ বাড়ল কি না-বাড়ল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? আজকের এই রবিবারের সন্ধেটায় অন্তত লাভ নেই। বিশ বছর আগে বৈশাখের সেই আর একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল তাঁর। চারদিক কালো হয়ে এলো, পদ্মার বুকে ঝড় উঠেছে—প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে তিনি ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন জলে। পদ্মার সেই বিকৃত গর্জনের মধ্যে মিশে গেলেন তিনি। ভাসতে লাগলেন বোস সাহেব। বিশ বছর ধ'রে তিনি যেন ভেসেই বেড়াচ্ছিলেন, আজ এই মাত্র তিনি উঠে এলেন ডাঙায়। জীবনের দ্বিতীয় সন্ধ্যাটিও স্মরণীয় হ'য়ে রইল। রিজেণ্ট পার্কের বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। বিপিনের মা-ই আশ্চর্য হ'ল সবচেয়ে বেশি।

ছেলের চেয়েও বোস সাহেবকে বেশি ভালবাসে বিপিনের মা। বয়েস তার অনেক হয়েছে। বোস সাহেবের প্রথম জীবনের সংগ্রামের অংশ নিয়েছে সে। মাসের পর মাস সে মাইনে পায় নি, বিপিনের মা তবু চাকরি ছেড়ে চ'লে যায় নি। রান্নার কাজ বন্ধ করে নি একদিনের জন্যেও। বাজারের পয়সা না থাকলে, নিজের পয়সা খরচ ক'রে বোস সাহেবের জন্যে রান্না করেছে সে, তাঁকে উপোস করতে দেয় নি কোনদিনও। আজ সেই ফড়েপুকুরের আস্তাবলের মত ঘর দুখানার কথা বিপিনের মার স্মৃতি থেকে প্রায় উহ্য হয়ে এলো। সংগ্রামের সেই ক্ষতগুলোও আর নেই। কিন্তু বোস সাহেবের সবটুকু দায়িত্ব আজও বিপিনের মাকেই বহন করতে হচ্ছে। সুখের দায়িত্ব,

সংগ্রামের অশান্তি আর নেই। রিজেণ্ট পার্কের এই বিরাট বাড়িটায় বোস সাহেব তাই একা পড়লেন। তাঁর গোপন দুঃখের বোঝা তাঁর নিজেরই রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ-বোঝা তাঁকে একলাই বহন করতে হবে।

বাড়ির পেছন দিকের বড় বারান্দায় তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। আলোগুলো আগেই নিবিয়ে দিয়েছিলেন। সামনের ফাঁকা পরিসরটুকুতে আলো নেই এক বিন্দু—নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে সবটুকু সুস্থতা অন্তর্হিত হ'ল।

রাত-বাড়ছে। রমাপদ এলো না। হয়তো আজ আর সে আসবে না। না আসাই ভাল। দ্বিতীয় সন্ধ্যার আর্তনাদ রমাপদও শুনতে পাবে না। বোস সাহেব সত্যিই একা পড়লেন আজ।

রমাপদ এল রাত আটটার একটু পরে। নীচেই দেখা হ'ল বিপিনের মার সঙ্গে। সে বলল, "সন্ধের সময়ে বাবুকে এই আমি প্রথম বাড়িতে ঢুকতে দেখলুম।"

"ব্যাপারটা কি? আমায় তিনি ডাকতে গিয়েছিলেন।"

"তা তো জানি না। বোধ হয় শরীর খারাপ হয়েছে।"

"শরীর তো তাঁর কোনদিনও ভাল. যায় না!" ব'লে রমাপদ অপেক্ষা করতে লাগল। বিপিনের মা বাঁধানো দাঁতগুলো ভাল ক'রে প'রে নিয়ে বলল, "ভোগ করতে পারলে না কিছুই। শরীরে কিছু নেই। যাও, ওপরে যাও। খাবার-ঘরেই পাবে তাঁকে।"

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল রমাপদ। বাড়িটা যেন এতদিন সে ভাল ক'রে দেখে নি। আজ দেখছে। ব্যাঙ্কের সেই বড় ঘরটার মত এখানেও শূন্যতা রয়েছে। এক নম্বর ইটের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত শক্ত নয়। একটা অব্যক্ত হাহাকার চাপা গোঙানির মত ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরগুলোর শূন্যতায়।

খাবার-ঘরের বাইরে থেকে রমাপদ বলল, "আমি এসেছি সার্।"

"এসো। ব'স ঐ চেয়ারটায়।"

খাবার-ঘরের ব্যবস্থা দেখে রমাপদ অবাক হয়ে গেছে। এমন সুন্দর সাজানো গোছানো খাবার-ঘর আগে সে আর কোথাও দেখে নি। এমন ঘরে ঢুকলে মানুষের খিদে বাড়ে।

টেবিলের ওপরে পাঁচ-ছ রকমের খাবার রয়েছে। বিপিন একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু নেই ?"

"আছে।" বিপিন একটু বাদেই নিয়ে এলো আরও দু রকমের খাবার।

পাঁচ মিনিট চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বোস সাহেব। তারপর আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি আছে ?" আরও দু রকমের খাবার এলো। গোটা টেবিলটা ভর্তি হয়ে গেল খাবার-পাত্রে। গেলাস রাখবার মত একটু ফাঁকা জায়গা নেই। রমাপদ এত বেশি আশ্চর্য আর কোনদিনই হয় নি। একজন মানুষ এতগুলো জিনিস খেতে পারে না কি ? তা ছাড়া, বোস সাহেবের পেটে ঘা আছে ব'লে শুনেছে। হার্ট দুর্বল। ডায়বেটিস তো আছেই। রমাপদ যে সামনে ব'সে আছে বোস সাহেব বোধ হয় ভুলেই গেছেন। খাবারগুলোর দিকে তিনি তন্ময়ভাবে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘোলের শরবত করিস নি বিপিন ?"

"এই যে।" বিপিন তাঁর হাতে তুলে দিল শরবতের গেলাস। বোস সাহেব শরবতটুকু খেয়ে নিলেন। তারপর আর একবার সব খাবারগুলোর ওপর দৃষ্টি দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। ওদিকে যে কি আছে রমাপদ তা জানে না। জানবার আর দরকার নেই মনে ক'রে রমাপদও উঠে পড়ল। বিপিনের দিকে চেয়ে রইল সে। বিপিনও চেয়ে ছিল রমাপদর দিকে। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিনিট পার হ'ল, ক্ষয় হ'ল আরও মিনিট তিন। রমাপদ বলল, "কাল সকালে তাঁকে ব'লো, আমি এসেছিলাম।"

"আর কিছু বলবেন কি ?" জিজ্ঞাসা করল বিপিন।

"না।" যে-দরজা দিয়ে এসেছিল, সেই দিকে হেঁটে গেল রমাপদ। সে শুনল, বিপিন বলছে, "প্রত্যেক দিন এমনিই হয়। আপনি কিছু খেয়ে গেলে পারতেন।" বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। রমাপদর মনে হ'ল দীর্ঘনিশ্বাস নয়, শূন্যতার ঝড়।

বাড়ি ফিরতে দেরি হ'ল মাধুরীর। ট্রামে চেপে সে ডালহাউসি স্কোয়ারটা প্রদক্ষিণ করল একবার নয়, দুবার। বালিগঞ্জ থেকে ডালহাউসি স্কোয়ারটা দুবার ঘুরে আসতে কম সময় লাগে নি ওর। বোধ হয় চারটেই বাজল।

বজবজ থেকে চারটে দশ মিনিটের গাড়িটা আসছে। রেল-লাইনের দু দিকটা দেখে নিয়ে মাধুরী চ'লে এলো কসবার এলাকায়। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। যেমন খিদে লেগেছে তেমন তেষ্টাও পেয়েছে। পরেশবাবুর ফ্ল্যাটে তৈরি চা-টা ফেলে আসা উচিত হয় নি ওর।

রেল লাইনের এপারে এসে তাড়াতাড়ি হাঁটবার জন্যে মাধুরীর হঠাৎ খুব উৎসাহ বাড়ল। বাড়ি পৌঁছতে হবে। আরও আগে পৌঁছনো উচিত ছিল। পরেশবাবু নিশ্চয়ই ওর খোঁজ করতে আসবেন। কত বয়েস হবে পরেশবাবুর? তেইশ কি চব্বিশের বেশি নয়। এই বয়েসেও তিনি যদি খোঁজ করবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তা হ'লে বাকি জীবনটা তাঁর কাটবে কি ক'রে? মাধুরীদের বাড়ি আসবার রাস্তাও তো সে খোলা রেখে এসেছে। বই আর খাতাখানা তবে কি মাধুরী ইচ্ছে ক'রেই ফেলে এলো?

কসবার সরু গলিটায় ঢুকে পড়ল মাধুরী। বাড়ি পৌঁছতে আরও দু-চার মিনিট সময় লাগবে। আরও দু-চারটে কথা ভেবে দেখবার সময় আছে ওর। পরেশবাবুর সামনে গিয়ে পৌঁছলে কথাগুলো হয়তো গুলিয়ে যেতে পারে। কসবা আসবার পথে পরেশবাবু নিশ্চয়ই তার গোপন চেহারাটা ফেলে আসবেন ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাটে। মাধুরী ভাবল, পরেশবাবুরই কেবল দুটো চেহারা নেই। রমাপদর ক'টা আছে? মামার তো মিনিটে মিনিটে চেহারা বদলায়। গড়িয়াহাট বাজারের সেই রাজমোহন তো বাধ্য হয়েই চেহারা বদলেছে। আসল আর নকলের পার্থক্য ধরা যায় না। এমন কি পার্বতীর পর্যন্ত ডুপ্লিকেট চেহারা আছে। অঙ্ক কষতে ব'সে সে তার মনটাকে ডুবিয়ে রাখে অশ্লীল বই-এর পাতায়। বোধ হয় গোটা সংসারটাই এই রকম। বোধ হয় এইটাই স্বাভাবিক। মাধুরী নিজেই হয়তো অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আজ।

না, পরেশবাবু আসেন নি। টিফিন-কেরিয়ার হাতে ঝুলিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শশধরবাবু। মাধুরী আজ শশধরবাবুর কাছে মাথা নীচু ক'রে মুখ লুকিয়ে রাখবে না। ডুপ্লিকেট একটা মুখের অনুসন্ধান করতে লাগল মাধুরীও।

"এই যে মা, এসো। কোথায় গিয়েছিলে? আমি তো সেই আড়াইটে থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।" এই ব'লে শশধরবাবু বাঁ হাত থেকে টিফিন-কেরিয়ারটা ডান হাতে নিয়ে এলেন।

ঘরে এসে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কি আসবার কথা ছিল ?"

"না, কথা কিছু ছিল না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সারাদিন কিছু খাও নি।"

"প্রচুর খেয়েছি—" ঢেকুর তোলবার চেষ্টা করতে করতে মাধুরী, আবার বলল, "এত খাওয়া যে, শেষ করতে পারি নি। সারা দুপুরটা ব'সে করলুম কি ? কেবল খেলুম।"

"কোথায় খেলে মা ?" মাধুরীর কথা বিশ্বাস করেন নি শশধরবাবু।

"পরেশবাবুর বাড়ি।"

"তিনি কে মা ?"

"আমাদের কলেজে ইতিহাস পড়ান। তাঁর কাছে আমি রবিবার দিন পড়তে যাই।"

"তা বেশ। কিছু খাবার এনেছিলাম তোমার জন্যে।" মেঝে থেকে টিফিন কেরিয়ারটা শশধরবাবু আবার হাতে তুলে নিলেন। মাধুরীর রাগ হ'ল খুব। ও ভেবেছিল, শশধরবাবু পরেশবাবুর সম্বন্ধে আরও দু-চারটে প্রশ্ন অন্তত করবেন। মাধুরীর আজ কেবল প্রশ্নের জবাব দেবার দিন।

"আমি তা হ'লে চলি, মাধুরী।"

মাধুরী যেন কথাটা শুনল না: "পরেশবাবু খুব ভাল পড়ান, তাঁর খুব নাম।"

"অভিজ্ঞ লোক, ভাল পড়াবারই কথা।"

"না, তিনি অভিজ্ঞ একেবারেই নন। মাত্র দু বছর তো হ'ল এম. এ. পাস ক'রে কলেজে ঢুকেছেন।"

"খুবই ছেলেমানুষ দেখছি পরেশবাবু।"

"খুব। ওঁর বাবা মরবার সময় অনেক টাকা রেখে গেছেন।"

খবরগুলো সরবরাহ করবার পর মাধুরীর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। এখন রমাপদর কান পর্যন্ত কথাগুলো যদি পৌঁছয় তবেই ওর পরিশ্রম সার্থক হবে। শশধরবাবুর মুখ দেখে মাধুরীর তবু সন্দেহ হ'ল যে, তিনি ওর পরের কথাগুলোও বিশ্বাস করেন নি। যাওয়ার জন্যে শশধরবাবু ব্যস্ততা দেখালেন। মাধুরী যেন তার শেষ অস্ত্র ছাড়ল এমন ভাব দেখিয়ে বলল, "পরেশবাবু খুব ভাল লোক।"

"তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি জানি, তুমি বাজে কথা বলবে না।"

"তিন ঘরের ফ্ল্যাটটাও ভাল। অনেক জায়গা। রান্নার লোক ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।"

"লেখাপড়া করবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। আই.এ. পরীক্ষাটা তা হ'লে তুমি এবারই দিয়ে দাও। খাবারগুলো কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব? রমাপদ নিজে সব খাবারের ব্যবস্থা করেছিল আজ।"

বুড়োটা বলে কি? ছেলের হয়ে ওকালতি করছে না কি? পরীক্ষা করবার জন্যেই বোধ হয় মাধুরী এবার বলল, "দেখি।"

শশধরবাবু নিজেই টিফিন-কেরিযারের বাটিগুলো সব একটা একটা ক'রে খুলতে লাগলেন। প্রথম বাটিটার দিকে দৃষ্টি দিযে ছেলেমানুষী স্বরে মাধুরী বলল, "এগুলো তো সব দই, মিষ্টি। আপনি নিজে গিয়ে কিনে এনেছেন।"

মাঝখানের একটা বাটি নিয়ে শশধরবাবু বললেন, "এইগুলো চপ। আমাদের ঠাকুর মাংস ছোঁয় না। রমাপদর মাও অসুস্থ। রমাপদ নিজে গিয়ে বড় হোটেল থেকে চপ কিনে এনেছে তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে কেন?"

"আমরাও মাংস খাই না।"

মেঝেতে উপুড় হয়ে ব'সে মাধুরী বাটিটা টেনে নিল নিজের দিকে। একটা চপ হাতে তুলে নিয়ে সে বলল, "চপ খেতে আমি খুব ভালবাসি। জানেন, আজকে সারাদিন আমি কিছু খাই নি?"

"জানি মা, জানি। জানি ব'লেই তো টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে আমি দু ঘণ্টার ওপর এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এবার তুমি ভাল ক'রে খাও। আমার আবার এক্ষুনি রসা রোডের মোড়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে। দু ঘণ্টা লেট হয়ে গেলুম।"

চপ হাতে নিয়ে মাধুরী চুপ ক'রে ব'সে ছিল। যাবার সময় শশধরবাবু বাইরের দরজাটা টেনে দিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ছোট ক্যাশিয়ার অমূল্যধনকে বেলা তিনটের সময় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। রমাপদ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। দু নম্বর লেজারের হরিবাবুর পাশেই ক্যাশঘর—ক্যাশ জমা নেবার ঘর। খাঁচার মত জাল দিয়ে চার দিকটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। হরিবাবু চশমার তলা দিয়ে দেখলেন, ক্যাশঘরের মেঝেতে শুয়ে অমূল্যধন ঘুমুচ্ছে। বেলা দুটোর পরে ক্যাশের কারবার বন্ধ হয়ে গেলে অমূল্যধন প্রত্যেক দিনই মেঝেতে ব'সে দিনের আমদানি সব গুনে গুনে খাতার সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। আজও সে মিলিয়ে রাখবার জন্যে মেঝেতে গিয়ে ব'সে পড়েছিল। বোধ হয় শরীরটা আজ ওর ভাল নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে। দু নম্বর লেজারের হরিবাবু দেখলেন, অমূল্যধন গড়াতে গড়াতে উঁচু কাউন্টারের তলায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ব্যাঙ্কের বেয়ারাগুলো জালের ফাঁক দিয়ে বার বার উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। হরিবাবু দেখেছেন। মোটা লেজার-বইটার ওপর ডান হাতের কনুইটা ঠেকিয়ে রেখে তিনি বাঁ হাতে একটা সিগারেট ধ'রে রেখেছেন। মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন সিগারেটে। দু নম্বর লেজারটা ক্যাশঘরের কাছে ব'লে শিয়াশরণ বেয়ারা হরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "আমূল্য বাবু কাঁহা হায়?"

"মালুম নেহি।" হরিবাবু এবার বাঁ দিকে কাত হয়ে বসলেন, ক্যাশঘরের উল্টো দিকে মুখ ক'রে। হরিবাবু ভাবলেন, তিনি নিজে কখনো ক্যাশঘরের কাজ করতে পারতেন না। দু-তিন বছর ক্রমান্বয়ে ঐ ঘরটায় ব'সে লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি গুনতেও পারতেন না। দম আটকে মারা যেতেন। অমূল্যধন মরে নি, ঘুমুচ্ছে। ছোঁড়াটাকে বাহাদুরি দিতে হয়। গত দু বছরে সে বোধ হয় দু কোটি টাকার বেশিই গুনে ফেলেছে, ওর তবু টাকা গুনতে ক্লান্তি আসে না। মাসের পয়লা তারিখে নিজের মাইনের এক শো পঁয়ত্রিশটা টাকাও সে পাঞ্জাবির তলায় ফতুয়ার পকেটে গুনে গুনে রেখে দেয়। লেজার-কীপার হরিবাবুর চেয়েও অমূল্যধনের মাইনে কম।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় ব্যাঙ্কের বড় হল্-ঘরটায় আর একবার খোঁজা-

খুঁজি শুরু হ'ল। শিয়াশরণ মিশির আবার এলো হরিবাবুর কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "আমূল্যবাবু-কো কেয়া হুয়া ?"

"মালুম নেহি।" হরিবাবু লেজার বইটার ও-পাশ থেকে একটা লম্বা রুলার টেনে আনলেন নিজের কাছে। শক্ত ইস্পাত দিয়ে তৈরি এই রুলারটা। শিয়াশরণ চ'লে যাওয়ার পরে হরিবাবু উঁচু চেয়ার থেকে লাফিযে নেমে পড়লেন নীচে। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে কি না একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তিনি রুলারটা ঢুকিয়ে দিলেন জালের ফাঁক দিয়ে ক্যাশঘরের দিকে। খোঁচা মারলেন অমূল্যধনের গায়ে। একবারে হ'ল না, বার পাঁচেক মারতে হ'ল। অমূল্যধন কাউণ্টারের তলা থেকে গডিযে গড়িয়ে চ'লে এলো হরিবাবুর দিকে। উঠে দাঁড়িযে সে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি, হরিদা ?"

"সেন সাহেব তোকে বেলা তিনটে থেকে খুঁজছেন।"

"এখন ক'টা বেজেছে ?" চোখ রগড়াতে লাগল অমূল্যধন।

"সাড়ে তিনটে।"

"একটা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন দেখছিলাম। শেষটুকু দেখতে পেলুম না। তুমি খোঁচা মারলে কি না।" এই ব'লে অমূল্যধন নিজের মাথার ওপর হাত রেখে আবার বলল, "না, নেই। স্বপ্ন মানেই বোগাস।"

"তা মাথার ওপর খুঁজছিস কি ?" অমূল্যধনের বোধ হয় এখনো ঘুম ভাঙেনি মনে ক'রে হরিবাবু রুলার দিয়ে আবার একটা খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে কি খুঁজছিস ?"

"টোপর। পাল্কীতে চেপে বিয়ে করতে যাচ্ছিলুম, হরিদা। প্রায় ক্রোশ তিন গেলুম। মানুষের ঘাড়ে চেপে বিযে করতে যাওযার মত ব্যাপার, তোমরা—কলকাতার লোকেরা তো ভাবতেই পার না। পৌঁছলুম এসে। দেখলুম ফটকের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। হেসে হেসে তুমি একটি মেয়েকে বলছ : বর আসবে যখুনি, নিযে যাবে তখুনি—"

"থাম্, থাম্। মেলা বকছিস। আমি তো এক শো পঁচাত্তর পেয়েও বিয়ে করবার মত মেযের সন্ধান পাচ্ছি নে। হ্যাঁ রে অমূল্য, কাল যে বলছিলি, তোর বাবা গলসিতে কোন্ একটা মেয়ে দেখতে যাবেন, তার কি হ'ল ?"

"হরিদা, বাবা আজকাল আর মেয়ে দেখতে যান না। পাত্রী-পক্ষের লোকেরাই এসে আমায় দেখে যায়। খুব কম মাইনে কিনা! এক শো

পঁয়ত্রিশ টাকার টোপর মাথায় দিয়ে বাংলা দেশে আর বিয়ে করা চলবে না। তার ওপরে বাঙালী ব্যাঙ্কের চাকরি—নাঃ, স্বপ্ন মানেই বোগাস। তুমি কি করবে হরিদা ?" অমূল্যধন খাতাপত্র গুছতে লাগল।

"ভাবছি, ব্ল্যাকে কিছু কাজ করব। টাকা হাতে এলে, চ'লে যাব আবিসিনিয়ায়, সেখানে এখনো মেয়ে কিনতে পাওয়া যায়।"

"কি রকম দর পড়বে ? এদিকে তো আজ মাত্র এক লাখ জমা পড়েছে। কিছু দেব না কি ?" অমূল্যধন ক্যাশঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে এ পাশে এসে দাঁড়াল।

শিয়াশরণ আবার এসেছে। সে বলল, "এই যে আমূল্যবাবু, জলদি আস্থন, সেন সাহেব বোলাতা—"

খাতা হাতে নিয়ে অমূল্যধন ছুটল রমাপদর ঘরের দিকে। পরে সে হরিবাবুর কাছ থেকে দরটা জেনে নেবে।

রমাপদ তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। প্রতিদিন জমার অঙ্ক ক'মে যাচ্ছে। ক্যাশ বন্ধ হওয়ার পরে তাই সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। অমূল্যধন ঘরে ঢুকতেই সে রাগের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি বল তো ?"

"ব্যাপার ক্রমশই ক'মে যাচ্ছে, সার্।" সরলভাবে জবাব দিল অমূল্যধন। তাতেই আপাতত কাজ হ । ব্যস্তভাবে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "আজ কত জমা পড়ল ?"

"এক লাখ টাকা আর খুচরো বারো আনা।"

ব্যস্ততা বাড়ল রমাপদর। সে আবার প্রশ্ন করল, "কাল কত পড়েছিল, অমূল্য ? খাতা দেখে বল।"

"মুখস্থ আছে, সার্। তবু দেখছি। পৌণে দু লাখ।"

"গেল মাসের এই তারিখে কত ছি-"

"সাড়ে পাঁচ লাখ।"

"তার আগের মাসে ?"

খাতাটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে অমূল্যধন বলল, "অনেক বেশি। দশ লক্ষ তেত্রিশ টাকা।"

রেগে উঠে রমাপদ বলল, "খুচরোগুলো আমি শুনতে চাই নি।"

"আচ্ছা, সার্।"

রমাপদ নিজের চেয়ারে এসে ব'সে পড়ল। তিনটে টেলিফোন সাজানো ছিল ডান দিকের একটা ছোট টেবিলের ওপর। পর পর তিনটে রিসিভার তুলে নিয়ে আবার সে নামিয়ে রাখল রিসিভারগুলো। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। শরীর অসুস্থ ব'লে বোস সাহেব তিন দিন থেকে অফিসে আসছেন না। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা আছে।

অমূল্যধন তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। রমাপদ এবার শান্ত সুরেই জিজ্ঞাসা করল, "আজকের কাগজ পড়েছ?"

"কি কাগজ, সার্?"

"খবরের কাগজ।"

"খবরের কাগজ আমি পড়ি না।"

"অমূল্যধন—"

"বলুন, সার্।"

"কোন্ যুগের মানুষ তুমি?"

"যুগ সম্বন্ধে আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে, সার্?"

"কবে জন্মেছ তুমি হে?"

"গুনে বলতে পারি।" খাতাটা টেবিলের ওপর তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে অমূল্যধন বুড়ো আঙুলটা ক'ড়ে আঙুলের গায়ে ঠেকিয়ে দিয়ে বয়েস গুনবার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠল। গুনবার কাজে অমূল্যধনের সত্যিই ক্লান্তি আসে না!

অমূল্যধন যে ইয়ার্কি মারছে না তা বুঝতে পেরে রমাপদ বলল, "থাক্, গুনবার দরকার নেই। কাগজ না প'ড়ে রাত্রে ঘুমোও কি ক'রে তাই ভাবছি।"

"অনেক সময় ট্রামে আসতে আসতে পাশের ভদ্রলোকের হাতে কাগজ দেখি। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দু-দশ লাইন প'ড়েও ফেলি। সার্, আসল কথাটা বলব?"

"বল।"

"আমার এক শো পঁয়ত্রিশ টাকার ওপর ভাগ বসাবার জন্যে পৃথিবীর কত লোক চেষ্টা করছে জানেন? ক্যানিং স্ট্রীটের চা-ওয়ালা, পানের দোকানের নবকেষ্ট মহান্তি, আমাদের বড় গেটের সামনে যে ভিখিরীটা বসে সে, ট্রাম কোম্পানীর বড় সাহেব, ষ্টিম লণ্ড্রির লক্ষপতি চাটুজ্জেরা, তারপর বাবা।

এদের সব দিয়ে-থুয়ে যা থাকে তা থেকে খবরের কাগজের মালিকদের পকেটে যদি কিছুটা আবার দিয়ে আসতে হয়, তা হ'লে নস্যি কিনব কি দিয়ে? আমার আবার নস্যির অভ্যাস আছে, সার্।"

"ইন্‌টারেষ্টিং—" অমূল্যধনের দিকে ঝুঁকে ব'সে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "এই ব্যাঙ্কে কত দিন থেকে কাজ করছ?"

"প্রায় দু বছর হ'ল। আপনি এখানে আসবার কিছুদিন আগে থেকে।"

"কতদূর লেখাপড়া করেছ?"

"বেশিদূর সার্ এগুতে পারলুম কই? আই. কম. পড়ছিলুম, বাবা এনে এখানে ঢুকিয়ে দিলেন। বাবার সংসারে টাকার অভাব পড়ল কি না।"

"হঠাৎ এমন কি অভাব পড়ল যার জন্যে তোমার এত অল্প বয়েসে পড়া ছাড়তে হ'ল?"

"সে সার্, বাবার ব্যাপার। পাঁচটি বোন, আমি তাঁর মাত্র একটি ছেলে। আমার ওপরে তিনটি বোন, তাদের বিয়ে দিতে শুনলুম বাবা একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন। কোথায় যে বাবা টাকা রাখতেন আমি তা জানতুম না। এখানে রাখলে তো আমি একবার গুনে গুনে দেখে নিতুম—"

বাধা দিয়ে রমাপদ বলল, "থাক্, থাক্, আর তোমায় গুনতে হবে না। অমূল্য, তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটায় ন্যাকড়া বেঁধেছ কেন?"

খাতাটা হাতে নিয়ে সে বলল, "আঙুলের আগাটা একটু ক্ষ'য়ে গেছে।"

"ক্ষ'য়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। ভেবেছিলুম চামড়ার ওপরে একটা ফুসকুড়ি উঠেছে, কিন্তু তা নয়। টাকা গুনতে গুনতে চামড়া একটু ক্ষ'য়ে গেছে, জল লাগলে জ্বালা করে, সার্।"

"তা হ'লে জল লাগিয়ো না। বিল্‌ ডিপার্টমেন্টের ভটচাজবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো তো।"

"দিচ্ছি, সার্।"

অমূল্যধন খাতাটা হাতে নিয়েই এসে দাঁড়াল আবার ছ' নম্বর লেজারের পেছনে। হরিবাবুর সামনে চিত্রা-কেবিনের বয়টা এক পেয়ালা চা রেখে দিয়ে চ'লে গেল তিন নম্বরের দিকে। অমূল্যধন জিজ্ঞাসা করল, "চা খাচ্ছ নাকি, হরিদা?"

"হাঁ, চারটে বাজল, হাফ-কাপের অর্ডার দিয়েছিলুম। এই মাত্র মুখ লাগালুম।"

"তোমার তো শাস্ত্র পড়া মুখ, বামুন মানুষের এঁটো খেয়েই তো আমরা ধন্যি। প্লেটে একটু ঢাল দিকি, হরিদা।"

প্লেটে চা ঢালতে ঢালতে হরিবাবু বললেন, "স্বপ্ন দেখলি তুই, আর আমাকে দিয়ে খরচ করাচ্ছিস, অমূল্য ?"

চায়ে চুমুক দিয়ে অমূল্যধন বলল, "তুমি বউ কিনতে যাবে। তোমার আর পয়সার অভাব কি হরিদা ? এঃ, একটু গুঁড়ো চা পর্যন্ত দেয় নি! সাদা চায়ের জল দিয়েছে। ওদের পয়সা দিয়ো না। আচ্ছা হরিদা, আবিসিনিয়ায় যাবে, সেখানকার দরদস্তুর সব জেনে নিয়েছ তো ? খুব চড়া দর নয় তো ?"

"মুসোলিনি এখন নেই কিনা, দর তাই প'ড়ে গেছে।"

"নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে। মুসোলিনি কে হরিদা ?"

"যা, যা, মেলা বকছিস। টাকা গোন্ গে যা, অমূল্য।"

"চা খাওয়ালে, একটা হাফ সিগারেট খাওয়াবে না ?"

হরিবাবু ঝুঁকে বসলেন লেজার বইয়ের ওপর।

বিল্-ডিপার্টমেণ্টের ভটচাজবাবুকে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "আজকের কাগজ দেখেছেন তো ?"

"দেখেছি, তবে ভাল ক'রে পড়ি নি। কি হয়েছে, সার্?"

"খুব বেশি দিন যুদ্ধ চলবে ব'লে আর মনে হচ্ছে না। হিটলার যে একটা গোপন অস্ত্র ব্যবহার করবে ব'লে হুমকি দিচ্ছে, সেটার কি ব্যাপার বলতে পারেন আপনি ?"

"আমার তো মনে হয় বাজে কথা। তার বাড়ির ওপর বোমা পড়ছে দিনরাত, থাকলে সে এতদিনে বার করত।"

সিগারেট ধরিয়ে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "বিলের টাকা ঠিকমত সব আদায় হচ্ছে তো ?"

"বাঙালী পার্টির কাছে অনেক টাকা জ'মে গেছে, সার্। কি ক'রে যে আদায় করব আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না।"

"আচ্ছা, আপনি এবার যান। শেয়ার-ডিপার্টমেণ্টের হরিশবাবুকে একবার খবর দেবেন তো।" রমাপদ টেলিফোনটা তুলতে গিয়ে আবার সেটা রেখে

দিল। বোস সাহেবকে একবার টেলিফোন ক'রে কাগজের খবরগুলো সব দেওয়া উচিত ব'লে সে সকাল থেকেই ভাবছিল। তিনি অসুস্থ বলেই রমাপদ তাঁকে আর বিরক্ত করতে চায় নি।

"এই যে হরিশবাবু, খবর কি বলুন?"

"খবর ভাল না। শেয়ারের বাজারে অস্থিরতা এসেছে বড্ড বেশি। বাঙালী কোম্পানির শেয়ারগুলো এত বেশি ক'রে আমাদের কেনা উচিত হয় নি। যুদ্ধ আরও দশ বছর চললেও কোম্পানিগুলো দাঁড়াতে পারবে ব'লে মনে হয় না। আয়রন এবং কপারের বাজার ভাল। বাঙালীরা আড্ডা জমাতে পারে, ব্যবসা করতে পারে না, সার্।"

"এসব কথা কাকে বলছেন, হরিশবাবু?" একটু যেন ধমকেই উঠল রমাপদ, তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "কাগজ পড়েছেন আজকের?"

"পড়েছি।"

"বার্লিন থেকে কতদূরে আছে ওরা?"

"ম্যাপ দেখি নি! আমাদের শেয়ারের বাজারে ম্যাপ লাগে না।"

রমাপদ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। খুব কড়া রকমের একটা কথা বলতে গিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে ফেলল। জল খেয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে সে বলল, "আচ্ছা, আপনি এবার যান।"

হরিশবাবু চ'লে যাওয়ার পরে রমাপদ ঘরের মধ্যে আবার পায়চারি করতে লাগল।

একটু বাদেই সেই বিধবা ভদ্রমহিলাটির কথা মনে পড়ল ওর। আজ সকাল সাড়ে দশটার সময় তিনি এসেছিলেন রমাপদর সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢোকবার পরে রমাপদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি চাই আপনার, বলুন।"

"দাঁড়াও বাবা, একটু জিরিয়ে নিই। ষষ্ঠীতলা থেকে আসছি, দূর তো কম নয়।"

ভদ্রমহিলাটিকে জিরোতে দিয়ে রমাপদ ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতায় মনোযোগ দিল। একটু পরে মহিলাটি বললেন, "তোমাদের ব্যাঙ্কে কাজ করে হরি চক্কোত্তি—আমাদের পাশের বাড়ির লোক। প্রায় ছ বছর আগে ফুসলে-ফাসলে সে আমায় এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খোলায়। প্রায় ছ হাজার

টাকা বাবা, আমি আজ হরিকে বললুম, দে বাবা, টাকা ক'টা সব তুলে দে। খুকীর বিয়ের টাকা কিনা। হরি বলছে, সব টাকা তুলতে একমাসের নোটিশ লাগে। আমার টাকা, আমি যখন ইচ্ছে তখন তুলব, হরি চক্কোত্তি এখন বাগড়া দিচ্ছে কেন? তুমি একটা এর ব্যবস্থা ক'রে দাও, বাবা।"

"সেভিংস ব্যাঙ্কের এই রকমই নিয়ম।"

"সে কি কথা! আমার টাকার ওপর তোমরা নিয়ম খাটাতে যাবে কেন?"

"সেইজন্যে আপনাকে তো আমরা সুদ দিয়েছি।"

"সুদ তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার আসল ফিরিয়ে দাও। খুকীর বিয়ে যে ঠিক হয়ে গেছে।"

"আপনাকে আবার একদিন আসতে হবে। নিয়ম ভাঙবার ক্ষমতা আমার নেই। বড় সাহেব আজ অফিসে আসেন নি, কাল পরশু যখন হয় আপনি আসবেন।"

ভদ্রমহিলাটি উঠলেন। ঘরের চারদিকটা ভাল ক'রে একবার দেখে নিয়ে তিনি ফিসফিস ক'রে বললেন, "খুকীর এখনো বিয়ে ঠিক হয় নি। তোমাদের হরি চক্কোত্তি কাল রাত্তিরে আমায় ভয় দেখালে। সে বলল, রাঙাপিসি, টাকাগুলো সব ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনো। আমি শুধলুম, কেন রে? সে বলল, বাঙালীর ব্যাঙ্ক, কবে যে কি হয় বলা যায় না। তা বাবা, চারদিক দেখেশুনে তো তেমন কিছু দেখতে পেলুম না? তুমি বলো, সব ঠিক আছে তো?"

রমাপদ জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।"

"তা হ'লে টাকা এখানেই থাক্। এ টাকা গেলে খুকীর কিন্তু আর বিয়ে হবে না। টাকা আমি রেখেই যাচ্ছি।"

গলার 'টাই'টা একটু ঢিলে ক'রে নিয়ে রমাপদ বলেছিল, "টাকা রাখা না-রাখা আপনার ইচ্ছে। আমি কেবল সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মের কথা বলতে পারি যে, সব টাকা তুলতে হ'লে এক মাসের নোটিশ লাগে।"

"খুকীর বিয়ে ঠিক হ'লে তবে আমি নোটিশ দেব, বাবা।"

আজ সকালবেলা আটটা না বাজতেই রমাপদ ব্রেকফাস্ট খেতে চ'লে এলো হিন্দুস্থান পার্কে। সদাশিব রায় রমাপদকে একবার দেখা করবার জন্যে

খবর পাঠিয়েছেন। খুব জরুরী দরকার। খবরটা তিনি দিয়েছেন লতিকার কাছে, টেলিফোনে। মাখনবাবু টেলিফোনের কাছেই ব'সে ছিলেন। রিসিভারটা ধরবার জন্যে তিনি হাত বাড়ালেন একবার, কিন্তু ধরলেন না। খুব মনোযোগ দিয়ে আওয়াজটা শুনলেন তিনি। তারপর ডাকলেন, "লতু, ও লতু, ঘুমচ্ছিস না কি ?"

"না, আমি খাবার ঘরে আছি।"

"এদিকে একবার আয় তো—টেলিফোনটা ধর্। বলিস, আমি কিন্তু বাড়ি নেই।"

বাইরে এসে লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "কে টেলিফোন করছে ?"

"মনে হয় বেয়াই মশাই।"

"কি ক'রে বুঝলে দাদু ?"

"ঘুম থেকে উঠে আজ আর দেবতার মুখ দেখতে পেলুম না, সদাশিব রায়ের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তারপর চোখ আর মুখ ধুয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, অমনি এখানে ক্রিং ক্রিং ক'রে আওয়াজ হতে লাগল—আমি বাড়ি নেই কিন্তু।"

লতিকা রিসিভারটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যালো—"

ও-পাশ থেকেও প্রশ্ন এলো, "হ্যালো—"

"হ্যাঁ, আমিই লতিকা। হ্যালো—"

"তোর দাদু কোথায় রে ?"

"দাদু ?" টেলিফোনের দিকে প্রশ্নটা ছেড়ে দিয়ে লতিকা চেয়ে রইল মাখনবাবুর দিকে। তিনি হাত দিয়ে ইশারা ক'রে বললেন যে, তিনি বাড়ি নেই।

"হ্যালো, তাঁকে কিছু বলবে ?"

"অনেকদিন থেকে তিনি আর আমার কাছে আসেন না।"

"কি বলব তাঁকে বল ?"—লতিকা অপেক্ষা করতে লাগল।

"হ্যালো"—ও-পাশ থেকে সদাশিব রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোদের কি বিয়ে হয়ে গেছে না কি ?"

"কি যে বলো দাদু, তার ঠিক নেই। বিয়ে হয়ে গেলে তুমি খবর পেতে না ?"

"কি জানি, আজকাল তো খাদ্য-কণ্ট্রোলের দিন—হ্যাঁ রে লতু, রামপদর সঙ্গে তোর দেখা হয়? হ্যালো·—"

"দেখা হয়। বেলা আটটা নাগাদ তিনি এখানে আসবেন।"

"ওকে নিয়ে আমার এখানে একবার আয় না। হ্যালো, এখন তো আর বেয়াই মশাই ছোঁয়াছুঁয়ির জন্যে আপত্তি তুলবেন না। তোদের এনগেজমেণ্টের বয়েস কত হ'ল রে?"

"দাদু, যা বলবে তাড়াতাড়ি বল। রমাপদর জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে হবে।"

"হ্যালো, তোর দাদু রমাপদর ওপরে কেন যে এত পয়সা লগ্নি করছেন বুঝতে পারছি না। এবার বোধ হয় তাঁর স্পেকুলেশন ঠিক হবে না। লতু, ওকে নিয়ে কখন আসবি?"

"রমাপদকে এখুনি আমি টেলিফোন করছি তাড়াতাড়ি আসবার জন্যে।"

"আয়, আয় মা লতু। তোদের দুটিকে একবার একসঙ্গে দেখি। আমি জানি, বেয়াই মশাই এবার তোদের সঙ্গে আসবেন না।"

"হ্যালো, ছেড়ে দিচ্ছি—" একটু অপেক্ষা করবার পর লতিকা টেলিফোন কেটে দিল।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথা হ'ল রে?"

"আমাকে আর রমাপদকে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে বললেন।"

"যা মা লতু, রমাপদকে সঙ্গে নিয়েই যা।"

"তুমি যাবে না দাদু?"

"আমার আর সেখানে গিয়ে লাভ কি লতু? তিনি তো বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের সব হিসেব চান। হিসেব দেবে বোস সাহেব কিংবা রমাপদ। আমি তো আর ব্যাঙ্কের লোক নই। তুই যাবি না কি লতু?"

"হ্যাঁ, যাব"

"রমাপদকে পাঠিয়ে দে, তুই বরং আমার সঙ্গে পানাগড়ের ক্যাম্পে চল্। রাজমোহনই তার গাড়ি ক'রে আমাদের নিয়ে যাবে। আটটার মধ্যেই রাজমোহন এসে যাবে। বড় একটা বিল ক্লীয়ার করতে হবে আজ—মামাবাড়িতে তুই যাস নি। যাওয়ার দরকার থাকে রমাপদ যাবে।"

"না, দাদু আমাকে যেতে বলেছেন।" বেশ জোর দিয়েই কথাটা বলল লতিকা।

"যা, গেলেই দেখবি তিনি হিসেব চাইবেন। আমি যা তাঁর কাছ থেকে এনেছি তার বেশির ভাগ টাকাই বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির টাকা। ব্যাঙ্ক ফেল পড়লেও শেয়ারগুলো নষ্ট হবে না। শেয়ারের একটি টাকাও বাকি নেই। কিন্তু তুই এনেছিস করকরে নগদ টাকা—তোর কথায় তিনি রমাপদদের ব্যাঙ্কে দু লাখ ফিক্সড ডিপজিট করলেন। ওখানে যাস নি লতু, হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। লতু, আসল ব্যাপারটা কি জানিস ?"

"তুমি বল আমি শুনি।"

"কাছে আয়। গোপন কথা দেওয়ালের কানেও যাওয়া উচিত নয়।"

লতিকা সত্যিসত্যিই এগিয়ে এলো মাখনবাবুর কাছে! ঘরে অন্য কেউ আর ছিল না। তবুও মাখনবাবু এদিক ওদিকটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে বললেন, "রমাপদ তোকে বিয়ে করবে না। বিয়ে করবে মাধুরীকে।"

"ও, এই কথা!"

"কথাটা কি হাল্কা কথা না কি ?"

"হাল্কা নয়। আমি তো জানতুমই।"

"জানতিস ? তা হ'লে তো খুবই ভাল। এবার বুঝে-সুঝে চলতে হবে তোকে। ব্রেকফাস্টে ক'টা ক'রে ডিম দিচ্ছিস রমাপদকে ?"

"দুটো।"

"এবার থেকে একটা কমিয়ে দে। ফিস-ফ্রাই দিচ্ছিস নে ?"

"দুটো ক'রে দিই।"

"আজ একটাই দিস। রাজমোহন এতদিন বিনে পয়সায় মাছ সাপ্লাই দিচ্ছিল। হিটলার মরেছে শুনলে সেও সাপ্লাই বন্ধ ক'রে দেবে। আজ ক'দিন থেকে কেবল স্বপ্ন দেখছি। লাল স্বপ্ন। মনে হলে যেন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের বাড়ির সামনে একটা লালবাতি জ্বলছে। লতু, বোস সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে রমাপদকেও জেলে যেতে হবে। তা হ'লে চল্, আমার সঙ্গে পানাগড়ে। ব্ল্যাক থেকে তেল কিনবে তো রাজমোহন, আমাদের কি, আমরা কেবল গাড়িতে ব'সে দু দিকের শোভা দেখব। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলাই হ'ল শস্যশ্যামলা—"

বাধা দিয়ে লতিকা বলল, "দাদুর কাছে তবু আমায় যেতেই হবে।"

"সে পরে একদিন গেলেই হবে।"

"না, আজকেই যাব।"

"এত তাড়া কিসের লতু?"

"আরও টাকা চাইতে যাব দাদুর কাছে।"

"ইস!"

এর পরে লতিকা আর সময় নষ্ট করতে পারল না। রমাপদকে তাড়াতাড়ি আসবার জন্যে টেলিফোন ক'রে দিয়ে লতিকা ঘরের বাইরে আসতেই দেখল, সিঁড়ি দিয়ে রাজমোহন ওপরে উঠে আসছে। হাতে তার একটা গহনার বাক্স।

রাজমোহন জিজ্ঞাসা করল, "বাবু কোথায়, দিদি?"

"কে রে?" বলতে বলতে মাখনবাবুও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "রাজমোহন এসে গেছিস? আয়—" গহনার বাক্সটা হাতে নিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "সব সুদ্ধ ক' ভরি হ'ল?"

"সেদিনেরটা নিয়ে ত্রিশ ভরি। আসবার সময় রেল লাইনের এ-ধারে মাধুদিদির মার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

"কিছু বললি নাকি ওকে?"

"না, বেশি কিছু বলতে পারলুম না। তিনি তো আজকাল আমায় হরিজন মনে করেন।"

"তা হ'লে কিছুই বলিস নি?"

"গহনার বাক্সটা দেখালুম। বললুম যে, লতুদিদির বিয়ের গহনা। রমাপদবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে।"

"শেষের কথাটা আবার বলতে গেলি কেন?"

"কি হ'ল বাবু, লতুদিদির বিয়ে কি ঠিক হয় নি?"

যতক্ষণ নারায়ণশিলার সামনে মন্ত্র পড়া না হয় ততক্ষণ বিয়ে হয় না। হ্যাঁরে রাজমোহন, তুই নিজে কি বিয়ে করিস নি? গহনাগুলোর হিসেব রাখিস তুই। পরে তোকে সব কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেব।"

"কিন্তু—" রাজমোহন পেছন ফিরে লতিকার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "রমাপদবাবুর সঙ্গে কি বিয়ে হচ্ছে না?"

"হিটলার আত্মহত্যা করেছে রাজমোহন, রমাপদকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে লাভ নেই।"

লতিকা এগিয়ে এলো মাখনবাবুর কাছে। বিশেষ কিছু ওকে বলতে হ'ল না। গত দু বছরে লতিকার ওজন যে কত বেড়েছে তার একটা মোটামুটি আন্দাজ হ'ল মাখনবাবুর। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাজমোহন বলল, "আমি নীচে গিয়ে বসছি। আপনি আসুন।"

রাজমোহন চ'লে যাওয়ার পরে লতিকা বলল, "দাদু, তুমি যদি আমায় এমন ক'রে অপমান কর তা হ'লে আমি বাবার কাছে চ'লে যাব। তোমার বয়েস ষাটের ওপরে ব'লে আমায় তুমি কচি খুকী মনে কর না কি?"

কথাটা ভেবে দেখবার মত। প্রভাসের তো ছেলে নেই, লতিকাই তার একমাত্র সন্তান। রণজিত বিয়ে করে নি, বোধ হয় আর করবেও না। অতএব তাঁর টাকাপয়সা এবং বাড়িঘর সবই পাবে লতিকা। লতিকা পেলেই তার স্বামীও পাবে। রমাপদর যদি বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে চাকরি নাও থাকে, কিংবা বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কই যদি না থাকে তাতেই বা অসুবিধা হচ্ছে কোথায়? হিটলারের দয়ায় তিনি যা ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে এবং মাটির তলায় সরিয়ে রেখেছেন তাতে ব'সে খেলেও আগামী চার পুরুষ পর্যন্ত অনায়াসে চ'লে যাবে—পঞ্চম পুরুষের হয়তো বাড়িখানা বিক্রি করতে হবে। কিন্তু মাখনবাবুর সহসা মনে হ'ল রমাপদ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক প'ড়ে গেলেই বা তার ভয় কি? না, রমাপদর কোন ভয় নেই মনে ক'রে মাখনবাবু আবার নতুন রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন। লতিকার মাথায় হাত রেখে তিনি বলতে লাগলেন, "সম্পর্কে আমি তোর ঠাকুরদা—ঠাট্টা ইয়ার্কি তো মারবোই। তোর দিদুর তো পেট গরম, দিনরাত শুয়ে আছেন, কার সঙ্গে কথা বলি বল্ তো? রমাপদ মাধুরীকে বিয়ে করবে বললুম ব'লে কথাটা তুই বিশ্বাস করলি নাকি, লতু?"

বিশ্বাস যদি করিই তাতেই বা তোমার বলবার কি আছে?"

লতিকার মনের রাগ এখনো কমে নি, ভাবলেন মাখন গুপ্ত। একটু হেসে বললেন, "পরেশবাবুর কথা তোর মনে আছে? আমাদের স্বজাত নয়। ওই যে গেলবার তোর আই. এ. পরীক্ষার সময় যিনি তোকে বাড়িতে পড়াতে আসতেন? কি যে তোকে তিনি পড়িয়ে গেলেন ফল দেখে আমি তো কিছুই

বুঝতে পারলুম না, লতু। থাক্, সে সব পুরনো কথা ভেবে লাভ নেই। তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা হ'ল দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিম দিকের রাস্তায়। পাশের দোকান থেকে পান কিনে খেলেন। খুব হাসিখুশি—ঠোঁট লাল ক'রে পান খেয়েছে রে বাবা! তিনি বললেন, শিগগিরই বিয়ে করছেন। মেয়েটির পরিচয় দিলেন না। শুনলুম প্রত্যেক রবিবারে দুপুরবেলা মাধু যায় তাঁর কাছে ইতিহাস পড়তে। দুপুরবেলা মাধু আবার কোন্ ইতিহাস পড়ছে বুঝতে পারলুম না। আমি এবার চলি, লতু। রমাপদকে দুটো ডিমই দিস।"

"পরেশবাবু আর কি বলেন, দাদু?" লতিকার কৌতূহল বাড়ল।

বললেন, "বিয়ের পরে বউকে নিয়ে বিলেত যাবেন রিসার্চ করতে।"

"আর কোন কথা হ'ল না?"

"যা রোদ্দুর, বেশিক্ষণ তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। এদিকে তো ভোর থেকে রবিবার শুরু হয়েছে—পরেশবাবুই বললেন, মাধুরী আবার একটা দেড়টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। আমি তো কিছু বুঝলুম না, লতু।"

"তুমি কি বুঝলে না, দাদু?"

"ব্যাচিলার মানুষের ফ্ল্যাটে দুপুরবেলা গিয়ে ইতিহাস পড়বার মানে বুঝলুম না। কি দিনকালই পড়েছে বাবা। আমি ব'লে রাখছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত এত কালো ইতিহাস মানুষ আর কোনদিনও লিখতে পারবে না।"

দু-তিনটে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়ে মাখন গুপ্ত আবার একবার দাঁড়িয়ে গেলেন। লতিকাকে বললেন তিনি, "এদিকে আয়, আর একটা কথা শুনে যা, লতু।"

"কি কথা, ওখান থেকেই বল, আমি শুনছি।"

"ইতিহাসের কথা উঠতেই আমার পুরনো একটা ইতিহাসের কথা মনে প'ড়ে গেল। ভাবছি, মাধুরী ইতিহাস পড়তে গিয়ে আর একটা ইতিহাস আবার না তৈরি ক'রে আসে! বোস সাহেবের সঙ্গে সন্তুরও একটা ইতিহাস ছিল। ওরে বাবা, আজকাল তো কেবল ইতিহাসেরই দিন পড়েছে রে।"

"একটু দাঁড়াও, দাদু—"

"পরে বলব—পানাগড় থেকে ঘুরে আসি।"

রমাপদ টেলিফোনের খবর শুনে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে চান ক'রে ফেলল। সদাশিব রায় ওকে ডাকলেন কেন? হিটলার যে আত্মহত্যা করবে তা তো জানা কথা। বৈজ্ঞানিক যুগে যুদ্ধের মধ্যে কেবল যুদ্ধই থাকে, আর কিছু থাকে না। প্রাচীন কালের বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের মত কেউ তো আজকাল বিজিত পুরু রাজাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না: আপনি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?

প্রত্যাশা করার দিন গত হয়ে গেছে। বীর নেই, বীরত্বও নেই। ওসবের প্রয়োজনও হয় না। যুদ্ধের কেবল নিয়ম বদলায় নি, অর্থও বদলেছে। যুদ্ধের মধ্যে আর যা-ই থাক্, বীরত্ব থাকতে পারে না। অতএব বিজিত হিটলার আত্মহত্যা করেছে। রমাপদ জানে, আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু হিটলার রমাপদর চেয়েও ভাল ক'রে জানত যে, ধরা পড়লে তার আর রক্ষা থাকত না। মরবার ভয় তার ছিল না। কিন্তু বিচারের ভয় তার নিশ্চয়ই ছিল।

অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল রমাপদ। ইয়োরোপের যুদ্ধটা তো এত তাড়াতাড়ি থেমে যাবার কথা ছিল না? কিন্তু সদাশিব রায়ের মতলবটা কি? হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আমন্ত্রণের কোন সম্পর্ক আছে না কি? দৈনিক কাগজের প্রথম পাতাটা উল্টে রাখল রমাপদ।

গাড়ির চাবি কই? পার্স টা কোথায় গেল? বোস সাহেব তো আজও বিছানায় শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে দিনরাত আয়নায় মুখ দেখছেন তিনি। রমাপদ এখন করে কি?

পার্স টা খুলে দেখল, টাকার অভাব তাতে নেই। ব্যাঙ্কের চাবিগুলো সব কোথায় গেল? সামনেই পড়ে ছিল, যামিনী চাবির তোড়াটা তুলে দিল রমাপদর হাতে। চেয়ারে ব'সে রমাপদ পা-দুটো ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে। যামিনী জুতো পরিয়ে ফিতে বেঁধে দিল দু মিনিটের মধ্যে। তারপর কি করবে রমাপদ? মণিপুরে যাবে না কি একবার? বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে মণিপুরের রাজবাড়ির পাশে। ব্যাঙ্কটা আছে কিনা দেখে এলে কেমন হয়? নেতাজীর সেনাবাহিনী নাকি বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসটা দখল করেছে? গুজব। গুজব ছাড়া কিছু নয় মনে ক'রে দৈনিক কাগজের প্রথম পাতাটায় আবার সে চোখ রাখল। নেতাজীর সেনাবাহিনী কোথায়? মণি-পুরের ধারে কাছে কোথাও তো নেই। নেতাজীর স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো

হয়ে গেছে। নাঃ, ইংরেজরা বোধ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা শেষ ক'রে নিয়ে এলো। হিটলার নেই !!

দু-তিনটে সিঁড়ি পরে পরে লাফ মারছে রমাপদ। হেঁটে চলবার সময় নেই ব'লেই সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। একেবারে শেষ সিঁড়িটার ওপর দিয়ে রমাপদ যখন লাফিয়ে নীচে এসে পড়ল, সুধাময়ী তখন সিঁড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "এটা কি হচ্ছে, খোকা ? আর একটু হ'লে আমার গায়ের ওপরে এসে পড়তিস। ছেলেবেলার সেই লাফানো-অভ্যেস তোর গেল না। আয়, তোর সঙ্গে ব'সে আজ আমি চা খাব।"

"সময় নেই, রাস্তা ছাড়ো মা।"

"প্রত্যেক দিন সকালবেলা তোর সময় থাকে না, ব্যাপারটা কি রে ? সেই একটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকিস কি ক'রে ?"

"তবুও বলছি সময় নেই, মা।"

"ওঁকে তো আমি বলেছিলাম সেই কথা। তিনি বললেন কি জানিস ?"

"না।"

"তিনি বললেন, কোটিপতি ফোর্ড সাহেবও সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে তবে অফিসে যান।"

"অনর্থক তুমি আমার সময় নষ্ট করছ, মা। আমি হোটেল থেকে খেয়ে তবে ব্যাঙ্কে যাই।" এই ব'লে রমাপদ সুধাময়ীর পাশ কাটিয়ে বড় দরজাটার সামনে এলো। সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে খোকা, দৌড়চ্ছিস কেন ?"

"কারণ আছে ব'লেই দৌড়চ্ছি। যামিনী, গ্যারেজের দরজা খোল্। খুবই জরুরী কাজ আছে, মা।"

"অত ভোরে তোকে ফোন্ করছিল কে ?"

"হিটলার—মানে—" রমাপদ নিজেই এবার হেসে উঠল। হাসি থামবার পরে সে বলল, "কাজের মুখে কি যে বলছি তার ঠিক নেই। হিটলার আত্মহত্যা করেছে, মা।"

"ভগবান তার আত্মার মঙ্গল করুন। বেঁচে গেছে। জগতের লোকও বাঁচল।" রমাপদ কোন মন্তব্য করল না। ধীর স্থির ভাবেই সে হেঁটে চ'লে গেল বড় দরজার দিকে।

মাখন গুপ্ত বাইরের ফটকে আজ তালা লাগিয়ে যান নি। রমাপদ

সোজা চ'লে এলো ভেতরে। খাবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে উঠোনের দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর। কেমন একটু নতুন নতুন ঠেকছে—উঠোনের পশ্চিম দিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। কি যেন ওখানে নেই ব'লে মনে হ'ল ওর। পরীক্ষা করবার জন্তেই রমাপদ খাবার ঘরে না ঢুকে পেছন দিকে যাওয়ার দরজায় এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। গোয়ালের মত ঘরটা ওখানে নেই। ঘরের চালাটা ছিল খড়ের। রমাপদ দেখল, সেটা প'ড়ে রয়েছে খানিকটা দূরে চৌবাচ্চাটার কাছে। চারদিকের বেড়াগুলোও সে দেখতে পেল না।

খাবার ঘরে এসে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "ঘরটা গেল কোথায়, লতিকা?"

দুটো ডিমের পোচ প্লেটে সাজিয়ে রেখে লতিকা বলল, "দাছ্ ভেঙে ফেলেছেন প্রায় সাত দিন আগেই। তিনি বলছিলেন যে, খড়ের মধ্যে বৃষ্টির জল জ'মে জ'মে মশার জন্ম হচ্ছিল ওখানে। দাছ্ হিসেবে কখনো ভুল করেন না। ঘরের চালে যখন তিনি মশা দেখলেন তার ঠিক সাত দিন পরে হিটলার আত্মহত্যা করলেন।"

"ব্যাপারটা তবুও আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

"পরিজটা ঠাণ্ডা হ... যাচ্ছে, খাও।" বড় চামচেটা লতিকা রমাপদর হাতে তুলে দিয়ে আবার বলল, "ঘরের মেঝেটা যে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো ছিল তা বোধ হয় তুমি লক্ষ্য কর নি। সিমেণ্টের মেঝের নীচে একটা ঘর আছে—বড় বড় দুটো চৌবাচ্চাও বলতে পার। দাছ্ ওখানে তাঁর কারবারের মালপত্র রাখতেন। দামী দামী ওষুধ, দুষ্প্রাপ্য কেমিকেল—এই সব। সাত দিন আগে তিনি তাঁর গোটা স্টকটাই বেচে দিয়েছেন খুব চড়া দামে। আজকে তো হিটলারের আত্মহত্যার খবর বেরুলো।"

পরিজটুকু শেষ ক'রে রমাপদ বলল, "বুঝেছি। এখন তা হ'লে তিনি ব্যবসা ছেড়েই দিলেন?"

"দাছ্ ব্যবসা ছাড়লেও, ব্যবসা দাছ্কে ছাড়বে না। অন্য অন্য স্টকিস্টদের হয়ে তিনি কাজ করবেন। যার আছে তার হয়ে তিনি খবর পৌঁছে দেবেন যার নেই তার কাছে। এই ধরো, জার্মেনিতে তৈরি প্রণ্টোসিল ওষুধটা শ্যামবাবুর খুব দরকার। তাঁর হয়তো ইরিসিপেলাস হয়েছে। এক ঘণ্টার

মধ্যে ওষুধ চাই, তখন শ্যামবাবু কিংবা তাঁর কেউ যদি দাদুকে বলেন ওষুধটা এনে দিতে, তা হ'লে তিনি কলুটোলা থেকে প্রন্টোসিল এনে দেবেন। দাদু কেবল কমিশন নেবেন। একটা ডিম আবার রেখে দিলে কেন? খাও। খাবার জিনিস নষ্ট করা পাপ। খাবার জন্যেই তো সংসারে সব হচ্ছে। যুদ্ধও হচ্ছে সেই জন্যে। জানো, দাদু এখন টেক্সটবুক পড়ছেন?"

ডিমের হলদেটা চেটে-পুটে খেয়ে নিয়ে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "কি বুক পড়ছেন বললে?"

"টেক্সটবুক। আর্থার কুস্‌নীর লেখা, ফারমাকোলজি অ্যাণ্ড থেরাপিউটিক্‌স—দশম সংস্করণ।" লতিকা মাছভাজার প্লেটটা এগিয়ে দিল রমাপদর দিকে। নিঃশব্দে মাছভাজা খেয়ে চলল রমাপদ। কিছু আর বলবার ছিল না। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে কাজে যোগ দেওয়ার পরে অনেক রকমের লোক সে দেখেছে। পুরো বাংলা দেশটাকেই দেখেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু মাখন গুপ্তর জুড়ী কই বাংলা দেশে? মাছভাজা খাওয়া শেষ হওয়ার পরে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে যেতে হবে না?"

হ্যাঁ, যেতে হবে। তিনি ফোন করেছিলেন।"

"কারণটা কিছু বুঝতে পারলে?"

"না। সেই জন্যে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যদি দরকার হয় তোমাদের আরও টাকা দিতে বলব। কফিটুকু খাও, আমি আসছি।"

"কিন্তু—" মুখে কথা আটকে যাচ্ছে রমাপদর, "কিন্তু হিটলার যে আর নেই, তিনি আর কখনো টাকা দিতে পারেন?"

"দরকার থাকলে নিশ্চয়ই দেবেন। হিরোহিটো রয়েছেন—"

"অ্যাঁ? কি বললে? কি হিটো?" ভেতরে ভেতরে রমাপদ কাঁপছে। কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে লতিকা বলল, "তোমাদের খাতায় যদি কোন গোলমাল না থাকে, তা হ'লে ভয় পাবার কিছু নেই। আর তুমি যখন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষক তখন খাতায় কোন গোলমাল থাকবে না তা এক রকমে ধ'রেই নেওয়া যেতে পারে। তোমাদের আমি কেবল টাকা পাইয়ে দিই নি। তোমাদের মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করেছি।"

"ভগবান তো বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের খাতা দেখতে আসবেন না—"

অপরাধীর সুরে কথা বলতে লাগল রমাপদ। লতিকা তা বুঝতে পেরে একটু হাসল।

"হাসছ যে?"

"এমনিই।"

"হাসবার কি আছে, আমরা তো সদাশিববাবুর কাছে আর টাকা চাইব না।"

"বেশ তো, দরকার না থাকলে চাইবে না। কফিটুকু খেয়ে নাও।" লতিকা বেরিয়ে এলো খাবার ঘর থেকে।

কাপড় প'রে নীচে নেমে আসতে বেশি দেরি করল না লতিকা। রমাপদর পাশেই বসল ও। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আগে রমাপদ বলল, "ক' মাস আগে মাধুরী আর তার মাকে আমরা নেমন্তন্ন করেছিলুম।"

"যেতে যেতে কথা হবে, চলো।" বলল লতিকা।

রমাপদ যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখন দোতলার বৌটি দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। রমাপদ তাঁকে চেনে না, লতিকা চেনে।

"কোন্ রাস্তায় যাচ্ছ?"

"কেন, নেবুবাগান যেতে হবে তো? এই দিক দিয়েই সোজা হবে।" রমাপদ হিন্দুস্থান পার্কের পুব দিকে এগিয়ে এলো। লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "ডান দিকে ঘুরলেই তো ে কে যাওয়া যায়, না?"

"হ্যাঁ।" টপ গীয়ারে গাড়ি চলছে তখন।

"চলো, লেকের দিক থেকে একটু ুরে আসি। তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে কেমন হয়?"

"মন্দ হয় না, কিন্তু—"

"কিন্তু কি? তোমার বাবা যদি দেখে ফেলেন?"

"লেকের দিকে গেলেই বাবা দেখে ‍লতে পারেন। কিন্তু কথাটা তা নয়। ন'টা বাজে, ব্যাঙ্কে পৌঁছতে হবে সাড়ে ন'টায়।"

"এক কাজ করো। ব্যাঙ্ক হয়ে তারপর চলো নেবুবাগানে। আমি গাড়িতেই বসব। এখন মিনিট কুড়ি লেকের দিকটায় বেড়াতে পারব।"

"বেশ, বেশ—" রমাপদ লেকের দিকেই চলল। গাড়ি চালাতে খুব উৎসাহ পাচ্ছিল না ব'লেই বোধ হয় সে আবার বলল, "দৈনিক ব্যাঙ্ক থেকে মাত্র দু গ্যালন তেল পাই।"

"ব্ল্যাক থেকে তোমায় আজ তিন গ্যালন কিনে দেব আমি।"

মিলিটারী ব্যারাকগুলোর পাশ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল রমাপদ। কেউ দেখলে একদিক থেকেই দেখতে পাবে। একটু পরেই রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "পরেশবাবুকে চেনো?"

"চিনি। গত বছর যখন আমি আই. এ. পরীক্ষা দিই তখন তিন-চার মাস তাঁর কাছে পড়েছিলুম।"

"তুমি আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলে নাকি? কই, মাখনবাবু তো কিছু বলেন নি?"

"বলবার কি আছে এতে? একবার ফেল করলে কিছু বলা যায়। আমি ফেল করেছি ছুবার। পরেশবাবুকে তুমি চিনলে কি ক'রে?"

"বলছি—" গাড়িটা হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দিয়ে রমাপদ বলল, "না, বাবা নয়।" গাড়ি চালাতে চালাতে আবার সে বলল, "তোমার দাতুর মুখেই শুনলুম।"

"কবে শুনলে?"

"তা প্রায় ছু-তিন মাস হবে?"

"আমি আজ শুনলুম। মাধুরী সেখানে ইতিহাস পড়তে যায়।"

"মাধুরীদের আমরা প্রায় তিন মাস আগে একবার নেমন্তন্ন করেছিলুম। মাধুরী আসে নি।"

"দেখো ক'টা বাজল। তোমার আবার দেরি না হয়ে যায়!"

"সওয়া ন'টা বেজে গেছে। এবার ফেরা যাক। বোস সাহেব অসুস্থ।"

গড়িয়াহাট বাজারের পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে রমাপদ গাড়ি চালিয়ে চ'লে এলো। স্টোর রোড পার হ'ল। রেড রোডও পেছনে প'ড়ে রইল। হাইকোর্টের পুব দিক দিয়ে সোজা চ'লে এলো ক্লাইভ-স্ট্রীটে। সেখান থেকে ক্যানিং স্ট্রীট। এতটা পথ ওরা কেউ কথা কয় নি। রমাপদ একবার চেষ্টা করেছিল আলোচনা শুরু করতে। লতিকা শুরু করতে দেয় নি। সে কেবল বলেছিল, "রাস্তায় বড্ড ভিড়। গাড়ি চালাবার সময় কথা বলার দরকার নেই।"

ব্যাঙ্কের উল্টো দিকে গাড়ি রাখল রমাপদ। ভেতরে আর নিয়ে গেল না। গাড়ি থেকে নামবার সময় বলল, "একটু দেরি হতে পারে। ভেতরে আসবে?"

"না, গাড়িতেই বসি।"

"আমি কোথায় ব'সে কাজ করি দেখতে চাও না ?"

"অন্য একদিন দেখব।"

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে রমাপদ আবার ফিরে এলো। লতিকার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "মাধুরী সেদিন নেমন্তন্ন খেতে আসে নি।"

"ক'বার তো শুনলুম। অতবার শোনাচ্ছ কেন ?"

"কথাটা তখন শেষ করতে পারি নি। আমাদের বামুন ঠাকুর মাংস ছোঁয় না ব'লে আমি মাধুরীর জন্যে হোটেল থেকে মাংসের চপ ভাজিয়ে এনেছিলুম।"

"অত দূরে যাওয়ার দরকার কি ছিল ? আমাকে বললেই তো পারতে!"

"তোমাকে বলিনি, তার কারণ তোমাকে বলতে চাইনি। কিন্তু মাধুরীকে খুঁজতে বাবা যে তোমাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন তেমন সম্ভাবনার কথা আগে ভাবতে পারিনি।

"তোমার বাবা আমাদের বাড়িতে মাধুরীকে খুঁজতে এসেছিলেন ব'লে তো মনে পড়ে না। দাদু তো আমায় কিছু বলেন নি।"

"এ খবর তুমি জানতে না ?" বিস্ময়ের চাপ সহ্য করতে না পেরে রমাপদ আবার এসে গাড়িতে বসতে যাচ্ছিল। লতিকা বলল, "আবার গাড়িতে আসছ কেন ?"

"এটা কি রকম হ'ল ? তোমার দাদু তা হ'লে কথাটা চেপে গেছেন ?"

"তাতে এমন কি খারাপ হ'ল ? তুমি যা ছিলে, তাই রইলে। কেবল চপ কিনতে পয়সাটাই যা তোমার নষ্ট হ'ল।"

"না, পয়সা নষ্ট হয় নি। টিফিন-কেরিয়ারে ক'রে বাবা চপ নিয়ে কসবা গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে। মাধুরী বাবাকে বলেছে যে, সে নাকি চপ খেতে ভালবাসে।"

"এখানে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ সময় নষ্ট করতে পার, দেখি।"

"না, যাচ্ছি। আচ্ছা, পরেশবাবুর ব্যাপারটা কি ?"

"কী ছেলেমানুষিই করছ তুমি!" এই ব'লে মুখ টিপে টিপে লতিকা এমনভাবে হাসতে লাগল যে, রমাপদ আর ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

ইস্কুলে যাওয়ার সময় হ'ল মাধুরীর। সকালে সে নিজের পড়া শিখেছে। ভাল ক'রে মন দিয়ে পড়তে পারলে হয়তো এ বছরই সে আই. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে পারবে। আরও তো ক'টা মাস এখনো বাকি আছে। কিন্তু মনের যা অবস্থা তাতে মনে দিয়ে পড়াশুনো করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ওর ধারণা ছিল, কসবার এই গলিটায় মিলিটারী লরী চ'লে না ব'লে মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে। তেমন ধারণা মাধুরীর বদলে গেছে। মিলিটারী লরীর চেয়েও ভারী ওজনের লরী এখন ওর মনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে।

পরের রবিবারে পরেশবাবু এসেছিলেন মাধুরীর কাছে। ওর পালিয়ে আসবার কারণটা তিনি জানতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে তেমন কিছু গুরুত্ব তিনি আরোপ করেন নি। শরীর খারাপ, না কি একটা মাধুরী যেন বলেছিল। পরেশবাবু সেই কারণটা সত্য ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। পরে আরও অনেকগুলো রবিবার এসে চ'লেও গেছে। মাধুরী প্রত্যেকটা রবিবারেই নিয়মিতভাবে সেখানে গিয়ে ইতিহাসের পড়া শিখে এসেছে।

বালিগঞ্জ স্টেশনে গাড়ির শব্দ পেল মাধুরী। এটাই বোধ হয় লক্ষ্মীকান্তপুরের ন'টা পনরোর গাড়ি। সময়ের অনুমান করতে গিয়ে মাধুরী দেখল, মা এসে দাঁড়িয়ে আছেন ওর পাশে।

"কিছু বলবে মা ?"

"লতিকার জন্যে গহনা পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে। কি করি বল্ তো ?"

"পরের গহনার দিকে তুমি দৃষ্টি দাও কেন ?" মাধুরী একটু বিরক্তই হ'ল।

"মাধু, আমি একবার দাদার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কি যে হচ্ছে সেখানে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"পরের বাড়ির ব্যাপার তোমার বুঝবার দরকার কি মা ?"

"রমাপদ যদি সত্যিই লতিকাকে বিয়ে করে, তা হ'লে দাদার মুখেই আমি তা শুনতে চাই।"

"যে বিয়ে করবে তার মুখের কথার চেয়ে কি মামার মুখের কথার দাম বেশি ? আমি পরীক্ষা দেব, বিয়ে এখন করব না। শান্ত জলেও যদি বন্দরের দরকার হয়, আমি খুঁজে নেব।"

নিমেষের মধ্যে সৌদামিনী দেবীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি

মাধুরীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "খুঁজে নেবার মধ্যে দায়িত্ব অনেক। ভয় অনেক। মাধু, না না, খুঁজে নেবার কথা ভাবিস নে। তোর সঙ্গে আমি তর্ক ক'রে পারব না।"

বইটা বন্ধ ক'রে রেখে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "সেদিন তো মামার সঙ্গে দেখা হ'ল, কিছু জিজ্ঞাসা করো নি তাঁকে ?"

"জিজ্ঞাসা করবার সময় দিলেন কই ? ব্যাঙ্ক থেকে তোর বিয়ের সেই পাঁচ হাজার টাকা তুলে তিনি আমায় নিয়ে এলেন পোস্ট-অফিসে। সেখানে টাকা রাখতে অনেক দেরি হয়ে গেল।"

"ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনলে কেন ? অনেক তো সুদ পেতে ?

"দাদা বললেন, ইয়োরোপের অবস্থা ভাল না, টাকা সব তুলে ফেল্।"

"ইউরোপের অবস্থা হয়তো ভাল না, তাতে ব্যাঙ্কের কি ?"

"না না, মাধুরী, এসব টাকা-পয়সার কথা দাদাই সবচেয়ে ভাল বোঝেন। রমাপদকে নিয়ে তিনি হয়তো অন্যায় করছেন, কিন্তু আমাদের টাকার প্রতি তাঁর ষোল আনা দরদ আছে। এ টাকা তোর বাবার। তোর বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই।"

আলোচনাটা পরিকল্পিত রাস্তা থেকে স'রে যাচ্ছে ভেবে সৌদামিনী দেবী চুপ ক'রে রইলেন। মাধুরী বলল, "ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি শুধুশুধু ভেবে মরছ।"

"ভাবনার কি আমার অন্ত,আরে মাধু! এবার তো সুদের টাকাও বিশেষ কিছু আর পাওয়া যাবে না।"

বিয়ের আলোচনাটা বন্ধ হ'ল ব'লে মাধুরী খুশীই হ'ল খুব। টাকার কথার জের টেনে সে বলল, "আসছে মাস থেকে আমার মাইনে বাড়বে। ইস্কুলটা খুব বড় হচ্ছে মা।"

"তোকে খাটতেও হবে অনেক বেশী।"

"না, খাটুনি তেমন বাড়বে না। মতিলালবাবু ইস্কুলের জন্যে আরও লাখ টাকা দিয়েছেন। ইস্কুলের নাম যাচ্ছে পাল্টে।"

"কি নাম হবে ?"

"সুলতা বালিকা বিদ্যালয়। সুলতা কে জানো ?"

"না। সুলতা কে রে ?"

"মতিলালবাবুর মেয়ে। আর কোন সন্তান নেই তাঁর। বছর দশ বয়স হয়েছিল সুলতার।" এই ব'লে থামল মাধুরী।

সৌদামিনী দেবীও অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, মতিলাল-বাবুর জীবনে কোন একটা অঘটন ঘটেছে।

কথাটা বলবার আগেই মাধুরীর মনটা ভিজে উঠল। ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, "মতিলালবাবুর মেয়েটি মাস খানিক আগে মারা গেছে। সুলতা সন্ধ্যের সময় হঠাৎ কি কারণে যেন বাইরে এসেছিল। ছেলেমানুষ, রাস্তাঘাট দেখতে পায় নি। একটা পাঁচ টনের মিলিটারী লরী সুলতার ওপর দিয়ে চ'লে গেল। সুলতার চিৎকার কেউ শোনে নি—হয়তো চিৎকারের শব্দ লরীর আওয়াজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। লরীটা থামে নি। ড্রাইভার হয়তো বুঝতেই পারে নি যে, সে কাউকে চাপা দিয়েছে। সুলতা প'ড়েই ছিল রাস্তায়। মতিলালবাবু ফিরলেন ঘটনার একটু পরেই। তিনি তাঁর নিজের গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়ালেন। সুলতাকে তিনিও চিনতে পারেন নি। সুলতার শাড়ি দেখে তিনি বুঝলেন যে, থেঁতলে যাওয়া মাংসপিণ্ডটা তাঁরই মেয়ে। তিনি মিলিটারী-কণ্ট্রাক্টর, কিন্তু ঐ দৃশ্য দেখে মতিলালবাবুও মূর্ছা গেলেন।"

চোখ মুছে সৌদামিনী দেবী বললেন, "তোর বোধ হয় ইস্কুলে যাওয়ার সময় হ'ল মাধু।"

মাধুরী উঠল। চান-ঘরের দিকেই যাচ্ছিল সে। সৌদামিনী দেবী আবার বললেন, "রাস্তাঘাট দেখে চলিস, মাধু।"

"আমাদের গলিতে মিলিটারী লরী ঢুকতে পারে না।

"তা আমি জানি। আমি বলছিলুম, রবিবারের কথা। পরেশবাবুর বাড়ি যাওয়ার পথে সাবধানমত যাস। বিপদের কথা কেউ বলতে পারে না, মাধু। যে রাস্তায় মিলিটারী লরী চলে না, সেখানে কি বিপদ নেই?"

চান-ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল মাধুরী।

রমাপদ আর লতিকা এলো নেবুবাগানে। বেশ বেলাতেই এলো সদাশিব রায় ব'সে ছিলেন তাঁর অফিস-ঘরেই। দু-চারজন বাইরের লোক

ছিলেন সেখানে। ওরা যাওয়ার পরে তাঁদের বিদায় দিয়ে দিলেন তিনি। লতিকাকে বললেন, "ওপরে যাবি না?"

"তেতলায় আবার ওঠানামা করতে কষ্ট হবে। ও তো এখানেই আছে, কি বলবে বলো। ওপরে গিয়ে যদি আবার সবার সামনে রমাপদকে গালমন্দ করো তা হ'লে ও ভীষণ লজ্জা পাবে, দাদু। তোমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে ব'লে তো ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারো না। তুমি ভাল হয়ে ব'সো রমাপদ। দরজাটা ভেজিয়ে দি, দাদু?"

"হ্যাঁ, এইটেই সবচেয়ে কাজের কথা বলেছিস। কিন্তু রমাপদকে আমি গালমন্দ করব এটা তুই ভাবলি কি ক'রে, লতু?"

"ঠিকই ভেবেছি। দাদু, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। ওপর থেকে আমি জল খেয়ে আসছি। চটপট কথা তোমার সব সেরে নাও। তুমি জল খাবে, রমাপদ?"

"আমার বাড়িতে এসে তুই সর্দারি করছিস কেন, লতু? রমাপদ এখানে খেয়ে যাবে। বউমা আমায় সকালবেলাই ব'লে রেখেছেন।"

"যাক, বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলুম, রমাপদকে তুমি কত কী-ই না বলবে!"

সদাশিব রায় এবার রমাপদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাঙ্ক কি রকম চলছে?"

"ভালই তো চলছে।"

"হিসেবপত্র তুমি সব ঠিকমত দেখছ কি?"

"বোস সাহেব যতটা আমায় দেখতে দেন, ঠিক ততটাই দেখি।"

"সবটুকু তা হ'লে তুমি দেখতে পাও না?"

"না।"

"গোড়া থেকেই আমি তা জানতাম। লতু, ওপরে গিয়ে ব'লে আয়, আগে এখানে দু গেলাস ঠাণ্ডা শরবৎ পাঠিয়ে দিতে।"

"তোমার ব্যবসার কথা আগে শেষ করো, তারপরে যাব।"

সদাশিব রায় হাসতে হাসতে বললেন, "না না, ওদের সঙ্গে আমার কোন ব্যবসাই নেই। বোস সাহেব তো ব্যবসা করেন না, ব্যাঙ্ক চালান। তোমার কি মনে হয়, রমাপদ?"

ভাবতে বসল রমাপদ। বোস সাহেবের কতটুকু সে দেখেছে যে, তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ একটা মন্তব্য প্রকাশ ক'রে বসবে? রমাপদ তাই ভেবে ভেবে বলতে লাগল, "দেখুন, বোস সাহেবকে আমি এখনো ঠিক চিনতে পারি নি—"

"এ তো উপন্যাসের কথা হ'ল—মজাদার ডায়লগ।"

"দাদু!"

"ও, হ্যাঁ, লতু, এখানে আছিস দেখছি। থাক্ থাক্, ব্যবসার কথা থাক্। শরবৎ আনিতে বল্।"

বলবার আগেই ট্রেতে সাজিয়ে শরবতের গেলাস নিয়ে উপস্থিত হ'ল বাড়ির একজন লোক। লতিকা দেখল যে, রমাপদর উল্টো দিকের একটা দরজার ফাঁক দিয়ে তার মামীমা রমাপদকে দেখছে। অনেকক্ষণ আগে থেকে রমাপদও তা লক্ষ্য করছিল। একটু ঘুরে বসবার চেষ্টাও করেছিল একবার। কিন্তু পুরোপুরি ঘুরে বসতে গেলে সদাশিববাবুর দিকে পেছন দিয়ে বসতে হয় ব'লে রমাপদ তা পারে নি। রমাপদর শরবৎ খাওয়া শেষ হ'লে পর লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "ডেকেছিলে কেন, দাদু?"

"তা হ'লে তো আবার ব্যবসার কথা উঠে পড়ে মা। যাক, যাক, যা দিয়েছি তা তো আর ফিরে আসবে না। শেযার আর ফিক্সড ডিপজিট মিলে—দাঁড়া একটু, হিসেবটা বার করি।" সদাশিববাবু তাঁর সামনের তাকিযাটার তলায় হাত ঢুকিযে একটা কাগজের টুকরো খুঁজতে লাগলেন। একটা স্লিপ কাগজ হাতে নিয়ে বললেন, "হিসেবটা পাকা খাতায় পর্যন্ত তুলি নি। পেন্সিল দিয়ে একটু কেবল নোট রেখেছি। জানতুম, এটা যাবে। অঙ্কটা দেখবি না কি, লতু?"

লতিকা ততক্ষণে ব্যাপার সব বুঝতে পেরেছে। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। রমাপদর বাবা ঠিকই বলেন যে, মানুষ কিংবা বস্তুর মেরুদণ্ডই হচ্ছে চরিত্র। রমাপদর মুখেই এসব কথা সে শুনেছে। যাক, এ সম্বন্ধে আর তর্ক করা চলে না। তর্ক করলও না লতিকা। সে কেবল বলল, "বাঙালী প্রতিষ্ঠান, বোস সাহেব যদি ভুলও ক'রে থাকেন, আমরা তা শুধরে দিতে পারব। দরকার হয়, তুমি আরও টাকা দেবে, দাদু।"

"শরবৎটা সব খেলি না কেন, লতু? যা, বউমা অপেক্ষা করছেন, রমাপদকে নিয়ে ওপরে যা। রমাপদ, লতুর সঙ্গে তুমিও যাও।"

ওরা চ'লে যাওয়ার পরে সদাশিব রায় স্লিপ কাগজখানা ছিঁড়ে ফেললেন কুটি কুটি ক'রে। দরওয়ানটা'কে ডেকে বললেন, "রাস্তার ডাস্টবিনে এগুলো সব ফেলে দিয়ে আয়।"

রবিবারদিন দুপুরবেলা মাধুরী এলো ইতিহাস পড়তে পরেশবাবুর ফ্ল্যাটে। গত চার-পাঁচটা রবিবার ঘরের মধ্যে সেণ্টের গন্ধ পায় নি মাধুরী। নাক দিয়ে নিশ্বাস টেনে টেনে সে গন্ধ পাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

আজকে চেষ্টা করার আগেই সেণ্টের গন্ধ পেল আবার। সেই পুরনো সেণ্ট-মাখা মেয়েটিই যে একটু আগে এখান থেকে উঠে গেছে মাধুরীর আর তাতে কোন সন্দেহ রইল না। আজও পরেশবাবু দেরি ক'রে খেতে বসেছেন। ঘরের আবহাওয়ায় ঘটনার সন্ধান করতে লাগল ও। টেবিলের ওপর কোন পরিবর্তন নেই। ওরিয়েণ্টাল টেবিল-ল্যাম্পটা এক জায়গায়ই আছে। চারদিকের বইগুলোও সব সাজানো-গোছানো আছে অন্য দিন-কার মত।

ঘরের মেঝেতে ছাইদানিটা উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে। সিগারেটের পোড়া অংশ ক'টা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে! টেবিল থেকে অসাবধানে হাত লেগে প'ড়ে গেলে ছাইদানিটা টেবিলের কাছেই মেঝেতে প'ড়ে থাকত। মাধুরী দেখল, একেবারে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে ছাইদানিটা পড়েছে। মনে হয়, কেউ যেন ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে।

এবার সে টেবিলের কাছে এলো। গেল রবিবার মাধুরী ইতিহাসের একটা নতুন বই কিনে এনেছিল। অধ্যাপক পরেশ গুহ বইখানা রেখে দিয়েছিলেন, উল্টেপাল্টে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন ব'লে। বইখানা টেবিলের ওপর থাকা উচিত ছিল, কিন্তু নেই।

মাধুরী ডান দিকে কতকগুলো মোটা মোটা গ্রীক ইতিহাসের বই দেখতে পেল। ভাল ক'রে নজর দিতে গিয়ে সে দেখল যে, সেই ইতিহাসের বইখানাকে যেন লুকিয়ে রাখবার জন্যেই এর ওপরে মোটা মোটা বইগুলোকে চাপানো হয়েছে। আলগা ভাবে বইখানাকে টেনে বার করল মাধুরী।

বইটা আস্ত নেই। ইতিহাসের পাতাগুলো সব ছেঁড়া। ইতিহাসটাকে যেন কেউ দু টুকরো ক'রে রেখেছে। অদ্ভুত রকমের একটা মানসিক

উদ্বেলতা অনুভব করল মাধুরী। বইখানাকে আগের জায়গায় গুঁজে রাখতে বিলম্ব করল না সে। ঘরের আবহাওয়া দুর্ঘটনার ঝড়ে বিপর্যস্ত। পরেশ-বাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল মাধুরী। নোট নেবার জন্যে যে খাতাখানা সে সঙ্গে এনেছিল, সেটাকে ভাঁজ ক'রে রেখে দিল তার নিজের হ্যাণ্ড-ব্যাগে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে পরেশবাবু এলেন। পরেশবাবু মাথায় আজ তেল মাখেন নি, চান করেন নি নিশ্চয়ই। চুলগুলো সব এলোমেলো হয়ে আছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর মত তিনি ভগ্ন এবং বৃদ্ধও বটে। মাধুরীর মনে হ'ল, তাঁর মুখের ওপর থেকে বিদ্যাবুদ্ধির দীপ্তি-চিহ্ন সব লোপ পেয়েছে। এ-মুখের মধ্যে এখন কেবল গবেষণার কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নেই। গবেষণার আগ্রহ নিয়ে মাধুরী এবার চেয়ে রইল পরেশবাবুর মুখের দিকে।

চেয়ারে ব'সে পরেশবাবু মুখটা নীচু ক'রে রাখলেন। একটু পরেই তিনি জানতে চাইলেন, "গেল রবিবারে আমরা কতদূর এগিয়েছিলাম ?"

মাধুরী চুপ ক'রে রইল।

"তোমার বোধ হয় মনে নেই, না মাধুরী ?"

মাধুরী তবুও জবাব দিল না।

"রোমান সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনা হচ্ছিল। আজও তাই হবে। টেক্সট বইটা শুরু করার আগে রোমান ইতিহাসের দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা তোমায় বলতে চাই। টেক্সট বইটা—" পরেশবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। মাধুরী জানে টেক্সট বইটা ছেঁড়া, বার করতে গেলেই কোন একটি ভদ্রমহিলার অসভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা পরেশবাবুকে আগে আলোচনা ক'রে নিতে হবে।

তিনি বললেন, "টেক্সট বইটা এখন থাক্। অগাস্টাস থেকে শুরু ক'রে থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চার শো বছর রোমান ইতিহাসের সব-চেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পরে প্রায় পনরো শো বছর কাটল—কি দেখলুম আমরা ?"

মাধুরী তো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পরেশবাবু দেখলেন। একটু পরেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "রোমান সভ্যতা ক্ষ'য়ে যাচ্ছে। যেতে বাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাস প'ড়ে আমরা একটা মস্ত বড় সত্য আবিষ্কার করেছি। আবিষ্কারটা কি বলতে পার ?

না, মাধুরী যা আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে অতীতের কোন সত্য নেই। মাধুরীর আবিষ্কার বর্তমানের মধ্যে সীমিত—পরেশবাবুর ঘরের বাইরে তার অস্তিত্ব নেই।

মাধুরী বললে, "না সার্, আমি বলতে পারব না।"

"আমি বলছি। ইতিহাস প'ড়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সভ্যতার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যত বেশি বাড়তে থাকে, তার নিজের গভীরতা কমতে থাকে তত বেশি। রোমান সভ্যতার বেলায়ও—"

রজনী খাবার নিয়ে এলো। লুচি, তরকারি, মাছের ঝোল, মিষ্টি। রজনী বলল, "দাদাবাবু কিছু খায় নি আজ।"

"আমি এখন খাব না, রজনী। এখান থেকে সব নিয়ে যা।"

"খুব অল্প ক'রে এনেছি, খেয়ে নাও। যুদ্ধ করতে হ'লে গায়ে জোর লাগে।"

পরেশবাবুর মুখ দেখে মাধুরীর মনে হ'ল, তিনি বিনা-যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করতে চান। রজনী খাবাবের ট্রে হাতে ক'রে তখনো তার দাদাবাবুর দিকে চেয়েছিল। মাধুরী ভাবল, চুপ ক'রে আর ব'সে থাকা যায় না। ব'সে থাকলে অন্যায় হবে। তাই সে বলল, "তুমি এখানে সব রাখো, আমি দেখছি।"

মাধুরীর কথায় খুশী হ'ল রজনী। টেবিলের ওপর সব খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে মাধুরী বলল, "আচ্ছা, তুমি এবার যাও।"

রজনী গেল।

"হাতটা একটু ধুয়ে নিন, সার্। ঘরের মেঝে তো খুবই নোংরা হয়ে আছে, জল একটু পড়লে ক্ষতি হবে না।"

অল্প জল্ দিয়ে আঙুলগুলো ধুয়ে ফেললেন অধ্যাপক পরেশ গুহ। দুখানা লুচি খেয়েই পরেশবাবু বললেন, "আর খিদে নেই।"

"অসুস্থ লোকের খিদে থাকে না। নিন্, মাছটা খেয়ে ফেলুন।" বাটি থেকে মাছ ঢেলে দিল মাধুরী। মাছটা খেয়ে অধ্যাপক বললেন, "রোমান সভ্যতার সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে—"

"রজনীকে আবার ক'খানা লুচি আনতে বলি, সার্?"

"না। আমি অসুস্থ, মাধুরী।"

ভেতরের দরজার ফাঁক দিয়ে রঞ্জনী এর মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছে। একটু পরে সে আরও ক'খানা গরম লুচি নিয়ে এলো।

পরেশবাবু আপত্তি করলেন। কিন্তু মাধুরীর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। সুস্থ লোকের মত তিনি দুখানা লুচি এক সঙ্গে ক'রে খেতে লাগলেন।

খেতে খেতে পরেশবাবু এক সময়ে বললেন, "তোমার টেক্সট বইখানা দু টুকরো হয়ে গেছে।"

"যাক, ভালই হয়েছে। রোমের ইতিহাস তো দু টকরো হবেই, সার্। কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী তৈরি হওয়ার পর রোমান-সাম্রাজ্য দু খণ্ডে ভাগ হ'ল।—দই আর মিষ্টিটুক সব খেতে হবে কিন্তু।"

"খাব।" এক ঢোক জল খেয়ে পরেশবাবু বললেন, "সাধারণত বহু সংখ্যক ঐতিহাসিকদের মতে তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আসলে রোম-সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়েছে অগাস্টাসের সময় থেকে।"

"কি রকম?" সন্দেশের পিরিচটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করল মাধুরী।

"অগাস্টাসের সময়েই রোম এবং আলেকজেন্দ্রিয়া কার্যত দুটো বিভিন্ন অংশই ছিল। আর খাব না, মাধুরী। আমি অসুস্থ।"

"কি অসুখ হয়েছে, সার্?" মাধুরী এবার গবেষণার কুয়াশা দূর করতে চায়।

পরেশবাবু ভেবে নিয়ে বললেন, "রোমের ইতিহাসটা ছিঁড়ে ফেলেছে বন্দনা ঘোষ।"

"ঐ যে যিনি আপনার কাছে পড়তে আসেন?"

"প্রথম প্রথম ক'দিন পড়বার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু পরে বন্দনাই আমায় পড়াতে লাগল। আজকে ক্লাইমাক্স! বই ছিঁড়েছে, ছাইদানিটা ছুঁড়ে মেরেছে দেয়ালের দিকে, পেন্সিল-কাটা ছুরিটা হাতে নিয়ে আমায় আক্রমণ করতে এসেছিল। ছুঁড়ে মারবার কায়দা জানলে আমি আজ খতম হয়ে যেতুম।"

"কী সাংঘাতিক! ওকে গান্ধীজীর জীবন-চরিত পড়তে বলুন, সার্। ইতিহাস পড়তে দেবেন না।"

"কিন্তু বন্দনা এসব করেছে কেন জান?"

"না, সার্।"

"তোমার জন্যে। তুমি এখানে পড়তে আস তা সে চায় না। মানে, আমি যদি প্রফেসনাল হতুম, তা হ'লে বন্দনার আপত্তি থাকত না। বিনে পয়সায় তোমাকে পড়াচ্ছি ব'লে সে এর মধ্যে ভিন্ন রকমের অর্থ খুঁজে পেয়েছে।"

"কিন্তু আমি তো, সার্, পয়সা দিয়ে পড়তে পারব না।"

"না না, পয়সা দেওয়ার দরকার নেই। তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে রসিদ দিচ্ছি তা দেখলেই সে শান্ত হবে। মাধুরী কাল আমি একটা রসিদ লিখে রাখব। টিকিট কিনে তার উপরে সই বসিয়ে দেব। বন্দনা যদি দেখতে চায়, তুমি তাকে দেখাতে পারবে না? পঞ্চাশ টাকার রসিদ কাটব, কেমন? মাধুরী, পৃথিবীর ইতিহাস শেষ করলুম, কিন্তু রসিদের জন্যে কারো এমন বিপদ হয়েছে ব'লে তো জানি না।"

"আপনি টাকা নিয়ে রসিদ দিচ্ছেন ব'লে তাকে বলেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, বলেছিলুম, কথা দিয়েছিলুম যে, আজ সকালে তোমার কাছ থেকে একটা রসিদ এনে রাখব, বন্দনা দেখবে। ওকে আমি ভয় পাই।"

"কেন, সার্?"

"বন্দনার বাবা আমার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছেন। ওর বাবা আবার শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি।"

"তা হ'লে আমি আর আসব না, সার্। রসিদের মধ্যে যদি সত্য থাকত, আসতুম।"

"সত্য নেই ব'লেই তো আমিও রসিদ কাটতে পারি নি। নইলে কালই তো আমি স্ট্যাম্প কিনে সই ক'রে রাখতুম।"

"পেন্সিল-কাটা ছুরিটা টেবিলের উপর আর রাখবেন না, সার্। নিন এবার দইটুকু খেয়ে ফেলুন।" বাটি থেকে যখন মাধুরী দই ঢালছিল, বাইরের দরজায় তখন আওয়াজ হ'ল দু বার। দু জনেই মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল। পরেশবাবু ভয় পেয়ে বললেন, "সর্বনাশ করেছে, বন্দনা বোধ হয় আবার এলো! মাধুরী, এই ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে দেব। তোমাদের কসবার গলিতে একখানা ঘর আমায় খুঁজে দিতে পার? আজ সন্ধ্যের মধ্যেই আমি পালিয়ে যেতে চাই। তোমাদের কাছে থাকলে, আমার জোর বাড়বে। ল্যান্সডাউন রোডের এই ফ্ল্যাটে আমি বড্ড অসহায় বোধ করি।"

দরজায় আবার আওয়াজ হ'ল। মাধুরী বলল, "আপনি বসুন, সার্, আমি খুলছি।" দইয়ের বাটিটা হাতে নিয়েই মাধুরী গেল দরজা খুলতে। খুলে দিলও সে। বন্দনা নয়, ঘরে ঢুকলেন মাখন গুপ্ত।

দইয়ের বাটিটা দেখবার আগে মাখনবাবু মাধুরীকে দেখলেন। পরেশবাবু এঁটো হাত নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ব্যস্তভাবে বলেলন, "আমি হাত ধুয়ে আসছি।"

মাখনবাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন? আপনার না বিলেত যাওয়ার কথা?"

"বিয়ের পরে যাব।"

"বিয়ে এখনও হয়নি?"

"না।"

"আমি তো নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলুম। ভাবলুম যে, আমি বোধ হয় লেট হয়ে গেলুম।"

"গরম গরম লুচি ভাজা হচ্ছে, খাবেন?"

"আরে ভাই, গরম লুচির স্বাদ এই বয়সে আর পাব না। ঠাণ্ডা জল আনতে বলুন দিকি এক গেলাস।" মাখন গুপ্ত বেশ ভাল করে সোফার ওপরে বসলেন। মাধুরী দাঁড়িয়েই ছিল। পরেশবাবু চ'লে যাওয়ার পরে তিনি বললেন, "তোর আর দোষ কি বল্? সন্তুর বয়স যখন তোর মত ছিল, সেও লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য পাড়ায় চ'লে যেত। সন্তু পছন্দ করেছিল একটা ভ্যাগাবণ্ড পাঁড়াগাঁয়ের লোক। আমি তখন সবে মুন্সেফ হয়েছি। ছুটি নিয়ে দেশে এলুম। বিয়ে দিয়ে দিলুম তোর বাবার সঙ্গে। সন্তুর প্রেমের ফুসকুড়ি গ'লে যেতে এক মিনিটও লাগল না। কিন্তু তোর পছন্দ ভাল। কি রে মাধু, কথা বলছিস না যে? ঝড় এলো না কি? দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব সব কোথায় গেল? ইতিহাস কই? এ যে দইয়ের বাটি রে মাধু। যাক্, এবার থেকে বড় বড় বক্তৃতা দেওয়ার মুখ তোর ব'ন্ধ হল। এখন আর সুভাষ বোসের ফোটো পুজো ক'রে কি করবি? কদম কদম কোন্ দিকে বাড়বি? ইংরেজের মত মহৎ জাতি কখনও পরাজিত হয় না, মাধু। তোর পুজো ব্যর্থ হয়ে গেল।"

মাধুরী যেন কিছুই শুনছিল না। শোনবার মত কানের আর শক্তি নেই।

মাধুরী চ'লে যাওয়ার জন্মে হ্যাণ্ড-ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিল ঘাড়ের ওপর। এগিয়ে গেল বাইরের দরজার দিকে। সোফায় ব'সেই মাখনবাবু বললেন, "পাড়া-গাঁয়ের সেই লোকটা কে জানিস? বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ললিতবিহারী বোস। লোকটা আজও তেমনি আছে—লোফার। সদ্থ জিতেছে। জিতিয়েছি আমিই। যাচ্ছিস, মাধু? আমাদের ওখানে একবার আসিস। লতুর বিয়ে তো এগিয়ে এলো, গহনা কেনা হয়েছে, এসে একবার দেখে যাস।"

পরেশবাবু এলেন। মাধুরীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, সার্। আর আসব না।"

"তা হ'লে বইখানা নিয়ে যাও।"

পরেশবাবু ছেঁড়া বইখানা দিয়ে দিলেন মাধুরীকে। সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মাখনবাবু বললেন, "আমিও চলি, অধ্যাপক।"

কোন কথা ছিল নাকি?"

"না, কেবল দেখতে এসেছিলুম যে, মাধুরী ইতিহাস পড়ছে, না, ইতিহাস তৈরি করছে।"

॥ ছয় ॥

রবিবারের সকাল। শীতের শুরু। কটা মাস যে কেমন ক'রে কেটে গেল রমাপদ তা টের পেল না। কলকাতায় যে ঋতু-পরিবর্তন হয় তেমন কথা সুধাময়ীর মুখে শুনতে পেয়ে রমাপদ আশ্চর্য হয়ে গেল! রমাপদ বাইরে বেরুবার জন্যে দ্রুতপায়ে নেমে আসছিল নীচে। সুধাময়ী টের পেয়েছেন আগেই যে, সে নীচে নামছে। সিঁড়ির ও-পাশ থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, এমন দুমদাম ক'রে কোথায় যাচ্ছিস?"

"রিজেণ্ট পার্কে, বোস সাহেবের বাড়ি।"

গরম জামা গায় দিস নি কেন?"

"গরম জামা! শীত পড়ল কবে?"

"পৌষ মাস শুরু হ'ল খোকা, গায়ে একটা কোট চাপিয়ে যা।"

"আমি তো সেই ভোরবেলা থেকেই ঘামছি—" রমাপদ সুধাময়ীর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। সুধাময়ী রমাপদর গায়ে হাত দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কি রে? গায়ে তোর ঘাম কেন? পৌষ মাসের সকাল সাতটাও বাজে নি—না, খোকা, ডাক্তার দেখা বাবা।"

"আমায় ছেড়ে দাও মা, সময় নেই।"

"তা বাপু ছেড়ে দিচ্ছি। অনেক দিন তো হ'ল ওরা আসে না, তোকে খবর নিতে বলেছিলুম, নিয়েছিস?"

একটু অন্যমনস্কভাবে রমাপদ জবাব দিল, "খবর আসে নি! বোধ হয় ওরাও ডোবাবে।"

"ওরা? ওরা কারা? কারা ডোবাবে, খোকা?"

"হিরোহিটো।—বিশ্বাস নেই, সন্ধি ক'রে ফেলতে পারে। সবাই তো ভেবেছিল, জাপানীরা বীরের জাত!"

রমাপদর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সুধাময়ী বললেন, "খোকা, তোরা ব্যবসা করছিস, না, সার্কাস চালাচ্ছিস?"

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করল রমাপদ। গাড়িটা স্টার্ট নিতে দেরি করছে। যুদ্ধ যতদিন না থামে ততদিন পর্যন্ত স্টার্ট নিলেই কাজ মিটে যাবে

ওর। কিন্তু রমাপদর মনে হচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে। মাসের মধ্যে দশ দিন তো গাড়িটা কারখানাতেই থাকে। বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টার পরে শেষ পর্যন্ত গাড়ি থেকে আওয়াজ বেরুলো। যামিনীর সুবিধে হ'ল তাতে। নইলে ওকেই তো গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হ'ত আধ মাইল দূর পর্যন্ত।

লেকের ধার দিযে রমাপদ আজ চলল রিজেণ্ট পার্কের দিকে। মার কথা কি তবে সত্যি? পৌষ মাস আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি? লেকের দিকে এসে ঘামটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল ওর। ডান দিকের ক'টা ব্যারাক খালি হয়ে গেছে। খালি ব্যারাক দেখে রমাপদর বুকের ভেতরটা মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল। গাড়িটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে রমাপদ নেমে এলো। ব্যারাকগুলো সত্যিই খালি হয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে রমাপদ এগিয়ে গেল পুব দিকে। ব্যাপার কি? খালি ব'লেই তো মনে হচ্ছে! বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে ওদের বোধ হয় এর মধ্যেই আদেশ এসে গেছে। হিরোহিটো কি তবে সত্যিই আত্মসমর্পণ করবেন?

গাড়িতে আবার সে উঠে বসল। লেকের জলে বাচ খেলছে সাহেবরা। গাড়িতে ব'সেই বাচখেলা দেখতে লাগল রমাপদ। শীতের সকালটা মন্দ লাগছে না। ঘাম শুকচ্ছে। লেকের শান্ত জলের দিকে চেয়ে চেয়ে রমাপদ সিগারেট খেতে লাগল। বাচ খেলার মধ্যেও যুদ্ধ থেমে যাওয়ার একটা পূর্বাভাস দেখতে পেল সে। বোস সাহেবের বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়তো প্রশান্ত মহাসাগরের জলও লেকের জলের মত শান্ত হয়ে যাবে। পোড়া সিগারেটটা রমাপদ ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে।

রিজেণ্ট পার্কে পৌঁছতে রমাপদর বেশি দেরি হ'ল না। আরও তাড়াতাড়ি সে পৌঁছতে পারত। কিন্তু ইঞ্জিনের শক্তি গেছে ক'মে, রমাপদ চেষ্টা ক'রেও তার স্পীড বাড়াতে পারল না। গাড়িটা এক দিকে পার্ক ক'রে রমাপদ নেমে এলো। বাগানের দু দিকে লাল সুরকির রাস্তা। বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। এক সঙ্গে পনরো-কুড়িখানা গাড়ি পার্ক করবার মত জায়গা রেখেছেন বোস সাহেব। ব্যবস্থা তাঁর ভাল।

বাগানের লাল সুরকির রাস্তায় এসে দাঁড়াবার পরে রমাপদর আর একবার মনে হ'ল যে, কলকাতায় সত্যিই শীত এসেছে। ঘাম আর নেই।

উত্তর দিক থেকে হাওয়া আসছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। ফুলগাছগুলোর দিকে চেয়ে রমাপদ দেখল যে, উত্তরের হাওয়ায় ফুলের পাপড়িগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। বোস সাহেবের এই সুন্দর বাগানটার চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল রমাপদ। বাগানের তিনটে দিকই ওর চেনা ছিল। আজ সে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলো পেছনের দিকে। এসে সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

পেছন দিকের প্রাচীরের ও-পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঠের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে কতকগুলো বস্তি দেখা যায়। বিপিন বলল, "এরা সব থাকে ঐ বস্তিতে।"

পেছন দিকের খিড়কি খুলে বিপিন গতকালের খাবারগুলো সব বিতরণ করছিল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন স্ত্রীপুরুষ খিড়কির ও-পাশে এসে ভিড় জমিয়েছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। অত্যন্ত নিঃশব্দেই খাবারগুলো সব পরিবেশন ক'রে দিল বিপিন। রমাপদ কথা বলতে যাচ্ছিল। বিপিন তার একটা আঙুল ঠোঁট পর্যন্ত টেনে এনে বলল, "চুপ। ওদিকে চলুন, সাহেব টের পাবেন।"

বিপিন আর রমাপদ চ'লে এলো সামনের দিকে। একটু নিরাপদ জায়গায় এসে বিপিন বলল, "আমার কী যে মুশকিল হয়েছে বাবু—"

"কেন, মুশকিল কি?"

"পাঁচ-সাতজনকে খাওয়াতে পারি, কিন্তু প্রতিদিন সংখ্যা বাড়ছে। দু-দশ দিনের মধ্যে হয়তো খবরটা ছড়িয়ে পড়বে টালিগঞ্জের বস্তিতে। তখন কি যে হবে বুঝতে পারছি না। সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন নি? যান, তিনি শুয়ে আছেন, ঘুমোন নি।" বিপিন চ'লে যাচ্ছিল। রমাপদ বলল, "আর এক মিনিট দাঁড়াও। খাবারগুলো যে গরিব লোকেরা খাচ্ছে তা কি তোমার সাহেব পছন্দ করেন না?"

বিপিন একটু হাসল। তারপর সে বলল, "ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মনে মনে হয়তো তিনি জানেন যে, গরিব লোকেরাই খাচ্ছে। কিন্তু তিনি তা দেখতে চান না।"

"কেন?" বোস সাহেবের মনটাকে বোঝবার জন্যে রমাপদ উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। আজ বোধ হয় সে বোস সাহেবের সত্যিকার মনটাকে দেখতে পাবে।

বিপিন বলল, "সাহেবের বিশ্বাস, খাবারগুলো তিনিই খান। গরিব লোকেদের খাবার দিচ্ছি দেখলে বিশ্বাস তাঁর ভেঙে যাবে।"

বিপিন চ'লে গেল। রমাপদ যেতে পারল না। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার জন্যে একটা ডালিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল সে। হাত বুলতে লাগল ফুলের গায়ে, কিন্তু মনটা প'ড়ে রইল খিড়কির পেছনে। ফুলের রাজ্যে ঘুরল সে আরও কতক্ষণ। ঘুরতে ঘুরতে চ'লে এলো রাস্তার দিকের বড় ফটকটার সামনে। না, বোস সাহেবের মনের রহস্য সে বুঝতে পারল না।

বছর দশ বয়সের একটি ছেলে ফটকের ও-ধার দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। রমাপদ এদিকে আসতেই ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল।

"বাবু—"

নজর দিল না রমাপদ।

"বাবু—"

"কে তুই?"

"আমি পিণ্টু।"

"কোথায় থাকিস?"

এখান থেকে বেশি দূরে নয়।"

"কি চাস তুই?" রমাপ.. ক্রমে ক্রমে নরম হচ্ছে।

"পেছন দিকের দরজা দেখলুম বন্ধ। বাবু, খাওয়া কি শেষ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, প্রায় আধ ঘণ্টা আগে।"

রমাপদ ইনটারভিউ প্রায় এখানেই শেষ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু পারল না। পিণ্টু বলল, "ক'দিন আসতে পারি নি। অসুখ করেছিল।"

"কি অসুখ?"

"পেটের বাবু। হপ্তা খানেক আ.. খিড়কির ও-পাশে ব'সেই সবটা খেয়ে নিলুম। বাড়িতে গিয়ে অসুখ শুরু হ'ল। বস্তির লোকেরা বলল, খারাপ ব্যামো নয়, কলেরা।"

"অ্যাঁ? এ বাড়ির খাবার খেয়ে তোর কলেরা হ'ল?" রমাপদ সিগারেট খাচ্ছে আর গল্প করছে। ভেবেছিল, সিগারেট শেষ হয়ে গেলেই পিণ্টুর সঙ্গে গল্প করাও তার শেষ হবে। পিণ্টু বলল, "তোমাদের বাড়ির

খাবার তো খুব ভাল। কিন্তু আমাদের ঘি খেলে কলেরা হয়। ঘি কাকে বলে আমি আগে জানতুম না। কলেরা হওয়ার পরে, মা বলল যে, আমি বিষ খেয়েছি। ঘি আমাদের পেটে সয় না কি না। এবার আমি বিষ খেতে পারব বাবু। কিছু দাও না খেতে।"

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে, রমাপদ তবু দাঁড়িয়ে রইল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোর বাবা কি করেন?"

"চুরি।"

রমাপদ আঠার মত লেপ্টে দাঁড়াল গেটের সঙ্গে।

"কি চুরি করে তোর বাবা?"

"দেখি নি, শুনেছি টাকা চুরি করেছিল। কাল বাড়ি ফিরেছে।"

"কি নিয়ে এলো? টাকা?"

"না, শুধু হাতে এসেছে। জেল থেকে ফিরল। ন' বছর জেলে ছিল বাবা।"

"তোর বয়স কত, পিণ্টু?"

"দশ বছর বাবু। কালই তো বাবাকে প্রথম দেখলুম। মা বলে যে, বাবা নাকি অফিসে কাজ করত। বি. এ. পাস।"

গেটের ও-পাশে চলে গেল রমাপদ। খালি ব্যারাকের কথা আর ওর মনে রইল না। হিরোহিটো কে, তাও সে এখন ভুলে গেল। পিণ্টুর হাত ধ'রে জিজ্ঞাসা করল, "তোর বাবার নাম কি?"

নাম বলতে দেরি করতে লাগল পিণ্টু। রমাপদ বুঝল, ভয় পাচ্ছে ছেলেটা। ওকে খানিকটা অভয় দিয়ে রমাপদ বলল, "আমি পুলিসের লোক নই। নামটা বল্।"

"নাম আমি জানি না, বাবু। আজকে বাবার নামটা জানবার কথা আছে। কাল বস্তিতে ফিরে এসে বাবা সারা দিনরাত ঘুমিয়েছেন। বস্তির কেউ বাবার নাম জানে না। ন' বছর থেকে মা এখানে লুকিয়ে ছিলেন। মার কী লজ্জা! বাবু, হেঁসেলে আর খাবার নেই? এবার আমি ঘি হজম করতে পারব।"

রমাপদ এবার বোবা হয়ে গেল। পিণ্টু যেন ভয় পেয়ে দূরে স'রে যাচ্ছিল। বাবু অমন চোখ বুজে কি ভাবছেন?

"আমি চললুম, কাল আসব।"

"না না, পিণ্টু, দাঁড়া।"

পিণ্টু আবার এগিয়ে এলো রমাপদর কাছে। এসে সে বলল, "বুঝেছি, হেঁসেলে আর খাবার নেই। থাক্। আজকের দিনটা কোন রকম চলে যাবে।"

রমাপদ পকেট থেকে পার্স বার করল। পাঁচটা এক টাকার নোট বার ক'রে সে বলল, "লেখাপড়া শিখবি, পিণ্টু?"

আনন্দে পিণ্টুর শুকনো মুখ তাজা হয়ে উঠল। গলায় উল্লাসের সুর তুলে সে বলল, "আমি আমার নাম লিখতে পারি, বাবু। মার কাছে নাম সই করতে শিখেছি।"

"তা হ'লে কাল তুই আমার বাড়িতে আয়।" কার্ড বার ক'রে পিণ্টুর হাতে দিয়ে রমাপদ আবার বলল, "এতে আমার নাম ঠিকানা সব লেখা আছে। সকাল ন'টার মধ্যে চ'লে আসিস। পিণ্টু—"

"কি, বাবু?

"তোর বাবা চোর নন। তোর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসিস। এই পাঁচটা টাকা তোকে দিলুম।"

হাত তুলতে দ্বিধা করছিল পিণ্টু।

পিণ্টু মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে বলল, "একটা টাকা দিন, আজকের মত চ'লে যাবে। কাল তো আপনার কাছেই যাচ্ছি। বেশি টাকা সঙ্গে থাকলে বায়স্কোপ দেখতে ইচ্ছে করবে।"

রমাপদর গাম্ভীর্য আর রইল না। হেসে ফেললে সে। পিণ্টুর মধ্যে মধ্যবিত্তের মানসিকতার প্রমাণ পেল রমাপদ। জিজ্ঞাসা করল, "তুই বায়স্কোপ দেখিস নাকি?"

"পয়সা জোটাতে পারলে ভাত না খেয়েও বায়স্কোপে যাই। আর যাব না, বাবু। বায়স্কোপে যাওযাটা মাও পছন্দ করে না। বায়স্কোপের দু-একটা গানও গাইতে পারি, বাবু। 'মুক্তি' বই দেখেছি—"

"না, থাক্। গান গাইতে হবে না, পিণ্টু। কাল আসিস।"

"নমস্কার বাবু।" পিণ্টু গেল না।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"তোমার পকেটে ক'টা মনিব্যাগ ছিল ?"

কথা শুনে রমাপদ আর দেরি করল না। ট্রাউজারের পেছন পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "বড় মনিব্যাগটা নেই। ওটাতে আমার সব শ' টাকার নোট থাকে।"

"আমি ওটা তুলে নিয়েছি, বাবু।"

"কখন নিলি ?"

"তুমি যখন বুক পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার ক'রে টাকা গুনছিলে তখন। নাও—"

ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্টের ডান পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে রমাপদর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পিণ্টু বলল, "মনে হচ্ছে, ওতে অনেক টাকা আছে। না, বাবু ?"

"হ্যাঁ, চার শো টাকা। দশ টাকার নোটও কিছু থাকতে পারে। দু' ভরির একটা সোনার হারও ছিল এতে। ছোট্ট হার।"

"তা হ'লে তুমি সব দেখে নাও। যুদ্ধের বাজারে সবার পকেটেই বড় বড় নোট থাকে, না বাবু ?"

জবাব দিল না রমাপদ, কেবল একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বোস সাহেবের বাড়িটা সে দেখে নিল।

পিণ্টু জিজ্ঞাসা করল, "কাল তা হ'লে তোমার ঠিকানায় যাব কি, বাবু ?"

বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা রাখল না রমাপদ। সে জোর দিয়েই বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবি।"

লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে রমাপদ চ'লে এলো ভেতরে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ওর প্রতিদিনই প্রসারিত হচ্ছে। কোন কিছু সম্বন্ধেই যেন পাকা মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। কাকে চোর বলবে সে ? পিণ্টু, না, পিণ্টুর বাবাকে ? ধরা পড়লেও কি চোরকে চোর বলা যায় ?

সিঁড়ি দিয়ে রমাপদ উঠতে লাগল দোতলায়। হঠাৎ সে আবার ফিরে এলো তার পরিচিত জগতে। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক ক'মে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে অনেক। বেরিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কতটা কি থাকবে রমাপদ তা আন্দাজও করতে পারে না। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের সবটুকুই কেবল টাকা-পয়সার হিসেব নয়, খানিকটা রহস্যও আছে। রমাপদ কিছুই বুঝতে পারছে

না। বোস সাহেবকে পুরোপুরি না বুঝতে পারলে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের খানিকটা হযতো রহস্যেই আবৃত থাকবে। কোন লোকেরই আস্থা নেই বোস সাহেবের ওপর। আস্থা রাখবার জন্যে রমাপদকেও মনে মনে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

ঘরের বাইরে থেকে রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "আসতে পারি কি, সার্?"

"এসো, এসো, রমাপদ।"

"আপনি ঘুমচ্ছেন নাকি, সার্?" জিজ্ঞাসা করল রমাপদ। জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে চেয়ারটা টেনে নিযে বসল এসে জোড়া খাটের সামনে। গায়ের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে দিয়ে বোস সাহেব বিছানায় উঠে ব'সে বললেন, "ঘুম! এত শীতে আমার ঘুম আসে না, রমাপদ।"

রমাপদ দেখলে, বোস সাহেব কেবল লেপ গায়ে দেন নি। ওভারকোট গায়ে দিয়ে শুযে ছিলেন। ওভারকোটের তলায় একটা পুলওভারও পরেছেন তিনি। পুলওভারের তলায় কি আছে, রমাপদ তা দেখতে পেল না। গরম মোজা প'রেই তিনি শুযে ছিলেন। পায়েব চামড়া সুরক্ষিত। শীত ঢোকবার রাস্তা রাখেন নি তিনি। গলা ও ঘাড়ের চামড়ায়ই বা শীত ঢুকবে কি করে? মাফলার জড়ানো রযেছে। একটু হেসে রমাপদ বললে, "আপনি সার্, শীতকে বড্ড বেশি ভয করেন ’

"ভয়?" বোস সাহেব কাঁচুমাচু ভাবে হাজার বর্গফুটের ঘরখানার চার-দিকে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। শীতেঃ ভয়ে, না, দেয়ালগুলোর ভযে বোস সাহেব নিজেকে এমন ভাবে ঢেকে-ঢুকে রাখেন, রমাপদ তা বুঝতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করল, "আমায ডেকে পাঠিযেছেন, সার্?"

"হ্যাঁ। বারো শো টাকা তোমার পক্ষে খুবই কম মাইনে রমাপদ। আসছে মাস থেকে আমি পনরো শো ক'রে দিতে চাই।" বললেন বোস সাহেব।

স্প্রিং লাগানো পুতুলের মত ঝপ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল রমাপদ। পুতুল ব'লেই বোধ হয় মুখের রঙ ওর এক নিমেষে কালো হয়ে উঠল না। রমাপদ তবু লজ্জা পেল। মাস্টারের ছেলে ব'লেই সে মনে মনে বললে মা বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও। কিন্তু দ্বিধা হবে কি ক'রে? বসুন্ধরার অঙ্গে আর ভাগীরথীর নরম মাটি নেই, সব সিমেণ্ট।

রমাপদ বোস সাহেবকে বলল, "আমায় ক্ষমা করবেন সার্, বারো শো টাকার ওপরে আমি আর একটি পয়সাও নিতে পারব না।"

"কেন ?"

"বাবা রাগ করবেন।"

"কার বাবা রাগ করবেন, রমাপদ ? তোমার, না, লতিকার ?"

জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না ব'লেই রমাপদ চুপ ক'রে ব'সে রইল। আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে একটু পরে বোস সাহেব বললেন, "তাঁর মুখ আমি রক্ষা করেছি।"

"কার মুখ ?" জানতে চাইল রমাপদ।

"আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের।" আয়নাটা ওভারকোটের ওপর ঘষতে ঘষতে তিনি পুনরায় বললেন, "তাঁর কথা আমি রেখেছি, রমাপদ।"

"কোন্ কথাটা, সার্ ?"

"বাঙালী ব্যবসা করে না ব'লে সারাটা জীবন তিনি আমাদের দরজায় দরজায় মাথা কুটে মরেছেন। এখন ? এখন কি হ'ল ?"

"কি হ'ল, সার্ ?"

"এখন হাজার টাকার ওপর মাইনে দিলে তোমার বাবা রাগ করেন। আচার্য যদি আমার এখানে আজ উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে কি হ'ত ?"

তোশকের তলা থেকে বোস সাহেব পোস্টকার্ড আকারের একখানা ছবি বার করলেন। সামনের দিকে মুখটা এগিয়ে দিয়ে রমাপদ দেখল, ছবিখানা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। পুরনো ছবি। তোশকের তলায় প'ড়ে থেকে থেকে ছবিখানা প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এ ছবি দেখে আচার্যকে কেউ চিনতে পারবে ব'লে বিশ্বাস হ'ল না রমাপদর।

বোস সাহেব ছবিখানার দিকে চেয়ে বললেন, "প্রথম জীবনে ব্যাঙ্ক যখন শুরু করি, তখন ক্যানিং স্ট্রীটে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলুম মাসিক ত্রিশ টাকায়। ঘরের আয়তন ছিল আশী বর্গফুট। পাঁচ বছর পর্যন্ত কেউ আশীটা টাকাও বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে রাখে নি। ফড়েপুকুর থেকে প্রতিদিন হেঁটে আসতুম ক্যানিং স্ট্রীটে ব্যাঙ্কের দরজা খুলতে। সন্ধ্যের পরে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে পায়ে হেঁটে ফড়েপুকুরে ফিরে যেতে প্রায় রাত আটটা বাজত। রমাপদ—"

"সার্।"—রমাপদ একটু এগিয়ে বসল বোস সাহেবের কাছে।

"পায়ে কারও ফোস্কা পড়তে দেখেছ ?"

"দেখেছি।" জবাব দিল রমাপদ।

"কত বড় ফোস্কা ?

"তা প্রায় তিন ইঞ্চি হবে।"

"ফুঃ! বিপিনের মাকে জিজ্ঞেস কর, প্রতি রাত্রে সে নারকেল তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আমার পায়ের গোড়ালি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ঢেকে রাখত। ওরে বাবা, কি লম্বা লম্বা ফোস্কাই না সেগুলো ছিল! দু পায়ের দশটি আঙুল আজেরবাইজানের আঙুরের মত রসের ভারে টুপ টুপ করত।"—এই পর্যন্ত ব'লে বোস সাহেব গরম মোজার ওপর হাত বুলতে বুলতে আবার কথা শুরু করলেন, "রমাপদ, প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। অকৃতজ্ঞ দেশকে বাধ্য করেছি প্রতিটি ফোস্কার দাম দিতে। গোটা আজেরবাইজান আমি কিনে ফেলতে পারি। তা অবশ্যি আমি কিনব না। কারণ, সুইট্জারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে দশ লাখ সরিয়ে রেখেছি। তেমন যদি কোনদিন বিপদ আসে, তা হ'লে চোখ দেখাতে যাচ্ছি ব'লে হুট ক'রে স'রে পড়ব। রমাপদ—"

"বলুন, সার্।"

"আশী বর্গফুটের লজ্জা আমার কেটেছে বটে, কিন্তু যৌবনের তাজা বছরগুলো আমি আর ফিরে পেলুম না। নারকেল তেল আর চোখের জলের মধ্যে যে তফাত আছে, সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, রমাপদ। অকৃতজ্ঞ দেশ ভুলতে আমায় বাধ্য করেছিল। কিন্তু আজ যদি আচার্য বেঁচে থাকতেন!"

"বাঙালী ব্যবসা করে ব'লে তিনি বোধ হয় লজ্জাই পেতেন, মিস্টার বোস।"—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মাখন গুপ্ত।

"আসুন, আসুন গুপ্ত মশাই। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চুরি ক'রে আমাদের কথা শুনছিলেন বুঝি ?"—জিজ্ঞাসা করলেন বোস সাহেব।

চেয়ারে ব'সে মাখন গুপ্ত বললেন, "এই যে রমাপদ, কখন এলে ? গাড়িখানা শুনলুম ভাল চলছে না ? গ্যালনে ক' মাইল যায় ? বাবাকে চাপিয়ে দু-দশ মাইল ঘুরিয়ে এনেছ তো ?"

"না। তিনি চাপতে ভয় পান।"—জবাব দিল রমাপদ।

"কেন? কেন? বোস সাহেব কি ওকে ভাঙা গাড়ি দিলেন নাকি? তা ছাড়া তুমি তো প্রতিদিন ব্যাঙ্ক থেকে দু গ্যালন ক'রে তেল পাচ্ছ, ভয়ের কি কারণ আছে?"

"বোধ হয় ব্যাঙ্কের গাড়ি ব'লে ভয় পান।"

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন মাখন গুপ্ত। এই বয়সেও তিনি যে এতটা হাসতে পারেন সেইটেই বাঙালী স্বাস্থ্যের বড় সার্টিফিকেট। ইচ্ছে ক'রেই মাখনবাবু হাসির রেশটাকে টেনে রাখলেন। এই অবসরে বোস সাহেব তাঁর আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখে নিলেন। হাসি থামবার পরে মাখন গুপ্ত বললেন, "শশধরবাবু হচ্ছেন গিয়ে জাতমাস্টার। মাগনা মদ বামুন পর্যন্ত খায়, কিন্তু মাস্টার শশধর সেন খায় না।"

আয়নায় মুখ দেখা শেষ ক'রে বোস সাহেব বললেন, মাস্টারদের নিয়ে টানাটানি ক'রে লাভ নেই। সদাশিব রায়ের কি হ'ল, গুপ্ত মশাই? কেবল লাখ তিন নিয়ে এসে থেমে গেলেন যে? বাঙালী যদি বাঙালীকে সাহায্য না করে, তবে বড়বাজারকে দোষ দিয়ে লাভ কি?"

মাখনবাবু বললেন, "তিন লাখ টাকা তো কম নয়, মিস্টার বোস?"

হাসতে হাসতে বোস সাহেব বললেন, "আরে মশাই, তিন লাখ তো সদাশিব রায়ের ভুঁড়ির ওপর সর্বক্ষণ হামাগুড়ি দিচ্ছে। লোকটা দুগ্ধজাত স্নেহদ্রব্য ছাড়া আর কিছু খায় না। চালায় তেলের কল, অথচ দেহের কোথাও এক বিন্দু তেল নেই, সবই মহাতৈল। লোকটার আশ্চর্য রকম সংযম আছে, মশাই। শুনতে পাই, হপ্তায় পাঁচ দিন ক'রে সদাশিববাবু দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়ে গিয়ে সময় কাটায়।"

"লতুকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, আমি শেষ পর্যন্ত যেতে দিই নি। লতুর বিয়েতে একটা পয়সা দেবে না, অথচ বেলুড়ের জন্যে পাঁচ লাখ ইম্পিরিয়েলে সরিয়ে রেখেছে।"

"বলেন কি, মাখনবাবু? পাঁচ লাখের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত টেনে আনুন। আমার এখানে ফিক্সড ডিপোজিট করিয়ে দিন। বেলুড় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, যুদ্ধের পরে দিলেও তো চলবে।" শীতের সকালেও বোস সাহেবের চোখ দুটো বাজপাখির চোখের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। ঠেলা দিয়ে

আয়নাটাকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে তিনিই আবার বললেন, "আমার বড় গাড়িটা না হয় এখন দিন কতক আপনার কাছে রাখুন। দরকার হয় গাড়ি নিয়ে তার পিছু পিছু দক্ষিণেশ্বরে আপনিও যাওয়া-আসা করুন। লেগে থাকলে ফল আপনি পাবেন, গুপ্ত মশাই। এখন তার দেবার সময় এসেছে।··· প্রায় বিশ বছর আগে সদাশিব রায় আমায় পঞ্চাশটা টাকাও দিতে চায় নি। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের আয়তন তখন আশী বর্গফুট। এক দিকে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র কাঁদছেন, অন্য দিকে বিপিনের মা আমার পায়ের ফোস্কায় নারকেল তেল ঢালছে। সেই অবস্থায় অ্যাকাউণ্ট খোলবার ফর্ম্ নিয়ে গেলুম সদাশিব রায়ের গদিতে। পকেট থেকে ফর্ম্‌টা কিছুতেই বার করতে পারছিলুম না। লজ্জায় ফোস্কা সব গ'লে যাচ্ছে। কিছু না ব'লে তখন পালাতে পারলে বাঁচি। দাঁড়িপাল্লায় সরষের ওজন দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

"বললুম, 'বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের আমি একজন কর্মচারী।' ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বলতে পারলুম না। গলা শুকিয়ে এসেছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি দেখে, সদাশিব দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

"বললুম, 'পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে আমাদের ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলুন। ব্যাঙ্ক যদি ফেল হয়ে যায় তাতেও আপনার খুব কিছু লোকসান হবে না, মাত্র পঞ্চাশটা টাকা। কিন্তু যদি দাঁড়ায়, তবে বাঙালীর একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে। বাঙালী যুবকদের অন্নসংস্থানের একটা সুযোগ হবে। বিশ্বাস আমাকে করবার দরকার নেই, পঞ্চাশটা টাকা আপনার কাছে টাকাই নয়। মনে করুন, পঞ্চাশটা টাকা আপনি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, আমি উপোসী কুকুরের মত টাকাগুলো সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে নিলাম।' কথা শুনে সদাশিব রায় এক ধামা সরষে আমার মাথার ওপর ঢেলে দিল!

"সেদিন আশী বর্গফুটের শূন্য আয়তনের মধ্যে ফিরে গিয়ে বার বার ক'রে মনে হয়েছিল যে, সরষেগুলোর মধ্যে কেবল লাভই ছিল না, বাঙালীজাতির সব চেয়ে বড় লোকসানও ছিল।···গুপ্ত মশাই, লেগে থাকুন, আরও পাঁচ লাখ তুলে নিয়ে আসতে পারবেন। বেলুড়ের মাটিতে পাঁচ লাখের বৃদ্ধি কোন-দিনও হবে না, কিন্তু এক বছর পরে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে পাঁচ লাখই সাড়ে পাঁচে দাঁড়াবে।"

মাখন গুপ্ত প্রেরণা পেলেন বোস সাহেবের যুক্তিতে। লতুকে যেতে না দিয়ে তিনি ভালই করেছেন। বাড়িতে ব'সে রমাপদর জন্যে ভাল ভাল রান্না তৈরি করলে লতুর বোধ হয় সত্যিকারের পুণ্যলাভ হবে।

মাখন গুপ্ত উঠলেন। বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন কথা আছে নাকি?"

"না, রবিবার ব'লে আপনাকে দেখতে এসেছিলুম।...বোস সাহেব, হিরোহিটোর পা টলমল।...ও, ভাল কথা মনে পড়েছে। রমাপদর মাইনে বাড়ছে কবে?"

"বাড়াতে চেয়েছিলুম, কিন্তু রমাপদ বারো শো টাকার ওপরে মাইনে নিতে ভয় পায়।"—বললেন বোস সাহেব। কথা শুনে মাখন গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে রমাপদর দিকে এমন ভাবে দৃষ্টি দিলেন যে, তেমন দৃষ্টির বর্ণনা সাহিত্যের বইতে পর্যন্ত পাওয়া যায় না। রমাপদ ঘাবড়ে গিয়ে বলতে লাগল, "বাবা বড্ড ভয় পাচ্ছেন কিনা, তাই। বারো শো টাকা মাইনে হওয়ার পর বাবার তো ক্রমশই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে।"

এরই মধ্যে বোস সাহেব লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন। এখন মাত্র সাতটা। আরও ঘণ্টা দুই শুয়ে থাকলেও ছতলা ব্যাঙ্কের একটা তলাও ফেল পড়বে না। হিটলারকে সাম্রাজ্যবাদী ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে বাঙালী ছোকরা-গুলো। তা দিক, বারোতলার জন্যে বোস সাহেব আর লোভ করবেন না। হিটলার যা দয়া ক'রে দিয়েছে সেইটুকুই এখন ধ'রে রাখতে পারলে ভাল। বাঙালী সদাশিব রায় তো পঞ্চাশ টাকাও দেয় নি। অতএব, শীতকাতুরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার লেপটা নাকের তলা অবধি টেনে দিয়ে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সুইট্জারল্যাণ্ডের শীতে যে তিনি কি ক'রে বাস করবেন সে কথা ভাবতে ভাবতে লেপটা তিনি মাথা পর্যন্ত টেনে দিলেন। বড্ড আরাম লাগছে লেপের তলায়। সদাশিব রায়ের ধামা ধামা টাকা সরষের মত ঝ'রে পড়ছে ব্যাঙ্কের মাথায়। বোস সাহেবের নিজের মাথার ওপর আজ ছতলা বাড়ি।

মাখন গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "বোস সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?"

"না, একটু আরাম করছি।"

"রমাপদর সঙ্গে বোধ হয় এখনো কাজের কথা হয় নি?"

লেপের তলা থেকে মুখ বার ক'রে বোস সাহেব বললেন, "আপনি বরং

বাগানটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখুন। তারপর রমাপদর গাড়িতেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। কাল ব্যাঙ্কে আসছেন তো, গুপ্ত মশাই? যাওয়া-আসা বড্ড কমিয়ে দিয়েছেন।"

"যাব, যাব—"

মাখনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লেপটাকে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন নাকি? নেমে যাওয়ার শব্দ পেলুম না তো? একবার একটু দেখে এসো তো, রমাপদ।"

"নীচে নেমে যাওয়ার শব্দ আমি পেয়েছি, সার্।"

"ও, তা হ'লে আমি বোধ হয় কানে কম শুনছি। বয়স বাড়ছে আমার। তোমার কত হ'ল রমাপদ?"

"পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে পড়লুম।"

"কত?"

রমাপদ আগের কথাটা আবার বলল। গম্ভীর হয়ে গেলেন বোস সাহেব। রমাপদ সব কিছু লক্ষ্য করছে। হিসেব-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ওর অনেক। খুঁটিনাটি কোন কিছুই ওর নজর থেকে ফসকে যেতে পারছে না।

রমাপদ সতর্ক এবং সজাগ।

বোস সাহেব বললেন, পঁচিশ বছর বয়সেই আমি কলকাতা এলুম।"

"কোথা থেকে এলেন, সার্?"

"বিক্রমপুর থেকে। গাঁয়ের নাম ছিল রাজবাড়ি। এখন আর গ্রামটা নেই।

"কোথায় গেল?"

"পদ্মার গর্ভে।" চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বোস সাহেব।

আলোচনাটা এবার অন্য দিকে ঘোরাবার জন্যে রমাপদ বলল, "ব্যাঙ্ক থেকে অনেকেই টাকা তুলে নিচ্ছে।"

"নিক।" বোস সাহেব খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসলেন। তিনি এখানে নেই। বোধ হয় পদ্মার ধারে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রমাপদ তাঁকে রিজেণ্ট পার্কে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল, "সবাই টাকা তুলে নিলে, আমরা তো ডুবব।"

আমি তো ডুবেই আছি রমাপদ।…ভাসছি। বিশ বছর ধ'রে ভেসে রয়েছি। ডাঙায় আমি উঠতে পারি নি। পদ্মার ভাঙন দেখেছ তুমি?"

"না, সার্। দেশ আমাদেরও বিক্রমপুরে। কিন্তু দেশে কখনও যাই নি। ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র সব গুছিয়ে রাখবার সময় হয়েছে। যুদ্ধ বোধ হয় আর বেশিদিন চলবে না।"

"যুদ্ধ চলবে, রমাপদ। দ্বিতীয় থামলে, তৃতীয় শুরু হবে। যুদ্ধ করতে আমি ভয় পাই না।"

"সবাই যদি টাকা তুলে নেয়, তা হ'লে ব্যাঙ্ক চালাব কি দিয়ে?"

"সদাশিব রায়ের টাকা দিয়ে।"

"যতদূর বুঝতে পেরেছি—" রমাপদ উঠল, "তিনি আর এক আধলাও দেবেন না।"

"দেবেন, দেবেন। তুমি উঠছ কেন?"

"মাখনবাবু অপেক্ষা করছেন।"

"গাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি, সন্ধ্যে পর্যন্তও মাখন গুপ্ত অপেক্ষা করতে রাজী হবেন। মাখন গুপ্তকে আমি চিনি বিশ বছর আগে থেকে। আমাদের একই গাঁয়ে বাড়ি। গাঁয়ের নাম রাজবাড়ি। তুমি দাঁড়িয়েই রইলে?"

রমাপদ বসল।

বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "বিয়ে করছ কবে?"

"যুদ্ধের পরে।"

"সেই ভাল। যুদ্ধ থেমে গেলে মাখনবাবু তোমায় কলা দেখাবেন। তোমার সঙ্গে লতিকার বিয়ে দেবেন না তিনি।"

"সেই জন্যেই যুদ্ধের পরে বিয়ে করব ব'লে মনস্থির ক'রে ফেলেছি।"

"চেয়ারটা একটু আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে ব'স।"

বোস সাহেবের হুকুম পালন করতে রমাপদ দেরি করল না। বোস সাহেব নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে বিয়ে করবে?"

রমাপদ ভাবল, বোস সাহেব অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লেন। সেই জন্যে সে জবাব দিল, "লতিকার সঙ্গে না হ'লে, অন্য কাউকে।"

এই সময় বাইরে থেকে মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি এখন যাবে,

রমাপদ ? বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমায় একবার কসবা যেতে হবে। সন্থুকে অনেক দিন দেখি নি।"

রমাপদ বলল, "আমি যাই, সার্। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে পরে কথা হবে।"

হ্যাঁ, বেশ, যাও তা হ'লে।"

"আমায় ডেকেছিলেন কেন, সার্ ?"

"তোমার বিয়ের ব্যাপারটা জানবার জন্যে। আমি জেনে নিলুম।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কি কথা হ'ল ? ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ?"

"কথা হ'ল অনেক, কিন্তু ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নয়। আমার বিয়ে হচ্ছে কবে, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।"

"কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তিনি জানতে চাইলেন না ?"

"না।"

খুবই আশ্চর্য ধরনের লোক এই তোমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—" লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাখন গুপ্ত আবার বললেন, "গায়ে কতগুলো গরম জামা পরেছেন, দেখেছ ? মনে হয় কি যেন তিনি ঢেকে ঢুকে রেখেছেন।"

"সিক্রেট হয়তো তাঁর দু-একটা থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, বোস সাহেব বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ধারে-কাছেও বাস করেন না। তিনি এখানে নেই।"

মৃদু হেসে মাখন গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় আছেন তিনি ?"

"পদ্মার পারে কোথাও হবে।"

"সেখানে তিনি কি করছেন, রমাপদ ?"

"ভাসছেন—আজো তিনি ডাঙায় ওঠেন নি।"

"খুব ভাল ব্যাঙ্ক তোমাদের হে রমাপদ। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ভাসছেন আর তাঁর প্রধান হিসেব-রক্ষকও ভাসবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করছে। তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে চ'লে এসো, রমাপদ। ও ব্যাঙ্ক থাকবে না, থাকতে পারে না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কটাকে আমরা তো খুবই বড় মনে করি। উঁচুও কম নয়, ছতলা উঠেছে। বোস সাহেবের চোখে

কিন্তু ব্যাঙ্কের উচ্চতা একতলাও নয়। তাঁর মনে ব্যাঙ্কের চেয়েও বড় জিনিস আছে।"

"সেটা কি?"

"বোধ হয় ব্যর্থতা—একটা ইংরেজী কথা ব্যবহার করলে ভাল ক'রে বোঝাতে পারতুম।"

"তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, এক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে এসো। বাবা রমাপদ, তুমি যে বিপদে পড়বে!"

রমাপদর পাশেই বসলেন মাখন গুপ্ত। বাঁ দিকের লাল সুরকির রাস্তা ধ'রে রমাপদ গাড়ি চালাতে লাগল। ফটকের বাইরে এসে হঠাৎ সে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল। দিয়ে বলল, "আপনি একটু বসুন। আমি আসছি।"

একটু দূরেই একটা একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপরে ব'সে ছিল পিণ্টু। গায়ের সেই ছেঁড়া গেঞ্জিটা ওর আরও বেশি ছিঁড়ে গেছে। রমাপদ দেখল, গেঞ্জিটা এখন ঘাড়ের এক দিকে বিপর্যস্ত পতাকার মত ঝুলছে। পরাজয়ের প্রমাণ তাতে রয়েছে, বুঝতে পারল রমাপদ। পিণ্টুর মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। কপালের ওপরেও ক্ষতের চিহ্ন স্পষ্ট। পিণ্টুর চোখে জল।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে রে?"

"খান ইট দিয়ে ওরা আমার মাথায় ঠুকে দিয়েছে।"

"ওরা কারা?"

"যারা তোমাদের বাড়ির খিড়কির পেছনে ব'সে রোজ রোজ পোলাও মাংস খায়। আমাদের বস্তির লোক। মনিব্যাগটা তোমায় যখন ফিরিয়ে দিচ্ছিলুম, ওরা তখন দূর থেকে দেখছিল। আমরা সব একদলেরই লোক কি না।"

পিণ্টুর কথা শুনে রমাপদ এবার কেবল মুখ ঘুরিয়ে বোস সাহেবের বাড়িটাই দেখল না, মাখন গুপ্তকেও দেখল। সে জিজ্ঞাসা করল, "ধারে কাছে কোথাও ডাক্তারখানা নেই?"

"আছে বাবু, ঐ মোড়টায়। রোদ লাগলে রক্ত সব শুকিয়ে যাবে। ভয় নেই।"

"আমার সঙ্গে চল্ পিণ্টু।"

মোড়ের দিকেই গাড়ি চালাচ্ছিল রমাপদ। মাখনবাবু দু-তিনবার ঘাড়

ফিরিয়ে পিণ্টুকে দেখলেন। পেছনের সিটে পিণ্টু হেলান দিয়ে ব'সে ছিল। মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কে ?"

"পিণ্টু।"

"পিণ্টু কে ?"

"আমাদের আত্মীয়।"

"কই, আগে তো কখনো দেখি নি ?"

"আমরা এতদিন চোখ বুজে ছিলুম, তাই দেখতে পাই নি।" রমাপদর কথাটা তবুও মাখনবাবুর বিশ্বাস হ'ল না। একটু বাদেই তিনি আবার বললেন, "বস্তি সমাজের মধ্যে কেউ ভিখারি আছে ব'লে আমি শুনি নি, রমাপদ।"

ডাক্তারখানার সামনে এসে গাড়ি থেকে নামতে নামতে রমাপদ বলল, "ওরা মধ্যবিত্ত, আমরাও। আয় পিণ্টু।"

মাখনবাবু গাড়িতে ব'সে রইলেন। ব'সে রইলেন আধ ঘণ্টার ওপরে। মাঝে মাঝে বিরক্ত বোধ করছিলেন তিনি। ভাবছিলেন, রমাপদর নিশ্চয়ই নার্ভ খুব দুর্বল। দু-চার ফোঁটা রক্ত দেখে যে এত বেশি দয়াপরবশ হয়ে ওঠে সে তো কোনদিনও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার তো বালতি বালতি রক্ত পান করছেন,—তাঁর হিসেব-রক্ষকের তবে দু-চার ফোঁটা রক্ত দেখলে ভয় আসে কেন ?

গড়িয়া পৌঁছবার বাসে পিণ্টুকে তুলে দিল রমাপদ। গাড়িতে এসে পৌঁছবার পরে মাখনবাবু বললেন, "পিণ্টুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে মনে হয়, সে বুঝি ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছে। রমাপদ—"

"আজ্ঞে।" গাড়ি তখন চলছে।

"ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হ'ল ?"

"হ'ল।"

"ওষুধপত্তরের স্টক কেমন দেখলে ?"

"আলমারি দুটোর প্রত্যেকটা তাকেই ওষুধ আছে। তবে বেশির ভাগ ওষুধই দেখলুম কলকাতার কারখানায় তৈরি। বিলিতী ওষুধ তো আজকাল তেমন পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কলুটোলা থেকে আমি এনে দিতে পারি। ডাক্তারের কি কি দরকার, একবার জিজ্ঞাসা করলে পারতে।"

রমাপদ টালিগঞ্জের পোলের তলা দিয়ে সাদার্ন এ্যাভিনুর দিকে গাড়ি ঘোরাল। মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার কি অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করলেন? অ্যাসিডাম কারবলিকাম আজকাল আর চলে না।"

গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিয়ে রমাপদ জানতে চাইল, "ওটা কি?"

"কারবলিক অ্যাসিড। আঠারো শো সত্তর খ্রীষ্টাব্দে লিস্টার সাহেব পুরনো নিয়ম সব বদলে দিলেন। অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে তিনি কারবলিক-অ্যাসিড ব্যবহার করতে লাগলেন। আজকাল আবার তাও নেই। রমাপদ—"

"আজ্ঞে।"

"অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে মাইক্রোবগুলোকে কিন্তু মারা যায় না। বীজাণু মারবার ক্ষমতা নেই এর। তবে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি?"

"কি উদ্দেশ্য?"

"বীজাণুগুলোকে নিস্তেজ ক'রে রাখবার জন্যে। ওরা বাড়তে পারে না। ডাক্তারটিকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে এলে হয়, তাঁরা কি কি দরকার। কলুটোলায় এখনো অনেক স্টক আছে।"

কেয়াতলা লেনের আগেই বাঁ দিকের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল রমাপদ। জাহাজ-মার্কা বড় বাড়িটার দিকে চেয়ে মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কে? তোমার বাবা যাচ্ছেন না?"

গাড়ির স্টিয়ারিং ধ'রেই রমাপদ ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিকটা দেখে নিয়ে জবাব দিল, হ্যাঁ, বাবা।"

"এই সময়ে কোথায় গিয়েছিলেন তিনি?"

"ছাত্র পড়াতে। রবিবারে সকালের দিকেই যান। আমার বারো শো টাকা মাইনে হওয়ার পরে বাবা হঠাৎ ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করেছেন। বেশী দূরে যেতে হয় না। সাদার্ন এ্যাভিনু আর রসা রোডের মোড়ে বড়লোক একজন মারোয়াড়ীর ছেলেকে পড়ান। মাসে দেড় শো ক'রে পাচ্ছেন।" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমাপদ গাড়িটা এনে দাঁড় করিয়ে দিল মাখন গুপ্তের বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে মাখনবাবু বললেন, "কোটিপতির ছেলেগুলো যদি তোমার বাবার কাছে লেখাপড়া শেখে তো ভালই। দেড় শো বছরের জমানো টাকা খরচ করবার শিক্ষা না পেলে সমাজে একদিন বিপ্লব আসবে।"

"তা ঠিক। বাবা বলেন, টাকা যদি মৃতদেহের মত ব্যাঙ্কের শ্মশানে পড়ে থাকে, তা হ'লে রাষ্ট্র কিংবা সমাজের কোন কল্যাণ হয় না। ঘাসের চাপড়া যদি মাটি থেকে আলগা হয়ে যায়, তা হলে ভাগীরথীর জল দিয়েও তা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সমাজ-কল্যাণের মধ্যেই টাকার ধর্ম নিহিত আছে।"

লোহার গেটের তালা খুলতেই লতিকা এসে দাঁড়াল সামনে। চাকর-বাকরেরা আজও পেছন দিকের দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা করে। মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "লতু, অবনী দালাল এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কোন খবর এনেছে না কি?"

"সব জিনিসেরই দাম প'ড়ে যাচ্ছে। হরিহর গাঙ্গুলীর নাত বউ নাকি এরিই মধ্যে অনেক টাকা লোকসান দিয়েছে।"

"তা দিক। এসো, রমাপদ।"

রবিবার ব'লেই মাধুরী ছেঁড়া কাপড় সব সেলাই করছিল। সেলাই ক'রে উঠতে পারলে শাড়িগুলোকে ব্যবহার করা চলবে। বাড়িতে পরবার মত শাড়ি এগুলো। দুখানা শাড়ি সেলাই শেষ ক'রে মাধুরী তার ট্রাঙ্ক থেকে আরও একখানা শাড়ি বার করবে ব'লে উঠল। সেটা সে ধুয়ে তুলে রেখেছিল। ধোয়ার সময় বালতির কোণায় লেগে আঁচলের দিকে একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল সেদিন। সেদিন মানে, প্রায় দু বছরই হবে। শশধরবাবু আর সুধাময়ী দেবী যেদিন ওকে প্রথম দেখতে এসেছিলেন সেদিন এই শাড়িটাই পরেছিল মাধুরী।

ট্রাঙ্কের ডালাটা তুলে কাপড়টা খুজতে লাগল মাধুরী। টিনের ট্রাঙ্ক, একটু হাত লাগলেই কেমন জোরে জোরে আওয়াজ করতে থাকে। খালি পাত্রের আওয়াজ তো বেশি হবেই। একদিন এটা ভরাই ছিল। বিয়ের সময় মাকে এই ট্রাঙ্কটা মামা কিনে দিয়েছিলেন। মার কাছেই মাধুরী শুনেছে যে, ট্রাঙ্কটা কিনতে মামা ঢাকা শহরে গিয়েছিলেন। ছুটি নিতে হয়েছিল মামাকে। রাজবাড়ি থেকে ঢাকা শহর তো কম দূর ছিল না। দুটো না তিনটে নদী পার হতে হয়। পূর্ববঙ্গের নদীগুলো যেমন বড় তেমন গর্জনশীল। বর্ষার

সময়ে এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। পদ্মা নদীর কথা উঠলে মা আজও চোখে কাপড় দেন। কী সাংঘাতিক নদী! বিক্রমপুরের গ্রামগুলোকে গিলে খাচ্ছে। পদ্মার স্রোতের মধ্যে মানুষ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হ'লে স্রোতের টানে মানুষ নাকি চ'লে যায় পাঁচ দশ ক্রোশ দূরে। মার কাছেই মাধুরী শুনেছে যে, রাজবাড়ির কাছেই স্রোতের টান সব চেয়ে বেশি। আজ আর সেই রাজবাড়ি নেই, হয়তো স্রোতের টানও গেছে ক'মে। কিন্তু মায়ের মন থেকে সর্বগ্রাসী পদ্মার ছবি আজও মুছে যায় নি। কলকাতা কিংবা কসবার গলিতে মাধুরী কোনদিনও পদ্মার মত নদী দেখতে পাবে না। স্রোতের টান যে কী ভীষণ ভাবে দুর্মদ হয়ে উঠতে পারে তার ইতিহাস মাধুরীর কাছে চিরদিনই অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

সেই শাড়িখানা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল মাধুরী। ট্রাঙ্কের তলায় প'ড়ে ছিল শাড়িখানা। মাধুরী ইচ্ছে ক'রেই রেখেছিল ওখানে। মা যেন দেখতে না পান সেই জন্যে ওকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। শাড়ির ভাঁজে টাকা লুকিয়ে রেখেছে মাধুরী। নিজের মাইনের টাকা থেকে দু-পাঁচটা টাকা সে এখানে লুকিয়ে রাখত। শাড়ির ভাঁজটা খুলতে গিয়ে মাধুরী আজ দেখল, টাকার অঙ্ক বেশ মোটা হয়ে উঠেছে। মামা কিংবা রাজমোহনের তুলনায় কিছুই না বটে, কিন্তু মাধুরীর পক্ষে টাকার অঙ্কটা কম নয়।

গুনতে বসল মাধুরী। দু আনা চার আনা, এক টাকা, পাঁচ টাকা এবং দশ টাকার নোট মিলিয়ে তিন শো পঁচানব্বই টাকা আট আনা হ'ল। দীর্ঘ দিনের সঞ্চয় এটা। এতে কেবল ওর মাইনের উদ্বৃত্তই নেই, টিফিন খাওয়ার পয়সাও আছে। ইস্কুল-কলেজে পড়বার সময় দু-চার আনা যা পয়সা পেত তা থেকেও পয়সা বাঁচিয়েছে মাধুরী।

শাড়িখানা যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই মাধুরী আবার রেখে দিল ট্রাঙ্কের তলায়। সেলাই করবার দরকার নেই। একদিন যদি শাড়িখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়েও যায়, তাতেও স্মৃতির মর্যাদা বিক্ষত হবে না—ম্লান হবে না মুহূর্তের জন্যেও। সুধাময়ী ও শশধরবাবুর সামনে যেদিন সে এই শাড়িটা প'রে এসে বসেছিল, সেদিনটা ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে উহ্য হয়ে গেছে সত্যি; কিন্তু সেদিনকার স্বপ্ন থেকে এই শাড়িটা কোনদিনও বাদ পড়বে না। মাধুরী কোনদিনও স্বপ্ন দেখত না। কসবার এই সরু গলিটায়

ব'সে স্বপ্ন দেখতে ভয় পেয়েছে মাধুরী। কিন্তু যেদিন সে স্বপ্ন দেখল, গলিটা আর সেদিন সরু রইল না। বিস্তৃত হ'ল এর পরিসর। বিরাট বিস্তৃতি। রমাপদ না থাক্, পরিসরটাকে সে আর ক্ষয় হতে দেবে না। ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করল মাধুরী।

পেছনে এসে সৌদামিনী দেবী দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাধুরী যত বেশি সহজ এবং সরল হচ্ছে সৌদামিনী দেবীর ভাবনা বাড়ছে তত বেশি। পরেশবাবুর কাছে মাধুরী আর পড়তে যায় না কেন? পরেশবাবুর কাছেও মেয়েটা ঠকল নাকি? এসব কথা ভেবে আর লাভ নেই। কপালে দুঃখ থাকলে কেউ ঠেকাতে পারবে না। নিজের জীবনে তিনিও কোন কিছু ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। পদ্মার গর্জন তিনি আজও মাঝে মাঝে শুনতে পান বটে, কিন্তু কোন কিছু পাওয়ার প্রশ্ন আর তাতে নেই। পদ্মার স্রোতে তিনিও ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঝাঁপ দিতে এক মুহূর্ত লাগত। পায়ের দু-ইঞ্চি নীচেই ছিল জল। মাথার ওপরে আকাশ কালো হয়ে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মিনিটে মিনিটে, কালবৈশাখী পৌঁছে গেল পদ্মার বুকে। গোটা রাজবাড়িটাই যেন ভেঙে গ'লে চ'লে যাচ্ছে জলের দিকে, সৌদামিনী দেবী দেখলেন, তখনও তাঁর পায়ের দু ইঞ্চি নীচে জল। দুটো পা-ই আলতায় রাঙা। পরনে বিয়ের শাড়ি। তিনি ঝাঁপ দিতে পারলেন না। মুহূর্তটা বিলম্বিত হতে লাগল। ভাবতে লাগলেন তিনি, কি করবেন? মীমাংসায় পৌঁছতে পারছেন না। তারপর মীমাংসায় যখন পৌঁছলেন তখন বিশ বছর পার হয়ে গেছে। সবটাই হয়ে দাঁড়াল উত্তরমীমাংসা, কাজে লাগল না কিছুই। সব প'ড়ে রইল রাজবাড়িতে, স্বামীর সঙ্গে চ'লে এলেন কলকাতায়, তাঁর কর্মস্থলে।

কি পেলেন তিনি? কি রইল তাঁর? যা পেলেন তা তো মাখনবাবুরই দেওয়া। স্বামী ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। তখন তিনি মুন্সেফ হয়েছেন। বিচারক। বিচার তিনি করলেন। পদ্মার পার থেকে ঘরে ফিরবার সময় মাখনবাবুও সঙ্গে ছিলেন। তিনি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। কণে গেল কোথায়? তাকে খুঁজে পেলেন পদ্মার ধারে। জলের ঠিক দু ইঞ্চি ওপরে। তারপর সৌদামিনী দেবী পেলেন কি? বিয়ের পিঁড়িতে ব'সে সৌদামিনী দেবী অনুভব করলেন, পিঠের চামড়া তাঁর ভিজে উঠেছে। রক্ত? রক্ত

ছাড়া আর কি হতে পারে ভেবে সৌদামিনী দেবী হাত বাড়ালেন বরের হাতের দিকে। সম্প্রদান করছেন মাখনবাবু নিজেই।

কি একটা লোহার ডাণ্ডা না কি দিয়ে যেন দাদা তাঁর পিঠে আঘাত করেছিলেন, সৌদামিনী দেবীর আজ তা মনে নেই: ঘটনাটা মনে রাখতে তিনি চান নি সত্যি, কিন্তু পিঠের দাগগুলো তিনি মনে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। দাদার বিচার তিনি কোনদিনও ভুলতে পারবেন না।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ তুমি রান্নাঘর থেকে চ'লে এলে যে, মা?"

"তোকে দেখতে। কি করছিস, মাধু?"

"শাড়ি সেলাই করছিলাম।"

"আজকের দিনে ছেঁড়া শাড়ি সব প'ড়ে থাক্। আজকে তুই উনিশ বছর শেষ ক'রে কুড়িতে পড়লি। দইমাছ খেতে তুই ভালবাসিস, আমি রান্না করেছি, মাধু।"

"খাওয়ার সময় হ'লেই খেতে বসব। এখন মাত্র সওয়া দশটার ক্যানিংয়ের গাড়িটা গেল।"

"তোর বাবা আজ বেঁচে থাকলে, কত আয়োজনই না তিনি করতেন!"

"আমার জন্মদিনে তোমায় যদি একটা ভাল খবর দিই, তুমি খুশী হবে, মা?"

কথা শুনে সৌদামিনী দেবী ভাবলেন, মাধুরী বোধ হয় পরেশবাবুর কোন খবর বলবে। তিনি বললেন, "ভাল খবর হ'লে নিশ্চয়ই খুশী হব।"

"আমাদের ইস্কুলটা উঠে যাচ্ছে।"

"তার মানে?"

"আমরা বড় বাড়িতে যাচ্ছি। মতিলালবাবু কাল অর্ডার দিয়েছেন। মস্ত বড় ছতলা বাড়ি।" একটু থেমে মাধুরী আবার বলল, "বাড়িটা কেয়াতলা লেনে।"

খাবার ঘরে ব'সে গল্প করছিল রমাপদ। পিণ্টুর গল্প। মাখনবাবু আর লতিকা অবাক হয়ে ঘটনা সব শুনছিল। গল্প শেষ হওয়ার পর মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "পার্সটা ফিরিয়ে নেবার সময় টাকাগুলো সব-গুনে নিয়েছিলে তো?"

"না, তা আর নিই নি। অতবড় লোভ যখন সে সামলে নিয়েছে তখন সব ঠিক আছে জানি," বলল রমাপদ।

"তুমি এখনো কিছু জানো না। তোমাকে হয়তো দ্বিতীয়বার অবাক করবার জন্যে বস্তিতে গিয়ে পিণ্টু হাসছে। দুনিয়াটা বড় মজার জায়গা ভাই। ডাক্তারকে টাকা দেওয়ার সময় দেখো নি?"

"খুচরো টাকা থাকে অন্য একটা পার্সে। সেখান থেকে দিয়েছি।"

"তা হ'লে তুমি এখুনি পার্সটা খুলে দেখ। আমরাও দেখব। পিণ্টু হয়তো হাসছে।"

পার্সটা বার করবার ইচ্ছে ছিল না রমাপদর। পিণ্টুকে সে বিশ্বাস করতে চায়। বিশ্বাসটা ভেঙে গেলে মনে মনে সে খুবই কষ্ট পাবে। যুদ্ধ যখন থেমেই যাচ্ছে তখন কাউকে আর সে অবিশ্বাস করবে না। তবু শেষ বারের মত রমাপদ আবার একবার বলল, "পিণ্টুকে অবিশ্বাস করলে আমার ধর্ম বাঁচবে না।"

"কি বাঁচবে না?" মাখনবাবু মরবার আগে এ সব কি নতুন নতুন কথা শুনছেন?

রমাপদ বলল, "ধর্ম বলতে আমি লক্ষ্মীপুজোর কথা বলছি না। পিণ্টুকে অবিশ্বাস করতে গেলে মানুষকেই অপমান করতে হয়। সেই জন্যে আমি দুধ খাই নে।"

মাখনবাবু ভাবলেন, কায়দা ক'রে রমাপদ পিণ্টুর আলোচনাটা বদলাবার চেষ্টা করছে। তবুও মাখনবাবু জানতে চাইলেন, "দুধের ব্যাপার আবার কি? পিণ্টুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়?"

"মানুষকে বিশ্বাস করবার কথাটা নিয়েই তো আমরা আলোচনা করছিলাম? সকালবেলা আমাদের বাড়ির সামনে গয়লাটা তার গরু নিয়ে আসে। আমরা টাকায় এক সের ক'রে দুধ রাখি। গয়লাটা এসেই চেঁচাতে থাকে, মা দুধ দোয়াচ্ছি। মা সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ান চশমা চোখে দিয়ে। দূর থেকে গয়লাটা বালতিটা উপুড় ক'রে বলে, মা, এই দেখুন, জল নেই। ভাবুন তো, একটা জাতির পক্ষে এটা কত বড় অপমানের কথা! খাঁটি দুধ গয়লারা যতদিন না বাড়ি এসে দিয়ে যাবে, ততদিন আমি দুধ খাব না। অবিশ্বাসের দুধে প্রোটিন থাকলেও ইজ্জৎ নেই। পিণ্টু আমায় ঠকায় নি।"

লতিকা বলল, "দাদু যখন দেখতে বলছেন, তখন একবার দেখো না। দাদুর মনেরও তো সংশোধন হওয়া চাই।"

লতিকার কথাটা শুনতে রমাপদর ভাল লাগল না। মাখনবাবু হয়তো আঘাত পেলেন। রমাপদ তাই তাড়াতাড়ি পার্স টা বার ক'রে টেবিলের ওপরে রাখল। শ টাকার নোট ক'খানা বার করতে গিয়ে সোনার হারটাও বেরিয়ে এলো সেই সঙ্গে। লতিকার মুখের আকৃতিটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে এলো ব'লে রমাপদকে একটা মীমাংসায় আসতে হ'ল তাড়াতাড়ি। হারটা লতিকার হাতে দিয়ে সে বলল, "কেমন হয়েছে দেখো তো?"

"ক' ভরি আছে এতে?" জিজ্ঞাসা করলেন মাখনবাবু।

রমাপদ বলল, "দু ভরি। অলঙ্কার হিসেবে কিছু নয়। কোন একটা ছোটখাট উৎসবের কথা মনে রাখবার জন্যে উপহার দেওয়া চলে।"

লতিকা হারটা টেবিলের ওপরেই রাখল। মাখনবাবু বললেন, "বিয়ের আগেই লতু বত্রিশ ভরি উপহার পেল। ভাগ্য ভাল তোর লতু।…মাধুর ভাগ্যই বা খারাপ বলি কি করে? পরেশবাবু আমাদের স্বজাত নন, কিন্তু সেদিন যা দেখলাম তার পরে বর্ণাশ্রমধর্ম নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার মনে করলুম না।"

"কোথায় দেখলে?" সবিস্তারে সবটা শোনবার জন্যে লতিকা খুবই আগ্রহ দেখাল।

"পরেশবাবুর ওখানে একদিন গিয়েছিলাম। ভাল ফ্ল্যাট নিয়েছেন ভদ্রলোক। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে, রবিবার ছিল। দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। মিনিট তিন পরে আবার টোকা মারলুম। দরজা খুলে দিল মাধুরী। হাতে ওর একটা বাটি রয়েছে দেখলুম। পরেশবাবুকে দই পরিবেশন করতে করতে মাধু এসেছিল দরজা খুলে দিতে। আমাকে দেখে মাধুরীর তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার উপক্রম! পড়বার টেবিলে ব'সে পরেশবাবু খাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পড়ছিস, না ইতিহাস রচনা করছিস? জবাব দিলে না। গটগট ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অসবর্ণ বিয়ে সুখের হয় না। রমাপদ কি এখানে খেয়ে যাবে নাকি?"

"না না, আমি বাড়ি গিয়ে খাব। একটা মাত্র রবিবার,—এই দিনটাতেই

কেবল দুপুরবেলা বাড়িতে খাওয়ার সময় পাই। অন্যদিন তো হোটেলে গিয়ে খেতে হয়।"

মাখনবাবু উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন তিনি, "হ্যাঁ, দু-একদিন বাড়িতে খাওয়া ভাল। বাঙালী ছেলেরা তো আজকাল কেউ ভাত খায় না, লাঞ্চ খায়।"

"আমিও উঠি লতিকা। প্রায় এগারোটাই বাজল।" রমাপদ উঠল। লতিকা বলল, "হ্যাঁ, বেলা অনেক হ'ল। চান সেরে আমিও একটু বাইরে যাব।"

"আমি তা হ'লে বসি, চান সেরে নাও, গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসব।" রমাপদ আবার বলতে যাচ্ছিল।

"না, তুমি বরং যাও। আমি একলাই যাব।"—এই ব'লে লতিকা হারটা হাতে নিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "চ'লে যাচ্ছ? কিছু বললে না তো?"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে নাকি? আমি বোধ হয় ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হযে পড়ছি। কি জিজ্ঞেস করেছিলে আর একবার বল।"

"না, না, এখন তুমি অন্যমনস্ক হও নি। আমি তোমার দিকে সতর্ক ভাবে চেয়ে ছিলাম।"

"তা হ'লে কিছুই জিজ্ঞাসা করো নি।" যাবার জন্যে লতিকা পা বাড়াল।

"যাচ্ছ? একটু আলোচনা ক'রে গেলে ভাল হ'ত না?"

"চান করতে যাচ্ছি, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালব।"

"কিন্তু হারটা সম্বন্ধে কিছুই তো বললে না, লতিকা?"

"উপহারের জিনিস, সোনার ওজন দিয়ে মূল্য যাচাই করতে চাই না। এক আনার সোনা হ'লেও নিতুম।"

রমাপদ এবার লতিকার পেছনে পেছনে ঘরের বাইরে গিয়ে ডাকল, "শোন। হারটা আমি তোমার জন্যে আনি নি।"

"তবে? কার হার এটা?"

"না, না, কারো নয়। মা নিজে গিয়ে কিনে এনেছিলেন গড়িয়াহাট থেকে।"

"কার জ'ন্য ?"

"মাধুরীর জন্যে "

"তা হ'লে তুমি ফিরিয়ে নাও।" হারটা রমাপদর দিকে তুলে ধরল লতিকা।

"ফিরিয়ে নিতে আমি চাই না। তোমার কাছেই থাক। মাধুরী কাল রাত্রে হারটা ফেরত পাঠিয়েছে। বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন, বাবাই আবার ফেরত এনেছেন। রাগ ক'রে মা রাত্রিতেই হারটা যামিনীকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অত রাত্রে হার আমি রাখি কোথায় ? পার্স টার মধ্যে রাখলুম। তোমার কাছেই থাক।"

"মাধুরীকে তোমার মা এবং বাবা খুব ভালবাসেন, না রমাপদ ?"

"বোধ হয় ভালবাসেন। আমি নিজের চোখে কোনদিনও ভালবাসতে দেখি নি। যাক, এখন তো মাধুরী চ'লে যাচ্ছে পরেশবাবুর বাড়ি—"

"তোমার মা এবার খুশী হবেন, দু-ভরি সোনা তাঁর বেঁচে গেল।"

"মার লোকসান কিছু হ'ত না। হার কিনতে টাকা দিয়েছিলুম আমি, এখন এটা তোমার কাছেই থাক।"

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "মাধুরীর সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে হারটা কি দিয়ে দেব ?"

"সে নেবে না। একদিন দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি যে।"

"আমায় কতদিন ধ'রে দেখছ রমাপদ ?"

লতিকা ওপরে উঠে যাওয়ার পরেও সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে রইল রমাপদ।

আজকাল সকালের দিকেই ছাত্র পড়াতে যান শশধরবাবু। ফিরে আসতে প্রায় সাড়ে ন'টা হয়। সকালবেলা লেকের দিকে গিয়ে হাওয়া খাওয়ার অভ্যাস তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। চারদিকের অরাজকতা দেখে দেখে তিনি আর নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে পারেন না। তাঁর তো আর ভবিষ্যৎ নেই, স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হ'লেও সংসারে কারো কিছু ক্ষতি হবে না।

সাদার্ন এ্যাভিনু আর রসা রোডের মোড় থেকে তিনি হেঁটে আসেন কেয়াতলা লেনে। আরও সেই সস্তা দামের বেতের ছড়িটা হাতে দোলাতে

দোলাতে শশধরবাবু ফিরে আসছিলেন কেয়াতলা লেনের দিকে। জাহাজ-মার্কা বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছবার পর, তিনি দেখলেন রমাপদ বাঁ দিকের একটা রাস্তায় মোড় ঘুরল। ঐ রাস্তা দিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে যেতে হ'লে একটু ঘুরে যেতে হয়। গাড়িতে মাখনবাবু ছিলেন ব'লেই বোধ হয় রমাপদ খানিকটা বেশি পেট্রোল পুড়িয়ে আজ হিন্দুস্থান পার্কে গিয়ে পৌঁছবে। ঘুরে না গেলে হয়তো এই রাস্তায় শশধরবাবুর সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও শশধরবাবু রমাপদ ও মাখনবাবুকে দেখলেন। না দেখলেই বা কি, শশধরবাবু কি রমাপদর কার্যক্ষেত্রটা চোখ বুজেই দেখতে পান নি অনেক দিন আগে ?

বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। সুধাময়ী কসবা গেছেন। নিয়ে গেছে যামিনী। মাধুরীর আজ জন্মদিন। শশধরবাবু সোনার হারটা কাল নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। মাধুরী ফিরিযে দিয়েছে সেটা। শশধরবাবু ভাবলেন, হয়তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল ব'লেই মাধুরী গতকাল হারটা গ্রহণ করে নি। সুধাময়ী আজ কিছু মিষ্টি আর ফল কিনে নিয়ে গেছেন কসবায়। এগুলো হয়তো মাধুরী আজ ফিরিয়ে দেবে না।

কি মনে ক'রে শশধরবাবু আজ উঠে এলেন দোতলায়। রমাপদর ঘরটা তিনি কোনদিনই দেখেন নি। আজ তাঁর আগ্রহ হ'ল ঘরটা দেখবার জন্যে। ঘরে এসে তিনি বসলেন রমাপদর বিছানার ওপর। সাজানো-গুছনো ঘর। এ ঘরের তত্ত্বাবধান করে যামিনী। মাসিক মাইনে পায় ত্রিশ টাকা।

ভজগোবিন্দ হাই ইস্কুলে তিনি যখন চাকরি নিয়ে যান তখন তিনি ত্রিশ টাকা মাইনেতেই ঢুকেছিলেন। ত্রিশ টাকা মাইনে পেতেন ব'লে শশধরবাবু কোন দিন কারো কাছেই অভিযোগ জানান নি। তিনি শিক্ষক। পাঁচ টাকা কম বেশি পেলেন ব'লে কখনও তিনি লজ্জিত বোধ করেন নি। রাষ্ট্র এবং সমাজের যদি এতে লজ্জা না হয়, তবে তাঁর কেন লজ্জা হবে ? দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার মহত্তম কাজ নিয়ে তিনি শিক্ষকতা করতে এসেছেন। আর্থিক অভাবের কথা তিনি যদি কোন দিনও মুখ দিয়ে প্রকাশ করতেন, বিক্ষোভ দেখাতেন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে, তা হ'লে ছেলেদের সামনে তিনি ইহজীবনেও আর মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে দাঁড়াতে পারতেন না। নিজেকে পলে পলে নুইয়ে দিয়েই তো তাঁকে হাজার হাজার ছেলের মেরুদণ্ড তৈরি

করতে হয়েছে। ত্রিশ টাকা মাইনে থেকে দেড় শো টাকা মাইনে হ'তে তাঁকে আরও বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে অপেক্ষার মধ্যে বিন্দুমাত্র অগৌরব ছিল না।

রমাপদর ঘরে আজ শশধরবাবু কি যেন খুঁজতে লাগলেন। রমাপদর সেই আগের দিনের ভাঙা চৌকি উধাও হয়েছে। ছেঁড়া গেঞ্জির কোন অস্তিত্ব নেই। শশধরবাবুর মনে হ'ল, বড় হোটেলের একটা কামরার মত ঘরখানা। এমনি ধরণের ঘরে তিনি নিজে হয়তো রাত কাটাতে পারতেন কিন্তু বাস করতে পারতেন না। ঘরটাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, রমাপদ যেন সবাইকে ডেকে ডেকে তার ঘরের ঐশ্বর্য দেখাতে চায়। কোথাও তিনি বিন্দুমাত্র স্বাভাবিকতা দেখতে পেলেন না। বাঙালী গৃহস্থের শিল্প-সমন্বিত বাস্তু-পরিবেশ এতে নেই। শশধরবাবু ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন নীচে। হোটেল যত বড়ই হোক, বেশিক্ষণ সেখানে তিনি থাকতে পারলেন না। নীচে এসে দেখলেন, সুধাময়ী ফেরেন নি।

লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে বসেছিল মাধুরী। সুধাময়ী নিজে হাতে মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলেন মাধুরীকে। প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুধাময়ী দেবীকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। সৌদামিনী দেবীর খুবই খুশি হওয়ার কথা ছিল! এ দৃশ্য দেখে তিনি খুশি হতে পারলেন না। মাধুরী মনে মনে যে বিব্রত বোধ করছে তিনি তা বুঝতে পারলেন। সুধাময়ী দেবী রমাপদর কোন খবর রাখেন না।

তিনি বললেন, "রমাপদ বোধ হয় লতিকাকে বিয়ে করবে।"

"লতিকা কে?" সুধাময়ী দেবী মাধুরীর মুখে সন্দেশের টুকরোটা তুলে দিতে গিয়েও দিলেন না।

সৌদামিনী দেবী বললেন, "মাখনবাবুর নাতনী। রমাপদ লতিকাকে ভালবাসে। আপনারা বোধ হয় সে সব খবর কিছু রাখেন না।"

"না। মার কাছ থেকে উপযুক্ত সন্তান কোন কিছু গোপন ক'রে রাখতে পারে ব'লে বিশ্বাস করতাম না। আমার বিশ্বাস এখন বদলালো। রমাপদ লতিকাকে বিয়ে করলেও মাধুরীকে আমরা চিরকাল ভালবাসব। আমি উঠি!" উঠে পড়লেন সুধাময়ী। মাধুরীর চেয়ে এবার বোধ হয়

তিনিই বেশি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। সৌদামিনী দেবীর উত্তেজনা বাড়তে লাগল। এ-উত্তেজনার সবটুকু মাধুরীর জন্যে নয়। পদ্মার গর্জন তিনি আজও মাঝে মাঝে শুনতে পান। মাধুরীর নিশ্বাসের মধ্যে সৌদামিনী দেবী বিশ বছর আগেকার সেই গর্জনের গমক শুনতে পেলেন। বয়স কমলো সৌদামিনী দেবীর। উত্তরমীমাংসার জন্যে অনুতাপ তিনি করলেন না। যেন দাদার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন মাধুরীর মা।

তিনি বললেন, "মাধুরী ঠকেছে। ঠকিয়েছে রমাপদ। আমি আর ওকে ঠকতে দিতে রাজী নই।"

"রমাপদর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।" বললেন সুধাময়ী। সৌদামিনী দেবী জানেন, মাখনবাবু হ'লে তিনি কোনদিনও ক্ষমা চাইতেন না। মাধুরী এখনো মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে। মা যে তার এমনি ধরনের কথা কইতে পারেন, নিজের কানে না শুনলে সে বিশ্বাস করত না। মাধুরী বোধ হয় জানে না যে, সৌদামিনী দেবী আজও দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মা নদীর ধারে। তাঁর পায়ের দু-ইঞ্চি নীচে জল!

সুধাময়ী চ'লে যাচ্ছিলেন। শীতের মুখে বাতের ব্যথাটা তাঁর শুরু হয়। আসবার সময় ব্যথাটা ছিল। যাওয়ার সময়ে আর ব্যাথা নেই। মনের ব্যথার বিষ দিয়ে তিনি বাতের ব্যথার বিষটাকে নষ্ট ক'রে দিলেন। সৌদামিনী দেবী বললেন, "মাখনবাবু লতিকার বিয়ের জন্যে গহনা পর্যন্ত কিনে ফেলেছেন। রমাপদ সেখানে প্রত্যেকদিন ব্রেকফাস্ট খায়।"

"মা না হ'লে আমি ওকে বিষ খাওয়াতাম" বলতে বলতে সুধাময়ী উঠোনে নামলেন, "এমন ছেলের কি ক'রে যে মা হলুম, তাই ভাবছি। রমাপদর বাবার চরিত্রেও কিন্তু কোন দাগ নেই। কই রে, যামিনী, চল্।"

লতিকা এলো বাইরের দরজা দিয়ে। সৌদামিনী দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়েই বললেন, "লতিকা নাকি? রেল লাইনটা পার হ'লি কি ক'রে।"

"এখন আর গাড়ি আসবে না। ওদিকের লাইন সব বন্ধ। দুটো গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে। স্টেশনের কুলীরা সব বলাবলি করছিল।"

লতিকার মুখের দিকে সুধাময়ী একবার চেয়েও দেখলেন না। তাঁর দিকে চেয়ে লতিকা কিন্তু বুঝতে পারল, ইনিই হচ্ছেন রমাপদর মা। লতিকা

পায়ের ধুলো নিল। নাকের ডগায় চশমাটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সুধাময়ী চ'লে এলেন কসবার সরু গলিতে।

সৌদামিনী দেবী চোখে কাপড় দিয়ে বারান্দার ওপর ব'সে পড়লেন। এবার মাধুরীর ওঠবার সময় হয়েছে। মায়ের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। মাধুরী বলল, "তুমি একটু দাঁড়াও লতুদি। মাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।"

"না, আমি আর দাঁড়াব না। তোর আজ জন্মদিন। দাদু নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। আমি ভুলি নি মাধু।" এই ব'লে লতিকা রমাপদর দেওয়া সেই সোনার হারটা পরাতে গেল মাধুরীর গলায়। ঘাড়টা সরিয়ে নিল মাধুরী। লতিকা এবার হার-ছড়াটা বারান্দার দেওয়ালের গায়ে টাঙিয়ে রাখল।

সেখানে একটা পেরেক লাগানো ছিল।

॥ সাত ॥

ন'টা না বাজতেই বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের সামনে ভীড় জমছিল। রমাপদ ন'টা না বাজতেই আজ ব্যাঙ্কে এসে পৌঁছে গেছে।

অমূল্যধন ক্যাশঘরের খাঁচার মধ্যে ব'সে কাউণ্টারের ফুটোর মধ্যে দিয়ে চেয়ে ছিল সামনের দিকে। মানুষের স্রোত চলেছে। টাকা তোলবার হুল্লোড় প'ড়ে গেছে। অমূল্যধন দশটা থেকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা চড়ুই পাখির ল্যাজের মত ক্রমাগত নাড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হাতে টাকা ঠেকছে না। আঙুলের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নেকড়াটা তবু খুলে পড়ল। দুটো বাজতে আর পাঁচ মিনিটও বাকি নেই। ক্যাশ দেওয়া আর নেওয়া বন্ধ হবে। অমূল্যধন ঘড়ি দেখছে আর ফুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে আবৃত্তি করছে, "আসবে আসবে।"

ছ'নম্বর লেজার বইটার ওপর কলমটা রেখে হরিবাবু চশমার তলা দিয়ে খাঁচার দিকে চাইলেন একবার। অমূল্যধনের আবৃত্তি তিনি অণেকক্ষণ থেকেই শুনছিলেন। দুটো বেজে এক মিনিট যখন হ'ল, হরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি করবি অমূল্য? এবার তো আর সুর ক'রে আসবে আসবে বললেও কিছু আসবে না। আবত্তি তোর থামা রে ছোঁড়া।"

এ পাশের জালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে অমূল্যধন বলল, "কাল সারা রাত স্বপ্নের মধ্যেও না কি আবৃত্তি করেছি, হরিদা। মাঝরাত্রিতে বাবা তো রেগে আগুন! আমার আবৃত্তি শুনে তিনি ঘুমুতে পারছেন না। তিনি তারপর বাকি রাতটা কি করলেন জানো?"

"না, তুই বল, আমি শুনি!" হরিবাবু লেজারের গায়ে হেলান দিয়ে উঁচু চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে বসলেন। পকেট থেকে সকালের সেই আধ-পোড়া সিগারেটটা বার ক'রে তাতে আগুন ধরালেন তিনি। অমূল্যধন জালের ফাঁক দিয়ে হাতটা ঢোকাতে যাচ্ছিল। ছোট ছোট ফাক দিয়ে একটা আঙুল ঢুকতে পারে, হাত ঢুকল না।

"হরিদা, দাও না একটা টান দিয়ে দি। কালীর দিব্বি, একটার বেশি টান দেব না।"

"দুপুর রাত্রের গল্পটা বল্, চার সুতো বাকি থাকতে পুরোটাই তোকে দেব।"

"চার সুতো বাকি থাকলে ঠোঁটে লাগাব কি ক'রে? ধরব কোথায়? ফুঁকব কোন দিক দিয়ে, হরিদা?"

"ভেতরে মসলা থাকলে ফুঁকতে কোন অসুবিধে হবে না অমূল্য।"

"তবে তাই দিয়ো। ফুঁকতে না পারি, চেটে চেটে খাব। তামাকের গন্ধ পেলেই হ'ল। বুড়ো আঙুলের নেকড়াটা আজ বারে বারে খুলে যাচ্ছে হরিদা। একটু দাঁড়াও—"

অমূল্যধন শিশি থেকে আঠা বার ক'রে নেকড়ার গায়ে লেপ্টে লেপ্টে আঠা লাগাতে লাগল। জালের ফাকের মধ্যে দিযে আঙুলটা বার ক'রে দিয়ে সে বলল, "নেকড়াটা এবার ভাল ক'রে একটু বেঁধে দাও তো!"

"ফোকোটে কাজ করিয়ে নিচ্ছিস অমূল্য? দে—"

হরিবাবু নেকডা বাঁধতে লাগলেন। অমূল্যধন বলতে লাগল, "ঘুমের মধ্যে বার বার নাকি চেঁচিয়ে উঠছিলাম। বাবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। তিনি এসে আমায় মারলেন এক ধাক্কা। আমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই হরিদা!"

"আছে, আছে, অমূল্য। তারপর তিনি কি করলেন?"

"বাবা বললেন যে, এসব বড় খারাপ স্বপ্ন। দম আটকে মারা যাওয়ার ভয় আছে। বাবা একটা নারকোলের দড়ি নিয়ে এসে আমার একটা পায়ের সঙ্গে বাঁধলেন। জিজ্ঞেস করলুম, এসবের মানে কি? তিনি বললেন, দম আটকে গেলে মরে যাবি। বার বার ক'রে আমি উঠে আসতে পারব না। এবার যদি চেঁচিয়ে উঠিস, এই দড়ি ধ'রে মারব একটা টান। আহাম্মক, শুনিস তো টাকা, ঘুমের মধ্যে আবৃত্তি করিস কি ক'রে? হরিদা, সবটুকু খেয়ে ফেললে যে! চার সুতোও নেই, দাও—"

হরিবাবু দিলেন। জালের ফাঁক দিয়ে টুকরোটা গড়িয়ে পড়ল ক্যাশ-ঘরের মেঝেতে। ধরবার মত জায়গা পেল না অমূল্যধন। মেঝে থেকে কুড়িয়ে এনে অমূল্যধন বলল, "এতে তামাক নেই, সবটুকুই আগুন। হরিদা, আমি আগুন খাব।"

"খা, আমি আরও তিনটে টান মারতে পারতুম।"

অমূল্যধন হরিবাবুর চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল যে, আরও তিনটে টান দেওয়ার জন্যে মনটা তাঁর লোভের আগুনে জ্বলছে। তিনটে টানের লোকসানও তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অমূল্যধন ধীরে ধীরে বলল, "এখানে এতদিন টাকা দেখলুম আমরা, ভালবাসা দেখলুম না।"

"ব্যাঙ্কে তো টাকাই থাকে, মেয়েছেলে থাকে না।"

'মেয়েছেলে'ছাড়া কি ভালবাসা হয় না হরিদা? ভালবাসা কি জানো?

"তুই বল্, আমি শুনি।"

সিগারেটের শেষটুকু অনেকক্ষণ আগেই ছাই হয়ে গিয়েছিল। ডান হাতের তালুতে ছাইটুকু ধ'রে রেখে অমূল্যধন বলল, "সিগারেটের নাম ক'রে আগুনটুকু যখন আমায় দিলে, তোমার চোখের মধ্যে যা আমি দেখলুম তার উল্টোটা হচ্ছে ভালবাসা। হরিদা, আর বোধ হয় আমাকে টাকা গুনতে হবে না।"

"বোধ হয় না। আমি তো অন্য ব্যাঙ্কে কাজের খোঁজ করছি, অমূল্য।"

"এখানকার সবাই কাজের খোঁজ করছে। আমরা কেউ তো বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে কাজ করি নি, কেবল চাকরি করেছি। তুমি কি বল হরিদা?"

হরিবাবু কিছু বললেন না। লেজার বইটার নতুন পাতাগুলো তিনি ওলটাতে লাগলেন। নামের সংখ্যা ক'মে গেছে। টাকা সব তুলে নিয়ে অনেকেই অ্যাকাউণ্ট বন্ধ ক'রে দিয়েছে। লাল কালিতে লেখা ওভার-ড্রাফটের অঙ্কগুলোই কেবল লেজার বইটা ক প্রতিদিন ভারি ক'রে তুলছে। লাল কালির মধ্যে ভালবাসার চিহ্ন দেখলেন না হরিবাবু। ভালবাসার নাম ক'রে অমূল্যধন কি যে বলল, তিনি তা বুঝতে পারলেন না। খুশী মনে সিগারেটের অংশটুকু অমূল্যধনকে দিয়ে দিতে পারলেই কি ভালবাসার প্রমাণ পেত সে? কথাটা ভাববার মত। মাত্র একশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে পেলে কি হবে, ছোঁড়াটার মনটা বোধ হয় হাল্কা নয়। সত্যিই তো, এ ব্যাঙ্কের কেউ তো এখানে কাজ করে নি, কেবল চাকরি করেছে।

তিনটে নাগাদ ক্যাশ জমা নেওয়ার খাতা নিয়ে অমূল্যধনকে প্রতিদিন যেতে হয় রমাপদর ঘরে। কালও সে গিয়েছিল। খাতাটাও হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আজ আর খাতাটা নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না। একটা টাকাও ক্যাশ জমা পড়ে নি। তিনটে বেজে গেল, রমাপদ তবু

অমূল্যধনের খোঁজ করছে না। ক্যাশঘরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো অমূল্যধন। লম্বা কাউণ্টারের পেছন দিয়েই যেতে হয় প্রধান হিসাব-রক্ষকের ঘরে। মাথা নীচু ক'রে সে হেঁটে যাচ্ছিল। অমূল্যধনের বুঝতে আর বাকি নেই যে, কাউণ্টারের পেছনে উঁচু চেয়ারের ওপর ব'সে সবাই আজ মনে মনে হাসছে। বোধ হয় এরা প্রত্যেকে অন্য কোথাও চাকরি পেয়ে গেছে।

রমাপদ সিলিং-এর দিকে মুখ ক'রে ব'সে সিগারেট খাচ্ছিল। ওর ঠিক মাথার ওপরে দোতলার ঘরেই বসেন বোস সাহেব। বিপিনের মারফৎ সে খবর নিয়েছে যে, বোস সাহেব আজ তাঁর অফিস ঘরেই আছেন, প্রাইভেট কামরায় ঢোকেন নি। লোকটাকে আজও রমাপদ চিনতে পারল না। হিরোশিমার খবর পেয়েও তিনি গম্ভীর হতে পারেন নি, একটু আগে পর্যন্তও না কি তিনি বিপিনের সঙ্গে রসিকতা করছিলেন। বিপিনের বিয়ের জন্যে বাংলা খবরের কাগজে 'পাত্রী চাই' ব'লে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বোম্বে থেকে কোন্ এক পাত্রীর বাবা জবাবও দিয়েছেন। মেয়ে দেখবার জন্যে বোস সাহেব নাকি বোম্বে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

অমূল্যধন যে খাতা না নিয়েই ঘরে ঢুকেছে রমাপদ তা আগেই দেখেছে। রসিকতা করবার মত মনের অবস্থা নয় ওর। অমূল্যধন এরই মধ্যে বার দুই বলেছে, "আমি এসেছি সার্।"

"আমি অন্ধ নই, তোমায় আমি দেখেছি। ও কি অমূল্য, আঙুলগুলোকে অমনি ক'রে নাড়াচ্ছ কেন? নার্ভ সব গেছে বুঝি?"

"আজ্ঞে না। টাকা গুনবার অভ্যাসটা আমার যায় নি।"

"হ্যাঁ, অভ্যেসটা ধ'রে রাখ, অন্য ব্যাঙ্কে গেলে তখন আবার কাজে লাগবে।"

কি যেন একটু ভাবল অমূল্যধন। রমাপদ জানে, অমূল্যধনের কথায় অনেক সময় হাসি পায় বটে, কিন্তু অমূল্য নিজে কখনও হাসে না।

অমূল্যধন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি অন্য ব্যাঙ্কে কাজ ঠিক ক'রে রাখেন নি সার্?"

"না। আমি এখানে চাকরি করবার জন্যে ঢুকি নি। কাজ করতেই ঢুকেছিলাম!"

"আমিও।"

ছাইদানিতে সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিয়ে রমাপদ বলল, "ব'স না ওখানে।"

"না থাক। হরিদারা এখানে বসতে পারলে খুবই খুশী হতেন। কিন্তু আমি বসতে আসি নি, কাজ করতেই এসেছিলাম বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে।" গাম্ভীর্যের চুড়ায় উঠল অমূল্যধন, "কাজ করতে এসেছিলাম ব'লেই নেকড়াটা আজ আবার ভাল ক'রে বেঁধেছি। খুলে গিয়েছিল।"

"এখনও জল লাগলে জ্বালা করে না কি, অমূল্য ?" সিগারেটের টিনটা অমূল্যধনের দিকে এগিয়ে ধ'রে রমাপদ আবার বলল, "এতদিন দেখতে পাই নি।"

"কি দেখতে পান নি সার্ ?"

"ধন, যার মুল্যের কোন সীমা নেই। টিনটা তুমি রেখে দাও। আজ বোধ হয় রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমায় বোস সাহেবের সঙ্গে থাকতে হবে। তাঁর সামনে আমি সিগারেট খাই নে। দরকার হয় আবার কিনে নেব।"

"সত্যিই নেব না কি ?"

"সত্যিই।"

বিপিন এলো। সে বলল "বড় সাহেব আপনাকে একবার ডাকছেন। অফিস ঘরেই তিনি আছেন।"

"খুব জরুরী দরকার না কি, বিপিন ?'

কথা শুনে তা মনে হ'ল না। অমূল্যবাবুর সঙ্গে কাজ আপনি সেরে নিন। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।"

"অমূল্যর সঙ্গে আমার কাজ নেই।" রমাপদ উঠল।

সিগারেটের টিনটা হাতে নিয়ে অমূল্যধন এসে দাঁড়াল হরিবাবুর পেছনে। সে জিজ্ঞাসা করল, "হরিদা কি লিখছ ?"

মুখ না ঘুরিয়েই তিনি জবাব দিলেন, "আবার আমায় জ্বালাতন করতে এলি কেন ?"

"জ্বালাতন না, তোমায় জিজ্ঞেস করতে এলুম, ব্যাঙ্কের কাজ তো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কি করবে ? আবিসিনিয়ায় যাবে কি ক'রে ? আমি কিন্তু আজও আশা ছাড়ি নি, হরিদা।"

"আমি ছেড়েছি। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। নগদ টাকা যা নেবার বাবা নিয়ে নিয়েছেন। ব্যাঙ্ক ফেল পড়লেও বিয়ে এখন আটকাবে না।"

"কি মজা। আমি বরযাত্রী যাব হরিদা। কোথায় ঠিক হ'ল ?"

লেজারের দিকে চেয়েই হরিবাবু বললেন, "বর্ধমান জেলার গলসিতে তড়িৎ মুখুজ্জের পৌত্রী।"

"পৌত্রী কি ?" ভুরু কোঁচকালো অমূল্যধন।

"ছেলের মেয়ে।"

"এই মেয়ের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ এসেছিল। আমার মাইনে কম ব'লে বিয়ে হ'ল না। আমি বরযাত্রী যাব হরিদা।"

"যাবিই তো। তোর কাছ থেকেই তো সেদিন তাঁদের ঠিকানা জানলুম। বাবাকে গিয়ে সেইদিন রাত্রেই ঠিকানাটা লিখিয়ে দিলুম। বাকিটা সব সামাজিক মতেই হ'ল। এই ব'লে অমূল্যধনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হরিবাবু হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "অমূল্য হাতে ওটা কি তোর ?"

"সোনার অগ্নি-কণা, সিগারেটের নাম, খাবে একটা ?"

"খাব না মানে ? চুরি করলি না কি ?"

"সেন সাহেব দান ক'রে দিলেন। ওকি দুটো নিচ্ছ কেন হরিদা ?"

"তোর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তোর মধ্যে এখনো ভালবাসা জন্মায় নি। ছুটির পরে আজ আমরা এক সঙ্গেই যাব অমূল্য।"

ছ' নম্বর লেজারের কাছে বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে দেখে বাকি সব নম্বর থেকে যাদুবাবু, মাধুবাবু ইত্যাদি সবাই এসে ভিড় করল অমূল্যর চারদিকে। মন্বন্তরের সময়, অমূল্যধন দেখেছে, শকুনেরাও ঠিক এমনি ক'রে বাংলার ময়দানে ভিড় জমাত। খোলা টিনটা ধ'রে সে দাঁড়িয়েই ছিল। ছোঁ মেরে মেরে সবাই একটা একটা ক'রে সিগারেট তুলে নিয়ে গেল। যাদুবাবু শেষ মুহূর্তে ফিরে এসে আবার আরও একটা তুলে নিয়ে গুঁজে রাখল কানের ওপরে।

হরিবাবু বললেন, "ওরে আহাম্মক, টিনটা বন্ধ করতে পারছিস না ?"

"না হরিদা, বন্ধ আমি করব না। দেখি ওরা কত খায় !"

বোস সাহেব আজ দশটা না বাজতেই ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। দশটা থেকে

দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন, একবারও বসো নি। রাস্তার দিকের জানলা ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। মুখ নীচু ক'রে মাঝে মাঝে লম্বা 'কিউ'টা দেখছিলেন। কিউটা দেখে রমাপদ নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে আজ। বোস সাহেব ভাবলেন, আজকের কিউটা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। রেশনের দোকানের কিউর চেয়ে হয়তো লম্বায় একটু বড়ই হবে। দু'চার দিন পরে ভয় পাওয়ার হয়তো সত্যিই কারণ থাকবে। কিন্তু ভয় পাওয়ার আছেই বা কি? ব্যাঙ্কটা হয়তো ফেল পড়তে পারে। ভারতবর্ষে আগে কখনো কি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে নি? বাংলাদেশেই তো বড় ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। দেশভক্ত শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তিরাও তো ব্যাঙ্ক ফেল করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের তৈরি প্রতিষ্ঠান তাঁরা নষ্ট করেছেন বোস সাহেব তা করেন নি। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক যে কবে প্রতিষ্ঠান হয়েছে তা তিনি জানেন না। কেমন ক'রে এখানে এত টাকা এলো তাও তাঁর মনে নেই। পঞ্চাশ একশো টাকা আনবার জন্যে একদা তিনি অ্যাকাউণ্ট খোলবার ফর্ম নিয়ে ছোটাছুটি করতেন বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা আনবার জন্যে তিনি সব মিলিয়ে এক ঘণ্টাও চেষ্টা করেন নি। কারা যে কখন ছুটে এসে এখানে টাকা রেখে গেল তাও যেন তাঁর কাছে আজ রহস্যের মত মনে হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক তিনি গড়েন নি। বাড়িটা ছতলা হ'ল। তাও তৈরি করল গড়পারের কোন্ এক কনট্রাক্টর। কোথায় ইট, চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট, লোহা পাওয়া যায়, বোস সাহেবকে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে তিনি ঠিকানা দিতে পারবেন না। দিলেও ভুল ঠিকানা দেবেন। একটা ঠিকানাই কেবল মনে ক'রে রেখেছিলেন। কলকাতায় এসেছিলেন বোধ হয় সেই ঠিকানাটা খুঁজতে। সৌদামিনী দেবীর ঠিকানা তখন কসবার সরু গলিতে ছিল না।

মুখ নীচু করলেন বোস সাহেব। কিউটা ছোট হয়ে এসেছে। ক্যানিং ষ্ট্রীটের ভিড় কমছে। ঘড়িতে সময় দেখলেন, দুটো বাজতে এখনো পনেরো মিনিট বাকি। কিউ থেকে হল্লা আসছে। কে একজন বিধবা ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, "ও হরি, ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করিস নে। খুকীর বিয়ের টাকা কিন্তু।"

তাঁর পেছন থেকে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "ভয় পাচ্ছেন কেন? বড়বাজারের লোকেরাই এসব গুজব রটায়। বাঙালী ব্যাঙ্ক কি না।"

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তবে টাকা তুলতে এসেছেন কেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমার যা-কিছু যথাসর্বস্ব এখানেই রেখেছি। আমার ছেলেটা এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষার ফি দিতে হবে, তাই টাকা তুলতে এসেছি।"

মহিলাটি আবার বললেন, "সব ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, আজ টাকা না তুললে আর কোন দিনই তোলা যাবে না।"

সামনের দিক থেকে অন্য একজন মহিলা বললেন, "আজ টাকা তুলতে পারব তো? ছ মাস থেকে স্বামী শয্যাশায়ী। কাজ করতে পারেন না। ব্যাঙ্কের টাকা তুলে তুলে খেতে হচ্ছে।"

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে বোস সাহেব টের পেলেন, গুর্খা দরওয়ানটা বড় গেট বন্ধ করল। ঠিক দুটো বেজেছে। ক্যানিং ষ্ট্রীটের রাস্তা থেকে কেবল হল্লাই এলো না, এলো আর্তনাদও। বোস সাহেব রাস্তার দিকের জানলাটা এবার বন্ধ করে দিলেন।

চেয়ারে এসে ব'সে পড়লেন তিনি। আগের কথাগুলো আবার নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। কলকাতায় এসেছিলেন ব্যাঙ্ক চালাতে নয়। সন্তুর সঙ্গে যখন দেখা হ'ল না তখন তিনি ভাসতে লাগলেন কলকাতার জনস্রোতে। কোন কিছুই করবার নেই—ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্ক খোলবার পরে তাঁর আদর্শের কথা মনে হ'ল। বাংলা দেশ শিল্পসমৃদ্ধ কিনা তার খবরও তিনি রাখতেন না। পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, সন্তুর ঠিকানার বাইরে আর কিছু তাঁর জানবার ছিল না। সন্তু যখন চিরদিনের মত তাঁর জীবন থেকে বেরিয়ে গেল, তখন তিনি এসে ব্যাঙ্কের জীবনে ঢুকে পড়লেন। সন্তুর প্রতি বোস সাহেবের যা একাগ্রতা ছিল তার ছিটেফোঁটাও যদি ব্যাঙ্কের প্রতি থাকত তা হ'লে রাস্তার ঐ কিউটা থেকে আজ আর এমন ভাবে আর্তনাদের ধ্বনি দোতলায় এসে ধাক্কা মারতে পারত না।

কিন্তু তা হয় না, হ'লও না। ব্যাঙ্ক খোলবার পরে তিনি আদর্শের কথা ভাবতে লাগলেন। একটা আশী বর্গ ফুট ঘরের মধ্যে টাকা নেই, আদর্শও যদি একটা না থাকে তা হ'লে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে লাভ হ'ত কি? বোস সাহেব আর সন্তুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত বেশি বাড়তে লাগল, একটা সুস্পষ্ট আদর্শকে খাড়া ক'রে ধ'রে রাখবার জন্যে বোস সাহেব চঞ্চল হয়ে

উঠতে লাগলেন তত বেশি। বাংলা দেশে যে অবাঙালীর হাতেই সব শিল্প-কারখানা রয়েছে তেমন ঘটনা তিনি জানতে পারলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটা বই প'ড়ে। কোথায় এমন ক'রে যে বইটা তাঁর হাতে এসে পড়েছিল বোস সাহেবের তা মনে নেই। বইটা প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলবার পরে হঠাৎ তাঁর লেখকের নামটা জেনে নেবার ইচ্ছা হ'ল। বইটার প্রথম পাতায় নামটা যদি লেখা না থাকত, বোস সাহেব তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামটাও জানতে পারতেন না। পাড়াগাঁয়ে থাকতে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের নাম শোনেন নি। তাঁর নিজেরও কোন লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। বই পড়বার পরে খোঁজ নিয়ে তিনি যখন জানলেন যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার একজন কৃতি সন্তান তখন তিনি সত্বর বদলে আঁকড়ে ধরলেন আচার্যকে। দেশপ্রেম যে কি বস্তু তা তিনি কলকাতায় এসে খবরের কাগজ না পড়লে বুঝতে পারতেন না। যখন বুঝলেন, তখন কি ক'রে যে দেশপ্রেম কাজে লাগানো যায় তার রাস্তা খুঁজে পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল যতদিন না আচার্যের বইটা হাতে এলো। সত্বর প্রেম বুঝতে তাঁকে পদ্মার ধারে ঘুরতে হয়েছে পাঁচটা বছর, কিন্তু দেশপ্রেম বুঝতে বোস সাহেবকে কেবল খবরের কাগজ পড়তে হ'ল। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শকে শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমের পোশাক পরিয়ে তিনি ক্যানিং স্ট্রীটে সাইনবোর্ড টাঙালেন: বিএবিহার ব্যাঙ্ক। সূচনার কথা আজ তিনি চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারেন না। দু-একজন হিতৈষী বন্ধু তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মনে আছে, কিন্তু তাঁরা কে এবং কোথায় যে তলিয়ে গেলেন, ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান বোস সাহেব! প্রথম দিন চাকরি করতে এসে রমাপদও কম আশ্চর্য হয় নি। ব্যাঙ্কের কথা উঠতে আদর্শের কথা উঠল। আদর্শের কথা যখন উঠেই পড়ল তখন তিনি আচার্যের কথাও উঠাতে বাধ্য হলেন। তিনি রমাপদকে বললেন, "আচার্য প্রফুল্ল ঘোষের কথা আমি রেখেছি।"

"আজ্ঞে ঘোষ নন তিনি, রায়।"

"ও, আমি ভেবেছিলাম, আমাদের স্বজাত বুঝি!"

ঘড়িতে তিনটে বাজল। বোস সাহেব ডাকলেন, "বিপিন, বিপিন।"

"আজ্ঞে—"

রমাপদবাবুকে একবার খবর দে। হাতের কাজ শেষ করেই আসতে বলিস।"

যাচ্ছি।”

“হ্যাঁরে বিপিন, বোম্বে থেকে মেয়ের ফোটো এসেছে, জানিস?”

“না তো।” বিপিন চ’লে যাচ্ছিল।

বাড়ি গিয়ে মনে করিস। বিছানার তলায় রেখে এসেছি। মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। বিজ্ঞাপনে লিখেছিলাম, ছেলের বিদ্যা ক্লাশ সেভেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে। নগদ তার নিজের টাকা ব্যাঙ্কে আছে এক লাখ।”

“তা হ’লে ফোটো তো আসবেই বাবু।”

“তোকে আমি লাখ টাকাই দেব বিপিন। তোর মার নামে কত রেখেছি জানিস?” ড্রয়ার থেকে একটা পাশ-বই বার ক’রে তিনি বললেন, “এই ভাখ পঞ্চাশ হাজার। লয়েডস্ ব্যাঙ্কে রেখেছি। ইম্পিরিয়েলকেও আমি বিশ্বাস করি না। বোম্বের এই মেয়েটির বাবা কি করেন জানিস?”

“না, বাবু।”

“ফিল্ম তৈরি করেন। প্রডিউসার। বোধ হয নতুন বই তোলবার মতলব করছেন। তোকে সাবধান ক’রে দিচ্ছি, তোর টাকায় কখনো তাঁকে ফিল্ম তুলতে দিস নে। ফিল্ম-শিল্পের তলা পর্যন্ত আমি দেখেছি। কলকাতায় ওরা আমার ব্যাঙ্ক থেকে লাখ টাকা নিযেছে, একটা আধলাও ফেরৎ দেয নি। দেবেও না। ও-টাকা পাব না, বিপিন। ওদের সম্পত্তি সব অনেক আগে থেকে বেনামী করা রযেছে। রাস্তার কিউটা দেখেছিলি আজ?”

মাথা নীচু ক’রে দাঁড়িযে রইল বিপিন, কোন জবাব দিল না। বোস সাহেব বললেন, “কিউটার ছবি তুললে একটা ভাল ফিল্ম হ’ত। আচ্ছা, যা।”

ওপরে উঠবার রমাপদর আজ তেমন তাড়া ছিল না। সে বুঝতে পেরেছে, ব্যাঙ্কের রাজ্যে বোস সাহেব বাস করেন না। এ রাজ্যে তিনি কোন দিনও প্রবেশ করেন নি। এখানে আসেন বটে, কিন্তু মুখোশ পরেই আসেন। আসল চেহারা তাঁর রমাপদ দেখতে পায় নি। বোধ হয় আর পাবেও না। আগামীকাল ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হবে। তারপর রিসিভার বসবে। তলানিটুকু যখন চারদিকে পরিবেশন করা হবে রমাপদর তখন বয়স বাড়বে আরও তিন কি চার বছর। জেলে যাওয়ার ভয় ওর নেই। ভয় আছে বোস সাহেবের। যতদূর তাঁকে বুঝতে পেরেছে রমাপদ, তাতে ওর মনে হয়, জেলের সীমিত

আয়তনের মধ্যেও বোস সাহেবের আনন্দের কোন অভাব হবে না। কি ক'রে মনের আনন্দে থাকা যায় তার মন্ত্র জানেন ললিতবিহারী বসু।

আজও রমাপদ লিফট দিয়ে না উঠে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল দোতলায়। বোস সাহেবের প্রতি কিছুতেই ওর রাগ হয় না। ঘৃণা করবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু পারে নি। কিছুদিন আগে রমাপদ গিয়েছিল বোস সাহেবের সঙ্গে সুন্দরবনের দিকে বেড়াতে। যাওয়ার আগে রমাপদ জিজ্ঞাসা করেছিল, "সঙ্গে একটা বন্দুক নিলে হ'ত না সার্?"

"আমার বন্দুক নেই, ছুঁড়তেও জানি না।"

"আমি জানি। মাখনবাবুর বন্দুক আছে।"

আমার সঙ্গে যখন যাচ্ছ, তখন শুধু হাতেই চলো।"

"কেন সার্?"

"আমার কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এমন কি বাঘ কিংবা ভাল্লুকের বিরুদ্ধেও নয়। রিজেণ্ট পার্কের বাড়িতে আমি একটা মালাক্কা বেতের ছড়ি পর্যন্ত রাখি নি। কাউকে আমি ভয় পাই না রমাপদ।"

এমন মানুষকে রমাপদ ঘৃণা করবে কি ক'রে? অফিস-কামরায় এসে বসল রমাপদ। বোস সাহেব বসেছিলেন ওর উল্টো দিকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাঙ্কটা ফেল পড়বা আগে বিয়েটা শেষ করলে না কেন?"

বোস সাহেবের মুখোশটাকে চিনতে রমাপদর বেশি দেরি হ'ল না। সে বলল, "ফেল পড়বার পরেই বিয়ে করব।"

"মাখন গুপ্তকে তা হ'লে তুমি চিনতে পার নি। আমি তাঁকে চিনি বিশ বছর আগে থেকে। গরীব লোকদের তিনি খুবই ঘৃণা করেন।"

"ইচ্ছে ক'রে কেউ গরীব হতে চায় না। কিন্তু বড়লোক হওয়ার নেশাও আমার কোনদিন ছিল না। সার্—"

বলো, ভয় কি? আমি তো বুড়ো হয়ে গেলুম। বয়সের তুলনায় মনে হয়, সেঞ্চুরি পেরিয়ে গেছি। বলো কি বলবে।"

সাহস ক'রে রমাপদ বলল, "দশ লাখ টাকার হিসেব আমি মেলাতে পারছি না।"

"সে তো আমি সুইট্জারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছি।"

"সেটা ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"দেড় কোটি টাকার ব্যাঙ্কে দশ লাখ আবার টাকা না কি ?"

"অল্প টাকা হ'লেও তার একটা হিসেব থাকা চাই সার্।"

"লোকসান দেখাও। বজবজ না কোথায় সব ব্যাঙ্কের নামে জমি কেনা আছে, সেগুলোকে বিক্রি ক'রে দশ লাখ টাকার লোকসান দেখানো এমন কি কঠিন কাজ ? রমাপদ, এক সীট ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর আমি এক কোটি টাকার লোকসান দেখাতে পারি।"

"তা হয়তো দেখানো যায়—" রমাপদ উঠে পড়ল, "আপনার বিপদ তাতে কাটবে না।"

রমাপদর কথা শুনে বোস সাহেব হেসে উঠলেন। হাসি থামবার আগেই রমাপদ ঘর থেকে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, বোস সাহেব ডাকলেন, "শোন। কাল বেলা তিনটের সময় আমি এখানে মীটিঙ্ ডেকেছি। ডাইরেক্টাররা সবাই আসবেন।"

"কাল তিনটের সময় আমি থাকব না সার্। কাজে ইস্তফা দেব আমি।"

রমাপদ চ'লে গেল। বোস সাহেব কেবল বললেন, "কাপুরুষ! সন্তুর মেয়েকে বিয়ে করবার উপযুক্ত নও তুমি।"

দরজার বাইরে থেকে কথাগুলো শুনলো রমাপদ, কিন্তু জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে।

বোস সাহেবের মুখ থেকে গাম্ভীর্য কাটতে না কাটতে ঘরে এসে ঢুকলেন মাখন গুপ্ত। তাড়াতাড়ি হাসির ভান ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "রমাপদর বিয়ের কি হ'ল ?"

"হবে, লগ্ন এলেই বিয়ে হবে।" মাখন গুপ্ত চেয়ারে চেপে বসলেন।

এরই মধ্যে পকেট থেকে আয়না বার ক'রে বোস সাহেব নিজের মুখ দেখছিলেন। বড্ড বুড়িয়ে গেছেন তিনি। হঠাৎ এক সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "শেরিং কোম্পানীর এক বাক্স ইন্সুলিনের দাম কত ?"

চকিতের মধ্যে মাখন গুপ্তের মনে হ'ল, বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিশ্বের খবর রাখেন না কিছুই। জাপান যে আত্মসমর্পণ করেছে তিনি এখনো তা জানেন না।

মাখনবাবু বললেন, "কেন ? কার দরকার ? আপনার রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ল নাকি বোস সাহেব ?"

"বাড়লেই তো ভাল—" হাসতে হাসতে বোস সাহেব বললেন, "না বাড়লে আপনার ব্যবসা চলবে কি ক'রে?"

কোন রকম হাসির টেকনিক মাখন গুপ্তকে লজ্জা দিতে পারে তেমন হাসি হিটলারের ঠোঁটেও ছিল না। তাই উচ্চতর হাসির টেকনিক প্রয়োগ ক'রে মাখন গুপ্ত জবাব দিলেন, "তা যা বলেছেন। হাজার হাজার টন চিনির বস্তার ওপর এক নাগাড়ে পাঁচ বছর ব'সে থাকলে ব্যাঙ্কের রক্ত পর্যন্ত চিনি হয়ে যাওয়ার কথা! আর আপনি তো তার একজন সামান্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।…শ টাকার নোট পেলে শেরিং কোম্পানীর এক বাক্স ইন্‌সুলিন ছাড়া যায়। নইলে পড়তায় আসে না।"

বোস সাহেব আজ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। সব কথা ঠিক মত শুনছেন না, শুনলেও মনে রাখতে পারছেন না। মাখনবাবুর কথা শেষ হওয়ার পরে তিনি বললেন, "কিছু দিন আগে রমাপদর বাবার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ভাল মানুষ।"

হ্যাঁ, সংসারে চরিত্র ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখেন না। টাকার মধ্যে চরিত্র না থাকলে সে টাকা থাকে না। চরিত্র থাকলে টাকা আসে। তাঁর ধারণা, চরিত্র হচ্ছে কান্তলোহ।"

"কি লোহ?" বোস সাহেবের কানে যেন ধাক্কা লাগল।

"কান্তলোহ।"

"আমি তো মশাই টাটালোহ ছাড়া অন্য কিছু জানি না।"

"আজ তা হ'লে চলি বোস সাহেব। কাল আর এদিকে আসব না।" উঠবার জন্যে ব্যস্ততা দেখালেন মাখনবাবু, তারপর আবার বললেন, "ইন্‌সুলিন কখন পাঠাব? আপনার কাছে বোধ হয় শ টাকার নোট নেই?"

বোস সাহেব কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা হাজার টাকার নোট বার করতেই মাখন গুপ্ত খপ ক'রে নোটখানা ধ'রে ফেলে বললেন, "আপনার কাছে খুচরো নেই তো? আমি দিচ্ছি। আমি মশাই ছোট কারবারী, শ টাকার নোট রাখি পকেটে।" ন খানা একশো টাকার নোট বোস সাহেবের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি আবার বললেন, "রাত্রিতে ইন্‌সুলিনের বাক্সটা আপনার ওখানে পাঠিয়ে দেব। চলি। কাল যে কি হবে একমাত্র ছিন্নমস্তাই জানেন!"

"ছিন্ন কি বললেন গুপ্ত মশাই ?"

নামটা শুনে বোস সাহেব একটু ভয় পেয়েছেন ভেবে মাখনবাবু তাঁকে অভয় দেবার জন্যে বললেন, "দশমহাবিদ্যার অন্যতম দেবী হচ্ছেন ছিন্নমস্তা। নির্মুণ্ড বটে, কিন্তু তিনি সবই দেখতে পান। বোস সাহেব, মুখামৃত ফেলবার কোন পাত্র নেই ?"

"কি মৃত ? এসব কি শব্দ ব্যবহার করছেন আজ মাখনবাবু ?

বাইরে বেরুবার দরজার কাছে গিয়ে মাখনবাবু বললেন, "আজ না বললে আর বলব কবে ?"

"কেন ?"

"কাল এদিকে আসব না।"

"কাল তো আজকের চেয়েও বড় কিউ হবে। কাল আসবেন গুপ্তমশাই।"

বোস সাহেব যেন মাখনবাবুকে মিষ্টি খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

মাখনবাবু বললেন, "দেখি যদি সময় পাই—"

"সন্থর ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা তুলবেন না ?" জিজ্ঞাসা করলেন বোস সাহেব। মাখনবাবুর গলায় যেন বিচারকের সুর, "সন্থ নয় ললিত, সৌদামিনী দেবী। টাকা আমি তুলে নিয়েছি। কাল তোমার ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে।"

বোস সাহেব মাথা নীচু ক'রে বসে ছিলেন। দরজার ওখান থেকেই মাখন গুপ্ত গম্ভীর সুরে আবার বললেন, "ললিত, তুমি আজও মানুষ হতে পারলে না ! সন্থ জিতেছে।"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন বোস সাহেব। মুখ তুলতে পারছিলেন না ললিতবাবু।

মাখন গুপ্ত পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে ছুঁড়ে মারলেন বোস সাহেবের দিকে। বললেন, "টেলিগ্রাম। যুদ্ধ থেমে গেছে। থিফ, চোর …ললিত, এখনও তুমি সেই পদ্মার ধারে বাঁশী হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। লোফার ! সন্থ জিতিছে, জিতিয়েছি আমি-ই।"

বোস সাহেব এবার চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে হেঁটে দরজার কাছে গেলেন। গিয়ে বিনয়ের সুরে বললেন, "আপনি সন্থর দাদা। আপনাকে আমি অপমান করতে পারি না।"

"কত লোকের সর্বনাশ করলে তুমি!"

"আপনি কি তার অংশ নেন নি? টাকার অংশ?"

"নিলেও, আমি চুরি করি নি।"

বোস সাহেব মুখ নীচু ক'রে তবু দাঁড়িয়েই রইলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন যে, মাখনবাবু এবার চ'লে যাবেন। কিন্তু তিনি গেলেন না। বোস সাহেব তাই বললেন, "সন্তুর দাদা আপনি, আপনার কাছে মিছে কথা আমি বলব না। টাকা আমিও চুরি করি নি।"

বোস সাহেবের কথা শুনে মাখন গুপ্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িযে রইলেন কযেক মুহূর্ত। ঘৃণা ও ক্রোধের আগুনে তিনি উত্তপ্ত হযে উঠলেন। তারপর হনহন ক'রে হেঁটে চ'লে গেলেন লিফটের দিকে। বোস সাহেব অফিস ঘরে দাঁড়িয়েই শুনলেন যে, মাখনবাবু লিফটে উঠবার আগে ব'লে গেলেন, "থুঃ! নর্দমার পোকা—গাটারস্নাইপ!"

একটু বেশি রাত ক'রেই বাড়ি ফিরল রমাপদ। সুধাময়ী জেগে বসেছিলেন। যামিনী ঘুমিযে পড়েছে। তিনি বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। ছেলে তাঁর ঘরে ফিরে না এলে তিনি চোখের পাতা ফেলতে পারেন না। রমাপদ ৮০০ শো না হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে তা নিয়ে সুধাময়ীর একটুও মাথাব্যথা নেই। কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল নয়। ছেলে তাঁর বাড়ি ফিরলেই তিনি স্বামীর পাশে গিয়ে মনের সুখে ঘুমিয়ে পড়েন।

ব্যাঙ্ক নিয়ে যে গণ্ডগোল চলেছে সুধাময়ী তার খবর রাখেন। এ সম্বন্ধে রমাপদকে তিনি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। রমাপদকে কোন সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি আজকাল আর জিজ্ঞাসা করেন না। করবার প্রয়োজন বোধ করেন না সুধাময়ী। রমাপদ কেবল নিরাপদে ঘরে ফিরে এলেই হ'ল—আর তাঁর কিছু জানবার নেই।

শশধরবাবুও ঘুমন নি। খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিকেলের দিকে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। জাপান যে আত্মসমর্পণ করেছে সে-খবর তিনি জানেন। সুধাময়ীকেও জানিয়েছেন তিনি-ই। যুদ্ধ থেমে গেছে ব'লে খুশী হয়েছেন শশধরবাবু। পৃথিবীতে এবার স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। রমাপদও স্বাভাবিক হবে। বোস সাহেবের কি হবে?

কাগজখানা একদিকে সরিয়ে রাখলেন শশধরবাবু। চশমাটা চোখেই লাগানো রইল। ঘড়িতে সময় দেখলেন, রাত দশটা। রমাপদ এখনও ফিরল না। মাখন গুপ্তের বাড়ি ছাড়া রমাপদ যে অন্য কোথাও নেই, শশধরবাবু তা এক রকম ধ'রেই নিয়েছেন।

মাখনবাবুর আজ হেসে হেসে লুটিয়ে পড়বার সময়! যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে গেল ব'লে তাঁর এক পয়সাও লোকসান হয় নি! কেবল সেই জন্যেই তিনি হেসে হেসে লুটিয়ে পড়বেন না, তিনি হাসবেন আগামী কাল বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কটা ফেল পড়বে ব'লে। শশধরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "সুধা, ভেতরে এসে ব'স।"

"খোকা তো এখনও ফিরল না?"

"আজ একটু দেরি তো হবেই। হয়তো আজকেই কেবল ওর ফিরতে দেরি হবে। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সুধাময়ী ভাবলেন একটু। তারপরে বললেন, "এরপর খোকার বোধ হয় বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি হবে। ব্যাঙ্কটা কি সত্যিই ফেল পড়বে?"

শশধরবাবু মাখন গুপ্ত নন। তা ছাড়া কলকাতার সবাই তো জানে, বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করেছে। না করলেও, কাল পরশু যখন হয় করবে। কিন্তু শশধরবাবু সুধাময়ীকে বললেন, "আমার মনে হয় ব্যাঙ্ক বন্ধ হবে না।"

"বলো কি? বোস সাহেবের নামে তো দুর্নামের অন্ত নেই! ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার মূলে তো তিনিই। ওঁকে সরিয়ে দিলেই বোধ হয় ব্যাঙ্কটা বাঁচে।"

"ব্যাঙ্কটা না বাঁচিয়ে উনি সরবেন ব'লে মনে হয় না। ললিতবাবুকে দেখে তো আমার তাই মনে হ'ল।"

এই সময়ে রমাপদর গাড়ির আওয়াজ পেলেন ওঁরা। সুধাময়ী বললেন, "খোকা এলো। গ্যারেজে গাড়ি তুলছে।"

"হ্যাঁ।" বললেন শশধরবাবু।

সুধাময়ী হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরণের প্রশ্ন ক'রে বসলেন, "খোকা কেন তোমার মত হয় নি?"

হাসতে হাসতে শশধরবাবু বললেন, "আমার মত মানে কি? মাধুরীকে পছন্দ না ক'রে সে লতিকাকে ভালবাসল ব'লে বলছ?"

"না, ওদের কথা আমি ভাবছি না। খোকা কেন টাকা এত ভালবাসে? খোকা কেন তোমার মত সরল জীবন-যাপনের মধ্যে কোন আদর্শ খুঁজে পায় না? তোমার মত ক'রে ভাবতেও পারে না খোকা। রমাপদ বোধ হয় সাহেব হয়ে গেল, ভারতবর্ষের হাওয়ায় সে আর নিশ্বাস টানতে পারছে না। যাক, এখন যে সে ঘরে ফিরে এসেছে তাই যথেষ্ট।"

রমাপদ ওপরে উঠে গেল। সুধাময়ী ও শশধরবাবুর সামনে দিয়েই সে চ'লে গেল, একটি কথাও সে বলল না। সুধাময়ী বললেন, "আমি একবার ওপরে যাই।"

কাপড় জামা খুলতে দু'চার মিনিট সময় লাগল রমাপদর। যামিনী উঠে পড়েছে। টেবিলে সে খাবার সাজিয়ে দিল। রমাপদ খেতে বসবার পরে সুধাময়ী ঘরে ঢুকলেন। রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "এত রাত অবধি জেগে ব'সে আছ কেন মা?"

"তোর জন্যে, খোকা। এত রাত করলি কেন?"

"ব্যাঙ্ক থেকে বেরুতে দেরি হ'ল। গাদা গাদা কাগজপত্র, সব গুছিয়ে রেখে এলুম। আজই আমি প্রথম দেখলুম যে, ব্যাঙ্কের সবগুলো সিন্দুকেই কেবল কাগজ রয়েছে, টাকা নেই।"

"ব্যাঙ্ক ফেল্ পড়বে কি?"

"তা ছাড়া আর কি—আমি তো কাল কাজে ইস্তফা দিচ্ছি।"

শশধরবাবু ঘরে ঢুকলেন। রমাপদর পাশের চেয়ারে এসে বসলেন তিনি। বললেন, "ব্যাঙ্কের সৌভাগ্যের দিন যখন ছিল, তখন যদি তুমি ইস্তফাপত্রটা লিখে দিতে, আমি আপত্তি করতুম না রমাপদ।"

"তুমি জানো না বাবা, এ ব্যাঙ্কের কোন বন্ধু নেই। আর বোস সাহেবের বন্ধু তো নেইই, সবাই শত্রু। তিনি একেবারে একা! মানে, তুমি বুঝতে পারবে না বাবা যে, বোস সাহেব কী ভীষণভাবে একা!"

"সেই জন্যেই কাল তুমি একটু আগে আগেই ব্যাঙ্কে যাবে রমাপদ।"

শশধরবাবু উঠলেন। উঠলেন সুধাময়ীও।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বোস সাহেবকে চেনো বাবা?"

"চিনি।" বললেন শশধরবাবু।

"তোমারও কি মনে হয়, বোস সাহেব বিশ্বাসযোগ্য নন?"

"রমাপদ, বোস সাহেবের বিশ্বাসযোগ্যতা সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে খুব একটা বড় কথা নয়। কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু টাকা হচ্ছে সমাজের। শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটলেও টাকার বিলুপ্তি ঘটবে না। সেই জন্যেই আমি এদের অর্থনীতি সমর্থন করি না। কিন্তু আজ আমি অর্থনীতি কিংবা সোস্যাল ফিজিক্সের কথা ভাবছি না ভাবছি বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের কথা। তোমার পদত্যাগ করা উচিত নয়।" এই ব'লে শশধরবাবু সুধাময়ীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ আট ॥

খুব ভাল ক'রে ঘুমিয়েছে রমাপদ। ঘুম ভাঙল ভোরের দিকেই। তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। সুধাময়ী ওঠেন নি, ওঠে নি যামিনীও। জামা কাপড় প'রে গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইল না ও। বাইরের দরজা খোলা ছিল। তা হ'লে বোধ হয় বাবা ওর আগেই উঠেছেন। আজ তিনি অনেকদিন পর সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

গাড়ি নিয়ে রমাপদ চ'লে এলো লেকের দিকে। নতুন প্রভাত, নতুন আলো। দৃষ্টির অস্পষ্টতা ওর ক্রমশই কেটে যাচ্ছে। পুরনো স্বপ্নের গায়ে মরচে ধ'রে গিয়েছিল। ওর স্বপ্নর অংশ নিয়েছিল লতিকা। তা সত্ত্বেও মরচে পড়া বন্ধ করতে পারে নি রমাপদ। আজকে আবার নতুন আলোর সামনে পুরনো স্বপ্নটা স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। চোখের সামনে যা আসছে তাই ভাল মনে হচ্ছে রমাপদর। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের মধ্যে এবার একটা নতুন বিশ্ব গজিয়ে উঠছে।

মিলিটারী ব্যারাকের সামনে ভিড় জমেছে। লেকের উত্তর দিকে গাড়িটা রেখে রমাপদ হাঁটতে হাঁটতে চলল ঐ ভিড়ের দিকে। যুদ্ধ থেমে গেছে, এবার ব্যারাকগুলো ক্রমে ক্রমে খালি হয়ে যাবে।

ভিড়ের পেছনে এসে দাঁড়াল :মাপদ। সৈনিকদের জীবনেও নতুন প্রভাত এলো। দেশের জন্যে জীবন দেওয়ার আপাতত আর দরকার নেই। ওরা এখন নাচতে নাচতে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। রমাপদ দেখল, জোড়া জোড়া সৈনিক একে অপরের কোমর জড়িয়ে ধ'রে নৃত্য করছে। ওদের উল্লাসের মধ্যে নতুন জীবনের একটা সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পেল সে। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল রমাপদ পিণ্টুকে দেখে। পিণ্টু লম্বা একটা ট্রাউজার পরেছে। গায়ে চড়িয়েছে একটা গরম কোট। গলায় রুমাল বাঁধা। মাথায় একটা নাইট-ক্যাপ, এক দিকে তেরছা ক'রে টেনে দেওয়া। পিণ্টুর মুখে আধ-পোড়া সিগারেট! একজন আহত সৈনিকের নাচের পার্টনার পিণ্টু। সৈনিকের একটা হাত নেই, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পিণ্টু তার কোমর জড়িয়ে ধ'রে হল্লোড় করছে—তালের জ্ঞান এখনও হয় নি ওর।

রমাপদকে দেখতে পেয়ে পিণ্টু মুখ থেকে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলল হাতে। সাহেবকে ভাঙা ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিল যে, সে একটু পরেই ঘুরে আসবে। আহত সৈনিকের মুখে পোড়া সিগারেটের অংশটা গুঁজে দিয়ে পিণ্টু তার গলার স্বরে কোমলতা এনে বলল, "ডার-লিং !"

পিণ্টু আর রমাপদ হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলো গাড়িটার কাছে। কোন কথাই হ'ল না ওদের মধ্যে। কে আগে কথা বলবে? দোষ কার? রমাপদ না পিণ্টুর? দোষ বোধ হয় কারও নয়, দোষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। রমাপদ গাড়িতে উঠে বসল। পিণ্টু বসল ওর পাশেই।

পিণ্টু বলল, "যুদ্ধটা থামল, এবার আমি তোমার কাছে যাব।" এই ব'লে পিণ্টু কোটের পকেট থেকে রমাপদর ঠিকানা লেখা কার্ডখানা বার করল। অক্ষরগুলো সব ভেঙেচুরে গেছে বটে, কিন্তু নামঠিকানা পড়া যায়।

"এই ছাখো, তোমার নামঠিকানা রেখেছি।"

রমাপদ ভাবল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ে নামঠিকানা সব হারিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

"বাবু, তোমার কাছে যেতে পারি নি—বাবা জেল্ থেকে অসুখ নিয়ে ফিরেছে। আমাকে রোজগার করতে হ'ল।"

পিণ্টুকে অপরাধী করবার মত ভাষা খুঁজে পেল না রমাপদ। রোজগার তো মাখনবাবু আর বোস সাহেবকেও করতে হয়। বিচার ক'রে দেখবার ক্ষমতা থাকলে পিণ্টু বোধ হয় রমাপদর রোজগারের মধ্যেও সততার অভাব দেখতে পেত। সারা পৃথিবীর বড়লোকেরাও অপরাধ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেত না। ষোল আনা সততার পৃথিবীতে বড়লোক হওয়া সম্ভব নয়, ভাবল রমাপদ।

"বাবু, তুমি কি রাগ করেছ? কথা বলছ না কেন?"

"তুই বল্ পিণ্টু, আমি শুনি। কতদিন পরে দেখা হ'ল বল্ তো।"

"তা ঠিক। বাবু, তোমার মনিব্যাগটা আবার দেখা যাচ্ছে।"

কথা শুনে রমাপদ হাসল, কিন্তু পার্স টা সে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করল না।

"বাবার নাম আমি জানি এখন। জেল খেটেছিল কেন জান? অফিসের অনেক টাকা চুরি করেছিল। ঠাকুরদার কি একটা বেশ বড় রকমের দেনা ছিল—সব ঘটনা আমি জানি না। যুদ্ধ থামল, এবার সব কথা

শোনবার সময় পাওয়া যাবে। আমি এবার চলি, বাবু? সাহেবটা আবার চ'টে যাবে।"

"চটে যাবে কেন?" জানবার কৌতূহল হ'ল রমাপদর।

"কানের কাছে ওর 'ডারলিং ডারলিং' ব'লে ডাকতে হয়, গানের মত ক'রে। সারাদিন ডাকতে পারলে পাঁচ টাকা দেয়। মদ খাইনে তো, খেলে ওটা বিনে পয়সায় পাওয়া যেত। আপনার ওখানে কবে যাব বাবু?"

"ডাকবার কাজ ফুরুলেই চ'লে আসিস।"

গাড়ি থেকে নামতে তবু দেরি করছিল পিণ্টু। সামনের দিকে চেয়ে সে ব'সে ছিল। সৈনিদের হুল্লোড় হাওয়ার তরঙ্গে ভর দিয়ে ভেসে আসছিল রমাপদর কান পর্যন্ত। যুদ্ধ থেমে গেল। সৈনিকরা সব দেশে ফিরে যাবে। স্বাভাবিক জীবনের শান্ত পরিবেশে ফিরে যাবার জন্যে এরা সব নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে উঠছে। রমাপদর ব্যাকুলতাও আজ কম নয়। সেও স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে যেতে চায়।

গত তিনটে বছরের অভিজ্ঞতাও ওর সৈনিকদের চেয়ে কম ভয়সঙ্কুল ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের মত বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কটাও ছিল আর্তনাদের অন্ধকার দিয়ে ঢাকা।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, চুপ ক'রে ব'সে কি দেখছিস পিণ্টু?"

"সামনের ঐ বড় গাড়িটা।"

"কেন?"

"দেখছো বাবু, একটা হাত বেরিয়ে রয়েছে গাড়ির জানলা দিয়ে?"

"দেখছি" সামনের দিকে মুখটা তুলে ধরল রমাপদ।

টুপীটা মাথার একদিকে আরও বেশি তেরছা ক'রে টেনে দিয়ে পিণ্টু বলল, "মেয়েছেলের হাত। দেখছ বাবু, ঐ গুলো সোনার চুড়ি? এতক্ষণ ব'সে ব'সে গুনছিলাম। কনুয়ের তলা থেকে কব্জি পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটা চুড়ি আছে। বাঁ হাতটায় ক'টা আছে কে জানে। বাবু, আমি একশো পর্যন্ত গুনতে শিখেছি।" রমাপদ কিছু বলল না। একটু পরে পিণ্টুর দিকে ভাল ক'রে চাইতে গিয়ে ভয় পেল সে। কোটের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পিণ্টু কোমরের বেল্ট থেকে একটা ছুরি বার ক'রে নিয়ে এলো। বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুরির বাঁটে টিপ দিতেই ফস ক'রে বেরিয়ে এলো ছুরির

মুখটা। পিণ্টু বলল, "খাঁটি ইস্পাত। ঐ হাত-কাটা সাহেবটা এই ছুরি দিয়ে জঙ্গলে বাঘ মেরেছে।"

"তুই কি করবি এই ছুরি দিয়ে পিণ্টু?" জিজ্ঞাসা করল রমাপদ।

সামনের ঐ ভদ্রমহিলার হাতের দিকে চেয়ে পিণ্টু জবাব দিল, নাঃ, আর কিছু করবার নেই। যুদ্ধ থেমে গেল বাবু। এবার বোধ হয় চুরি ডাকাতিও সব থেমে যাবে।"

"হ্যাঁ। ছুরিটা এবার বন্ধ ক'রে রাখ।" রমাপদ কথাটা শেষ করবার আগে পিণ্টু গাড়িতে ব'সেই ছুরিটা সহসা ছুঁড়ে মারল বাঁ দিকের একটা আমগাছের গুঁড়িতে। গাছের গুঁড়িতে গিযে ছুরিটা ব'সে গেল। ভদ্র-মহিলার হাত থেকে গাছটা বোধ হয় আধ ফুট দূরে ছিল। রমাপদ ভয পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "একি তুই করলি? সর্বনাশ!"

গাড়ি থেকে নেমে পিণ্টু বলল, হাতের কাযদা বাবু। শিখতে হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ তো থেমে গেল—" গাছের গুঁড়ি থেকে ছুরিটা টেনে বার ক'রে নিয়ে এসে পিণ্টুই আবার বলল, "আর কেউ ডাকাতি করতে পারবে না। বাবু, ডাকাতি না করলে, কেউ এক হাতে পঁয়তাল্লিশটা চুড়ি পরতে পারে?

জবাব দেওয়ার সময় পেল না রমাপদ। এরই মধ্যে সামনের গাড়ি থেকে বনেদী-মার্কা একজন ভদ্রলোক নেমে এসেছেন। কোঁচানো ধুতির অংশটা ভাঁজ ক'রে তিনি আবার গুঁজে দিয়েছেন পেটের দিকটাতে। বার্নিশ করা চকচকে পাম্প্‌সুতে মচমচ আওযাজ তুলে তিনি এগিয়ে এলেন রমাপদর কাছে। বললেন, "আপনার গাড়ির নম্বরটা দিন।"

"নম্বরটা তো সামনেই লেখা রয়েছে। কিন্তু কেন?"

"ঐ ছোঁড়াটা ডাকু। আমার স্ত্রীর হাতের দিকে ছুরি তাক করেছিল। ভগবানের কৃপায লাগেনি। আমি টালিগঞ্জের থানায় এজাহার করব।" এই ব'লে ভদ্রলোকটি পিণ্টুর হাত ধরতে যাচ্ছিলেন। রমাপদ হাসবার আগে হেসে ফেলল পিণ্টু। ভদ্রলোকটি এবার রমাপদর দিকে চেয়ে বললেন, "পুলিস কমিশনার আমার হাতের লোক।"

পিণ্টু তার মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছিল। রমাপদ দেখতে পেল, দুটো সৈনিক পশ্চিম দিক থেকে বেশ দ্রুত-ভাবে এগিয়ে আসছে এই দিকে। তাই সে তাড়াতাড়ি বলল, "বউ নিয়ে

হাওয়া খেতে এসেছেন, আর বোধ হয় অপেক্ষা করা উচিত হবে না। পিণ্টু ডাকু নয়, সৈনিকদের দলের লোক। ওরা এখন ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই—" রমাপদ কথা শেষ করবার আগে ভদ্রলোকটি গাড়িতে উঠে বসলেন। রমাপদ দেখল, পিণ্টু লেকের ধারে দাঁড়িয়ে হো হো ক'রে হাসছে। পঁয়তাল্লিশটা চুড়ির আওয়াজের চেয়ে পিণ্টুর হাসির আওয়াজ অনেক বেশি শ্রুতিমধুর ব'লে মনে হ'ল রমাপদর।

পিণ্টু চ'লে যাওয়ার পরে রমাপদ ঘুরে বেড়াল প্রায় আরও এক ঘণ্টা। এবার সে হিন্দুস্থান পার্কে যাবে। চললও সে সেদিকে। লতিকা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে। আজ সত্যিই ও যাচ্ছে কেবল লতিকার সঙ্গে দেখা করতে। লতিকা ছাড়া হিন্দুস্থান পার্কে আর কেউ নেই। আজ বোধ হয় এই প্রথম যে, রমাপদ হিন্দুস্থান পার্কে যাচ্ছে কেবল নিজের তাগিদে। এতদিনকার অতীতের মধ্যে যা ছিল আজকের বর্তমানের মধ্যে তার কোন কিছুই রইল না।

এ এক নতুন মানুষ, এ এক নতুন হিসাব-রক্ষক, এ এক নতুন রমাপদ।

রাত্রে ঘুময় নি লতিকা। জেগে বসেছিল। ঘরের আলোটা জ্বলেছে সারারাত। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর খাতায় মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে লতিকা।

কেমন ক'রে লতিকা যেন বুঝতে পেরেছে যে, এবার থেকে ঘুমের প্রতি লোভ করলে আর চলবে না। জেগে থাকতে হবে। রমাপদর চেয়েও বড় অঙ্কের হিসেব মেলাবার জন্যে অবসর চাই লতিকার। রমাপদর অঙ্ক আসে কলমের মুখে, লতিকার এসেছে পেরেকের মুখে। মাধুরীদের বাড়ির দেয়ালে যে-পেরেকটা লতিকা সেদিন দেখে এসেছিল, সেটা যে কখন এবং কেমন ক'রে লতিকার কপালে এসে বিঁধে গেছে তা ও টের পায় নি।

কপালের ওপর হাত রেখে বাইরে এসে দাঁড়াল লতিকা।

পূবের আকাশ সাদা হয়ে গেল, মনের আকাশে অন্ধকার নামল লতিকার। ঝড় এলো। ঝড় না থামলে ঘুম আসবে না। এ ঝড় কখন থামবে কেমন ক'রে থামবে তা সে জানে না। ঘুমতে পারলে বেঁচে যেত লতিকা। ঘুমের তপস্যাই এখন শেষ তপস্যা ব'লে মনে হ'ল ওর।

মাখন গুপ্তও আজ তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করেছেন। চান-ঘরের কাজ শেষ ক'রে একতলায় বসবার ঘরে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন। ঘুম থেকে উঠে মাখনবাবু এক গেলাস হরলিক্স খান। তৈরি ক'রে দেয় লতিকা। আজ তিনি হরলিক্সের জন্যে তাগাদা দিলেন না, আগ্রহ দেখালেন না বিন্দুমাত্র। নীচে নামবার সময় তিনি দেখে গেলেন, লতিকা বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে প্রত্যুষের আকাশ দেখছে। মেয়েটা আদর্শবাদী, তাই আকাশের শূন্যতায় বাস্তবের সন্ধান করছে।

সাতটার একটু পরেই রাজমোহন এলো। গাড়ি ক'রেই এসেছে। লতিকা দেখল, রাজমোহন একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। যুদ্ধ থেমে গেল ব'লে রাজমোহনের কোন অসুবিধে হয় নি। রাজমোহন এসে ঢুকে পড়ল বসবার ঘরে। খবরের কাগজটা যত্ন ক'রে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন মাখনবাবু।

তারপরে মাখনবাবু অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন হি-হি—রাজমোহনও হাসল হি-হি। দু রকম সুরে একই হাসির ভঙ্গী সশব্দে ঘরের বাতাসকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলল অনেক্ষণ পর্যন্ত। কেউ কোন কথা বলছে না। কেবল হাসছে। দম ফুরলো মাখন গুপ্তরই আগে। তিনি বললেন, "আজ ফেল পড়বে।"

"আমি সব তুলে নিয়েছি"—বলল রাজমোহন। তারপর আবার খানিকক্ষণ মাখনবাবু হাসলেন। হাসল রাজমোহনও। ঘর থেকে হাসির তরঙ্গ পৌঁছল এসে লতিকার কান পর্যন্ত। হাসির মধ্যেও যে অশ্লীলতা থাকতে পারে তার প্রমাণ পেল লতিকা।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ যাবি না ক্যানিং স্ট্রীটে? আজই তো দেখবার দিন রে, রাজমোহন?"

"আমার ওখানে আর এক পয়সাও ক্যাশ নেই।

"আমি তো কোনদিনই ওখানে ক্যাশ রাখি নি।"

চুপ ক'রে রইল রাজমোহন। মাখনবাবু বুঝলেন, রাজমোহন যেন কি একটা কথা বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বলতে পারছে না। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বলবি না কি?"

"উল্টো ওরা আমার কাছে টাকা পাবে।"

"ফার্স্ট ক্লাস। ফেল পড়বে আজ। পাঁচ বছর তো চুপ ক'রে ব'সে থাক্, তারপর দেখা যাবে।"

"এখন কোন ভয় নেই তো, বাবু ?"

"পাগল না কি ? বোস সাহেব আগে জেলে যাক, আমরা দেখি। তারপর সব হিসেব-পত্তর ঠিক হবে।"

"কিন্তু রমাপদবাবুর কোন ভয় নেই তো ?"

"কিছু না। কাল রাত্রে আমি জিজ্ঞেস ক'রে সব বুঝে নিয়েছি। জেল খাটবেন বোস সাহেব একা।"

"মানুষ তো একাই শ্মশানে যায়, বাবু !" একটা বেশ বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজমোহন।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর আবার কি হ'ল রে ? গাড়ি কিনেছিস ব'লে বেলুড় যাচ্ছিস না কি ?"

"না না, বাবু। কোথা থেকে কি সব হয়ে গেল, তাই ভাবছি।"

রমাপদ ঘরে ঢুকল। লতিকা ওপর থেকে রমাপদকে দেখতে পায় নি। সিঁড়ির ওপর থেকে লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "দাদু, তুমি কি আজ হরলিক্স খাবে না ?"

মাখনবাবু রমাপদকে বললেন, "যুদ্ধের বাজারে হায়দরাবাদের নিজাম পর্যন্ত হরলিক্স পান নি ! মা লতু, রমাপদ এসেছে।"

লতিকা নীচে নেমে আসবার আগেই রাজমোহন নমস্কার ক'রে বিদায় নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় রমাপদ তাকে বলল, "তোমার কাছে আমরা অনেক টাকা পাব, সাত দিনের নোটিশ দিচ্ছি, টাকাটা দিয়ে দিয়ো। আদালতে যেতে চাই না।"

রাজমোহন কিছু বলল না, বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে কেবল মাখনবাবুকে দ্বিতীয় বার একটা নমস্কার জানিয়ে গেল।

লতিকার চেহারা দেখে আজ ভয় পেল রমাপদ। যা বলতে এসেছিল তা বোধ হয় ওকে আর বলা হবে না। ভাবতে লাগল রমাপদ। মাখনবাবু বললেন, "আজ আর আমি ক্যানিং স্ট্রীটের দিকে যাব না। তুমি যাবে না কি হে ?"

"ভাবছি আমি একবার সদাশিববাবুর কাছে যাব।"—বলল রমাপদ। আতঙ্কে দাঁড়িয়ে পড়লেন মাখনবাবু। তিনি বললেন, "যেতে হয় তুমি যাও, আমরা কেউ যেতে পারব না। এবার তিনি গুলি চালাবেন।"

"আমি একলা গেলে যদি কাজ হ'ত তা হ'লে বন্দুকের ভয় আমি করতুম না। তাঁর অনেক টাকা,—আজকের ধাক্কাটা সামলে নিতে তিনি যদি সাহায্য করেন, কাল তা হ'লে লোকের বিশ্বাস ফিরে আসবে।"

"তিনি বেলুড়ের জন্যে টাকা রেখেছেন, তোমাদের আর এক আধলাও দেবেন না। তোমার কথা শুনে আমার তো হৃৎকম্প হচ্ছে, রমাপদ। চলি, গুহ্যকালীর কি যে ইচ্ছা জানি না।"

রমাপদ তবু বলল, "চলুন না, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি? লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে যদি তিনি আজ বাঁচাতে পারেন, তা হ'লে বেলুড়ের পুণ্য অর্জন করবে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক। এটাই আমার শেষ চেষ্টা।"

কথা শুনে হাসি আর গাম্ভীর্য মিশিয়ে মাখন গুপ্ত মুখটাকে তাঁর অত্যন্ত বিকৃত ক'রে তুললেন। কথা বললেন না। লতিকা এবার বলল, "চল, তোমার সঙ্গে আমি যাব।"

ওকে যাবার জন্যেই অনুরোধ করতে এসেছিল রমাপদ। সে বলল, "তা হ'লে এক্ষুনি চল। দেরি করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। যাবে এক্ষুনি?"

"এক্ষুনি।" হরলিক্সের গেলাসটা লতিকা নামিয়ে রাখল সেণ্টার টেবিলের ওপর।

করিডোর দিয়ে হাঁটবার সময় রমাপদ বলল, "তোমার কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকব, উনি যদি টাকা নাও দেন, তবুও।"

"ঋণ আমি কোনদিন শোধ দিতে বলব না। কারণ আমার কাছে তোমার কোন ঋণ নেই। গাড়িতে উঠে কথা হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

হিন্দুস্থান পার্ক থেকে গাড়ি বেরিয়ে আসবার পরে রমাপদ বলল, "মাধুরী বোধ হয় আমাকে ভালবাসে।"

"সেটা তুমি আজ জানলে না কি?"

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে রমাপদ নতুন সুরে বলল, "তুমি এর একটা মীমাংসা ক'রে দাও।"

"তোমার অসুবিধে হচ্ছে কোথায়? তুমি তো ওকে ভালবাস না।"

"অসুবিধে তবু হয়। তোমার সঙ্গে মিশতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকে।"

"কি রকম?" লতিকা প্রায় হেসে ফেলেছিল।

রমাপদ কোন্ একটা রাস্তায় মোড় নিয়ে বলল, "হাজার মাইল দূরে

ব'সেও কেউ যদি দিনরাত তোমার কথা ভাবতে থাকে, তা হ'লে মানুষের কি একটু অসুবিধে হয় না? আর কসবা তো আমাদের বাড়ি থেকে দু মাইলও নয়। তুমি এসব মিটিয়ে দাও, লতিকা।"

"দেব। এতদিন ব'সে ব'সে কি করছিলাম? হিসেব সব মিটিয়ে দেবার চেষ্টাই করছিলাম, রমাপদ।"

খানিকক্ষণ পরে রমাপদ আবার জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি শরীর খারাপ না কি? শাড়িটা বদলে এলেই পারতে।"

"না, শরীর আমার ভাল আছে।"

"তোমায় দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।"

"রাত্রের দিকে শরীরটা হযতো সত্যিই ভাল ছিল না, কিন্তু এখন তো খুবই ভাল লাগছে।"

নিঃশব্দে রমাপদ আবার গাড়ি চালাতে লাগল। বাঁ দিকে বউবাজারের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রমাপদ বলল, "নেবুবাগান তো প্রায় এসেই গেলাম।"

"গাড়ি থামালে কেন?"—জিজ্ঞাসা করল লতিকা।

"না, থাক্। নেবুবাগানে গিয়ে কাজ নেই।" গাড়ি ব্যাক করবার চেষ্টা করতে লাগল রমাপদ।

লতিকা বলল, "পাগলামি 'রো না। সকালের দিকে দাদু বেলুড়ে যান। বেরিয়ে গেলে তাঁকে আর ধরতে পারব না।"

"তাঁর কাছে টাকা নিয়ে কাজ নেই। তোমার ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তুমি বরং মাধুরীর ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে ফেলো।"

চুপ ক'রে লতিকা ভাবল কতক্ষণ। তারপরে বলল, "আজকের দিনটাতে মাধুরীর আলোচনা থাক্। কেবল আজকের দিনটি আমায় তুমি দাও রমাপদ।" গলার সুর বদলে সে আবার বলল, "ব্যাঙ্কটাকে আজ রক্ষা করবার দিন তোমার।"

নেবুবাগানে ওরা এল। সদাশিব রায়ের প্রাইভেট কামরার দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। রমাপদ ভয় পেয়ে বলল, "সব বোধ হয় মাটি হয়ে গেল! তিনি বোধ হয় এখন বেলুড়ের রাস্তায়। এখন কি ক'রে তুমি আমায় সাহায্য করবে, লতিকা?"

"দাদু হয়তো এখনও ওপর থেকে নামেন নি। তুমি ব'স, আমি দেখছি।"

"একটু দাঁড়াও। একটা কথা বলতে তোমায় ভুলে গেছি। আমাদের বাড়ির সামনে সেই বড় ম্যাসনটায় 'সুলতা বালিকা বিদ্যালয়' উঠে এসেছে। মাধুরী সেখানে পড়াতে আসে।"

"এটাও তো আমার জানা খবর।"

"মাধুরীর ক্লাস থেকে আমার ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়।"

"তাতে আর কি, তুমি তো ব্যাঙ্কে থাক। তুমি ওকে দেখতে পাও না।"

"সেদিন দেখেছি। দুপুরবেলা বাড়িতে ভাত খেতে এসেছিলাম। জানলা সেদিন কেন যে খুলে রেখেছিলুম, আজও তার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি যদি অন্য কোন রকম মানে ক'রে নাও, তা হ'লে বরং সাহায্য তুমি আমায় না-ই বা করলে। এখনও ভেবে দেখবার সময় আছে, লতিকা।"

"গতকাল রাত্রিতে যা ভাববাব সব ভেবে শেষ ক'রে ফেলেছি। তোমার কাজটা শেষ ক'রে দিয়ে এবার বাড়ি গিয়ে চান করব। দাদু আসছেন।"

সকালের দিকে পরেশবাবু ঘরের আসবাব সব বাইরে বার ক'রে দিতে লাগলেন। তিনি নিজে হাতেই সংসারটা তাঁর ভাঙছেন। বইয়ের সংখ্যাও অনেক। লেক-বাজারের ওধার থেকে পরেশবাবু দুজন কুলী ধ'রে নিয়ে এসেছেন। তারা সাহায্য করছে পরেশবাবুকে। মাল নামাতে হচ্ছে রাস্তায়। বেলা দশটার মধ্যে লরি আসবে। আসবাবগুলো সব 'অকশানে' যাবে, পার্ক স্ট্রীটে। একটা ঠেলাগাড়িও পরেশবাবু ভাড়া ক'রে নিয়ে এসেছেন। তাতে ক'রে কিছু বই তিনি পাঠিয়ে দেবেন কসবায়। পাঠাবেন ব'লে মাধুরীকে তিনি খবর কিছু পাঠান নি আগে। রজনীকে তিনি বলেছেন, "আগে খবর দেওয়ার কিছু দরকার নেই। মাধুরী যদি বইগুলো না রাখে তবে ঠেলাগাড়িটা তুই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসিস।" সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পরেশবাবু রজনীকে দেখতে পাচ্ছেন না। সে বোধ হয় ঠেলাগাড়ি না নিয়েই কসবা গেছে মাধুরীর কাছে। সে নিশ্চয়ই মাধুরীর কাছে তাঁর নামে অনেক রকমের কথাই গিয়ে লাগিয়ে আসবে। তা আসুক, এখন আর কোন উপায় নেই। অকশানের দোকানওয়ালার সঙ্গে সব পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। লরি এলেই মাল সব গিয়ে পৌঁছবে পার্ক স্ট্রীটে।

দশ-পনেরো দিনের মধ্যে বিক্রিও হয়ে যাবে সব। লেখবার টেবিলটা তিনি নিজের কাছে রেখে দেবেন ব'লে ভেবেছিলেন। সেই সঙ্গে ওরিয়েণ্টাল টেবিল-ল্যাম্পটা থাকলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু এখন তো কেবল টেবিল আছে, ল্যাম্পটা নেই। বন্দনা ঘোষের নিজের দেওয়া জিনিস সে নিজেই গতকাল ভেঙে দিয়ে গেছে। এমন ভাবে ভেঙেছে যে, দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে টুকরোগুলো টেবিল-ল্যাম্পের অংশ। মুদ্রা কই? যে হাতে মুদ্রা থাকবার কথা, সে হাতটা ভেঙে চার টুকরো হয়ে গেছে। সবগুলো টুকরো আবার ঘরের মধ্যে নেই। বন্দনা ঘোষ তিনটে টুকরো তিন বার ছুঁড়ে মেরেছিল পরেশবাবুর মাথায়। গ্রীক-বিদ্যার ওজনে যদিও পরেশবাবুর মাথা খুব ভারী, কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি এত তাড়াতাড়ি মাথাটা নামিয়ে ফেলেছিলেন নীচে যে, বন্দনা ঘোষ একবারও চিনেমাটির খণ্ডগুলো তাঁর মাথায় লাগাতে পারে নি। কী কেলেঙ্কারীর মধ্যেই না তিনি পড়েছিলেন! খণ্ডগুলো জানলার মধ্যে দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়েছিল পাশের ফ্ল্যাটের মণি চৌধুরীর মাথায়। মধ্যবয়সী মণিবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর জানলার ফাঁক দিয়ে বন্দনা ঘোষকে দেখতেন। তিনি আহত হয়েছেন কাল।

ল্যাম্পটা যাওয়ার পরে পরেশবাবু কাল থেকে খুব হাল্কা বোধ করছিলেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন , ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। যা যা অনাবশ্যক ব'লে মনে হচ্ছে তাঁর, তিনি সে সব জিনিস এক দিকে সরিয়ে রাখছেন। রজনীর সঙ্গে এগুলো.ক কসবা পাঠিয়ে দেবেন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হ'ল। বেশ ভারী পা ব'লে মনে হ'ল পরেশবাবুর। বন্দনা ঘোষ বোধ হয় তার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আজ। তা আসুক, পরেশবাবু কোন কথাই বলবেন না। পাশের ফ্লাটের আহত মণি চৌধুরীকে তিনি কেবল দেখিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় প্রমাণের জন্যে আর অপেক্ষা করবেন না। শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারি যদি দ্বিতীয় প্রমাণের জন্যে পেড়াপিড়ি করেন, তা হ'লে পরেশবাবু তাঁকে বলবেন যে, হয় বন্দনা তাঁর মেয়ে নয়, অথবা তিনি শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারি নন।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন ল্যান্সডাউন রোডের চাটুজ্জেরা। তাঁদের পেছনে এলেন সরকারদের দুই ছেলে। তাঁদের পেছনে এলেন বড় ছেলের ভায়রা-ভাই ছবিবাবু। তারই দু মিনিট পরে এলেন সুকিয়া স্ট্রীট থেকে মধু

গাঙুলী। মধু গাঙুলী টেলিফোনে খবর পেয়েছেন ওপরতলার ফ্ল্যাটের প্রশান্ত সাহার কাছে। পরেশবাবু দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেশ বড় রকমের একটা ভিড় দেখলেন বটে, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারিকে দেখলেন না।

সরকাররা ধনীলোক। তাঁদের কোন এক বন্ধুর জন্যে ফ্ল্যাট চাইতে এসেছেন। সঙ্গে ক্যাশ এনেছেন তাঁরা। রাস্তায় চেয়ার টেবিল নামছে দেখতে পেয়ে ফ্লাট ভাড়ার জন্যে বহু লোক এসে সিঁড়ির কাছে ভিড় করেছে। এখন যদি বন্দনা ঘোষ আবার আসে, ওপরে ওঠবার জায়গা পাবে না সে। মনে মনে খুশী হলেন পরেশবাবু।

বন্দনা ঘোষ এলো না, এলেন মাখনবাবু। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি? এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম। চেয়ার টেবিল সব রাস্তায় প'ড়ে কেন?"

"বলছি, ভেতরে আসুন।" পরেশবাবু দরজা বন্ধ করলেন: আমি ভবানী-পুরের দিকে একটা সস্তার মেসে উঠে যাচ্ছি।"

"কেন?"

"বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে টাকা ছিল। বাবা যা দিয়ে গিয়েছিলেন সব গেল। আমি এখন কপর্দকহীন।" পরেশবাবু হাঁপাতে লাগলেন।

কিন্তু বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক তো ফেল পড়ে নি।"

"পড়ে নি?" পরেশবাবু কুলীর হাত থেকে ছোট একটা শেল্‌ফ্‌ টেনে নিয়ে মেঝেতে বসিয়ে রাখলেন।

মাখনবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, "ব্যাঙ্ক ফেল পড়বে আজ।"

"তা হলে তো একই কথা হ'ল।—শেল্‌ফ্‌টা নিয়ে যাও।"

পরেশবাবুর ভাঙ্গা সংসার দেখতে লাগলেন মাখন গুপ্ত। ভাল লাগছে দেখতে। মাধুরী ভেবেছিল, মামার ওপর টেক্কা দিয়ে সে ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাটে এসে ঘর বাঁধবে। মামার সাহায্য ছাড়া মাধুরীর সাধ্য নেই ঘর বাঁধবার। সত্তুকে তিনিই জিতিয়েছেন, মাধুরীকেও জেতাবেন মাখনবাবু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যা মাইনে পান তা দিয়ে সংসারটা কি চালাতে পারবে না মাধুরী?"

অবাক হয়ে পরেশবাবু বললেন, "মাধুরী? মাধুরী কে?"

"ঐ যে আপনার কাছে ইতিহাস পড়তে আসে।"

"ওদের ওখানে তো বইগুলো সব রাখতে পাঠাব। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, সেখানে গুদোমের মত খানিকটা জায়গা পাওয়া যাবে কি না?"

"বিয়ের পরে জায়গার আর অভাব হবে না, অধ্যাপক।"

"বন্দনার সঙ্গে বিয়ে আমার ভেঙে গেছে। সে মশাই টেবিল-ল্যাম্পটা ভাঙবার কায়দা যদি আপনি দেখতেন! যাক, বাঁচা গেছে। বন্দনা আর আসবে না। মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে পৌনে দু শো টাকা পাই। বন্দনা ভালই করেছে। আপ্‌নি একটু সরুন তো, কুলীরা এবার বড় টেবিলটা নামাবে। এতগুলো টাকা আমি নষ্ট করলুম, এর পরে বন্দনাকে আমি আর বিয়ে করি কি করে?"

ব্যাপারটা বুঝতে মাখনবাবুর আর কষ্ট হ'ল না। অধ্যাপকের জীবনে মাধুরী প্রবেশ করতে পারে নি। তিনি সব ভুল বুঝেছেন। অতএব এখানে আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তিনি বললেন, "সময় হ'ল, যাই। দশটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। আমার বোধ হয় ট্যাক্সি চেপেই ক্যানিং স্ট্রীটে যেতে হবে। আপনি যাবেন নাকি, অধ্যাপক?"

"কোথায়?"

"বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে।"

"না, সময় নেই। এদিকে এখনও অনেক কাজ বাকি। রজনী এখনও ফিরল না।"

মাখনবাবু নীচে নেমে এসে দেখলেন, ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার জন্যে লোকের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে।

সদাশিব রায় রমাপদ আর লতিকাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সুপ্রভাত। তোমরা বুঝি খুব ভোরে উঠেছ?"

লতিকা বলল, আমার তো ভোরে উঠবার অভ্যাস ছিল না, দাদু।"

"তবে আজ উঠলি কি ক'রে?"

"কাল সারা রাত ঘুম আসে নি ব'লে? তোমার সঙ্গে কথা ক'টা শেষ ক'রে বাড়ি গিয়ে চান করব।"

"ফরাশের ওপরে উঠে আয়। মুখোমুখি হয়ে বসি আমরা।"

লতিকা উঠে বসল ফরাশের উপর। রমাপদ প্যাণ্ট প'রে এসেছে। সে চেয়ারেই বসে রইল। হাত-পাগুলো যেন ওর পাথরের মত ভারী হয়ে উঠছে। জিভ আসছে আড়ষ্ট হয়ে। রমাপদর ভাগ্য ভাল, আপাতত ওকে কথা বলতে হ'ল না।

লতিকা বলল, "বিশ্ববিহার ব্যাঙ্ক আজ ফেল পড়বে, দাদু।"

"তোর তাতে কি? তোদের তো এক পয়সাও লোকসান হবে না রে, লতু।" সদাশিব রায়ের মুখের রঙ বদলাতে লাগল, "লোকসান হবে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর।"

"আমি তো একজন লোকেরই লোকসান ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না—"

লতিকা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বলল না। সদাশিব রায় বললেন, "তোর দাদুর তো অনেক টাকা। রণজিত বিয়ে করবে না, প্রভাসের আর কোন সন্তানও হবে না, সব পাবি তুই। রমাপদকে মাখনবাবু ব্যাঙ্কে কাজ করতেও দেবেন না। আমি তো রমাপদরও কোন লোকসান দেখতে পাচ্ছি না, লতু।"

পর পর দুবার হাই তুলল লতিকা। ওকে হাই তুলতে দেখলেন সদাশিব রায়। তিনি তাই লতিকার দিকে একটা তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে বললেন, "তোর একটা আশ্রয় চাই, এটা নে।"

"ঘুমিয়ে পড়ব তা হ'লে। তোমার কাছে কাজটা শেষ ক'রে ঘুমতে যাব।" লতিকা তবু তাকিয়াটা টেনে নিলে নিজের দিকে, "দাদু, কোটি লোকের লোকসানের কথা ভাববার মত মন আমার বিস্তৃত নয়। আর আমার মাথার খবর তো তোমরা জানো। দুবার যখন আই. এ. পরীক্ষায় ফেল করলুম, মনে হয়েছিল আই. এ. পরীক্ষার চেয়ে কঠিনতর পরীক্ষা পৃথিবীতে বুঝি আর কিছু নেই। সেই ভুল আমার ভেঙেছে।"

"বেলা বাড়ছে, যা বলবি তাড়াতাড়ি বল্, লতু।"

"আমি এসেছি তোমার কাছে ব্যাঙ্কটা বাঁচাবার জন্যে। ব্যাঙ্কটা যদি ফেল পড়ে তা হ'লে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে রমাপদর। ওর স্বপ্নটা ভাঙবে। রমাপদর স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমি আজ নিকৃষ্টতম উপায় অবলম্বন করতেও রাজী। তোমার কাছে যখন আজ আমি এসেছি, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নিকৃষ্টতম পথেই আমি পা বাড়িয়েছি।" লতিকা তাকিয়ার

গায়ে হেলান দিয়ে বসল। চোখের পাতা ওর বুজে আসছে। সদাশিব রায় অবাক হয়ে প্রভাসের মেয়েটাকে আজ দেখছেন। প্রভাসের মেয়ে ব'লে যেন আজ আর ওকে চেনাই যাচ্ছে না।

"দাদু, আমায় তুমি কথা দাও, রমাপদর স্বপ্ন তুমি ভাঙতে দেবে না।··· কত টাকা দরকার, ওর কাছে তুমি জেনে নাও। দশ, বিশ, ত্রিশ লাখ না কত, জেনে নাও। লাখই বলছি, কোটি তুমি দিতে পারবে না।"

"যদি পারি ?" সদাশিব রায়ের গলায় আর ঠাট্টার স্বর নেই।

"তুমি পারবে না দাদু। শিল্প-সমৃদ্ধ বাংলার স্বপ্নই তো রমাপদর স্বপ্ন। দাদু, তোমাদের টাকা আছে, স্বপ্ন নেই। তোমার নিজের কোম্পানির তেল তোমরা নিজেরা খাও না। তোমরা বেলুড়ে যাও পুণ্য অর্জন করতে। ভেজাল তেল থেকে প্রচুর মুনাফা আসছে ব'লেই তো সেখানে তোমরা যাও। কিন্তু রমাপদর স্বপ্নের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। সে বেলুড়ের বাড়ি তৈরি করবার জন্যে টাকা চায় না, ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চায়।"

সদাশিববাবু মুখ ঘুরিয়ে চাইলেন রমাপদর দিকে। রমাপদ এখনও মুখ নীচু ক'রে ব'সে আছে। ওর সামনে এখন লতিকা নেই, নেই সদাশিব রায়ও। ব্যাঙ্কের সামনের সেই লম্বা কিউটা যেন বিষাক্ত সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে, রমাপদ একটু অন্যমনস্ক হ'লেই ছোবল মারবে। সাপটার ছোবল থেকে বাঁচতে হ'লে আজ সদাশিব রায়কেও দরকার নেই, দরকার তাঁর টাকার।

লতিকা ঝিমিয়ে পড়ছে। এবার রমাপদ মুখ তুলল। লতিকাকে ঝিমিয়ে পড়তে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল ও। এখনও কাজ শেষ হয় নি, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে ফুটো জাহাজ ভাসছে, এখনও সে বন্দরে পৌঁছতে পারে নি। লতিকাকে জাগিয়ে রাখতে হবে, দু-চার মুহূর্তের কাজ—কাজ মিটে গেলে ঘুমবার জন্যে সময়ের অভাব হবে না। সময় কি ? কাজই সময়। কাজ না থাকলে সময়ের কোন দাম থাকে না। সময়ের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। লতিকা ঝিমিয়ে পড়ছে, ওষুধ খাইয়ে লতিকাকে কয়েকটা মুহূর্ত কেবল জাগিয়ে রাখবার জন্যে ওষুধ খুঁজতে লাগল রমাপদ।

সদাশিববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে লতু, ব্যাপারটা কি ? চোখের নীচে কালি পড়েছে, কপালের চামড়া গেছে কুঁচকে ?"

লতিকা কিছু বলবার আগে রমাপদ বলল, "সবই আমার জন্যে। অপরাধ সব আমার। এমন ক'রে কাউকে কারো জন্যে করতে দেখি নি।"

ওষুধ প্রয়োগ করছে রমাপদ। হঠাৎ সে আবার ব'লে উঠল, "লতিকা বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়ল !"

"বুড়ো বয়সে এমন দৃশ্য দেখব ব'লে আশা করি নি।"—সদাশিব রায়ই জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছিস লতু ?"

"না, দাদু। হিসেব মিটিয়ে দেবার জন্যে মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠেছে। রূপ নেই, গুণ নেই—মনটাই কেবল ছিল। কিন্তু এ মনটার যে এত বেশি অস্থির হওয়ার ক্ষমতা ছিল, আমি তা জানতুম না। দাদু, আমি আর পারছি না। তুমি কথা দাও—রমাপদকে তুমি টাকা দেবে। লক্ষ লক্ষ বাঙালীর হিসেব আমি জানি না। আমি রমাপদর হিসেব জানি। ওর বেলুড় কিংবা ভগবানের ওপর বিশ্বাস নেই। সোনার বাংলার নতুন সওদাগর এই রমাপদ সেন। এবার তুমি কি করবে, দাদু।"

"টাকা দেব।"

ঘুমিয়ে পড়েছে লতিকা, ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বিরাট মোটা দেহটাকে সদাশিব রায় ফরাশের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে অতি কষ্টে হেঁটে চ'লে এলেন অফিস-ঘরে। ইশারা ক'রে রমাপদকেও ডাকলেন তিনি। বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন সদাশিব রায় নিজেই।

অফিস-ঘরে এসে রমাপদ বলল, "আজকের ধাক্কাটা সামলে নিতে পারলে কাল সবারই বিশ্বাস ফিরে আসবে।"

সদাশিববাবু ড্রয়ার থেকে কতকগুলো কাগজপত্র বার ক'রে বললেন, "ললিতবাবু কাল এসেছিলেন।"

"কিন্তু লতিকা না এলে কিছুই তো হ'ত না !"

কাগজগুলো খুলতে খুলতে সদাশিব রায় বললেন, "আজ বেলা তিনটের সময় ডাইরেক্টারদের মীটিং বসবে। বড় অঙ্কের টাকা আমি ললিতবাবুকে দিয়ে দিয়েছি। তিনি ইম্পিরিয়েল হয়ে তবে আজ অফিস যাবেন। আমি যাব বেলা তিনটের সময় বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে।"

রমাপদর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। সে ভাবল, লতিকা ঘুমচ্ছে

ঘুমোক। কাল সারাটা রাত সে জেগে ব'সে ছিল। সদাশিববাবু বলতে লাগলেন, "ললিতবাবু হিসেবের এই ফর্দটা কালই দিয়ে গেছেন। এই দলিলগুলোও পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর লুকনো টাকার পুরো হিসেব পর্যন্ত পেয়েছি। ভারতবর্ষের সব ক'টি বড় বড় ব্যাঙ্কেই তিনি টাকা রেখেছেন, রাখেন নি কেবল বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে।" বাঁ দিকের ড্রয়ার থেকে অনেকগুলো পাস-বই বার ক'রে সদাশিববাবুই আবার বললেন, "তাঁর যা সম্পত্তি ছিল, স্থাবর অস্থাবর সব—বিপিনের মায়ের টাকাটা বাদে, স-ব তিনি লিখে দিয়ে গেছেন। নিজের জন্য একটা গাড়ি পর্যন্ত রাখেন নি। এই সব ব্লু-বুক। গাড়িগুলো যে তিনি ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রি করে দিলেন তার চিঠি এগুলো। পরের টাকার ধর্ম ললিতবাবু এতদিনে বুঝতে পারলেন।"

রমাপদর মুখে এবার হাসি এলো।

সদাশিববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "হাসছ যে?"

"বোস সাহেবের চরিত্র ঠিক সে রকম নয়। পরের টাকার ধর্ম বুঝতে না পারার জন্যে নয়, টাকার প্রতিই তাঁর লোভ নেই।"

"তুমি কি বলতে চাও, রমাপদ?"

"সংসারে বাস ক'রেও সংসারের মধ্যে ডুবে যান নি বোস সাহেব। জপতপ করেন না বটে, মনে মনে তিনি তপস্বী। আমিই কেবল তাঁর মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাই নি।"

সদাশিববাবু প্রতিবাদ কিছুই করলেন না, কেবল বললেন, "হয়তো তোমার কথাই সত্যি। আজ বেলা তিনটের পরে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার নেব আমি। খাতাপত্রের হিসেব আমি দেখতে চাইব, রমাপদ।"

"আমি সব ঠিক ক'রে রাখব।" উঠে পড়বার জন্যে ছটফট করছিল, সে। উঠলও। সদাশিব রায় বললেন, "ব্যাঙ্কের খরচ এবার অনেক কমিয়ে দিতে হবে। তোমার মাইনে আর পাঁচ শো টাকার বেশি থাকবে না, রমাপদ।"

সদাশিববাবুর তেলের কলের ম্যানেজার ঘরে ঢুকলেন। রমাপদ স'রে গেল বাইরের দরজার দিকে। বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে। তারপর একটু দাঁড়িয়ে গেল সে। সদাশিববাবুর কথাগুলো শুনতে লাগল ওখান

থেকে। তিনি তাঁর ম্যানেজারবাবুকে বলছিলেন, "যে তেল আমরা নিজেরা খেতে পারি নে, সে তেল আমরা বেচবও না, ম্যানেজারবাবু। বাংলা দেশ যদি না বাঁচে, তা হ'লে ঘানি চালাব কার জন্যে? ম্যানেজারবাবু, রায় অ্যাণ্ড সন্সের কোন তেলের টিনেই যেন আর ঠাকুরের ছবি কিংবা নাম না থাকে। ব্যবসার মধ্যেও কৃষ্টি থাকা চাই।"

সূর্য ওঠবার অনেক আগে থেকে ব্যাঙ্কের সামনে কিউ হয়েছে। ব্যাঙ্কের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রমাপদ। সামনের বড় গেট দিয়ে ঢুকতে পারল না। ওখানে এক ইঞ্চি ফাঁকা জায়গা নেই। রমাপদ লক্ষ্য করল, কিউটার মধ্যে আজ ভাড়াটে লোকও অনেক দাঁড়িয়েছে। বিধবা এবং অন্যান্য লোকের চেয়ে তাদের ভিড়ই বেশি ব'লে মনে হ'ল রমাপদর। টাকা ওরা এখানে কেউ রাখে না, ওরা এসেছে কেবল কিউটাকে লম্বা করবার জন্যেই।

হাতের আস্তিন গুটিয়ে রমাপদ এসে দাঁড়াল কাউণ্টারের পেছনে। নিজের কামরায় গিয়ে গায়ের কোটটা সে কেবল খুলে রেখে এসেছে। কাউণ্টারের পেছন থেকে লেজার-কীপারদের সে বলল, "টাকা দিতে আজ যেন ভাই দেরি না হয়। আজ আমরা কাউকে একটা কথাও বলতে দেব না।"

রমাপদর কথা শুনে আশপাশের সব কর্মচারী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। সব চেয়ে বেশি হাসলেন ছ নম্বর লেজারের হরি চক্কোত্তি। বিয়ে তো তাঁর পাকা হযেই গেছে।

খাঁচার মধ্যে অমূল্যধন আজও তার জায়গায় গিয়ে বসল। আঙুলগুলো সে আজ বেশি ক'রে নাচাচ্ছে। মনে মনে মন্ত্রের মত কেবল সে ব'লে যাচ্ছে, আসবে, আসবে। রমাপদ খাঁচার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ওখানে ব'সে কি করছ, অমূল্য।"

"টাকা জমা নেবার জন্যে অপেক্ষা করছি সার্।"

"না, দশটা টাকাও কেউ আজ জমা দিতে আসবে না। তুমি আজ এখানে এসে হরিবাবুদের সাহায্য কর।"

বেলা দশটার সময় গেট খোলা হ'ল। টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হতে বিলম্ব হ'ল না। কাউণ্টারের পেছনে রমাপদ নিঃশব্দে পায়চারি করতে

লাগল। টাকা-জমা-নেবার কর্মচারীরাও সবাই টাকা-দেবার কাউণ্টারে এসে ব'সে পড়েছে। বসিয়েছে রমাপদই। টাকা জমা নেবার দিন আজ নয়, টাকা ফিরিয়ে দেবার দিন।

শশধরবাবুও বেলা দশটা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছেন উল্টো দিকের ফুটপাতে। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ছতলা বাড়িটা তিনি আজ প্রথম দেখলেন। রাস্তার ভিড় দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য বোধ করলেন। এমন দিনে রমাপদ নিশ্চয়ই তার পদত্যাগ-পত্র পেশ ক'রে নি বোস সাহেবের কাছে। বাংলার এ কি ছবি তিনি দেখছেন আজ? ছতলা গাড়িটার সঙ্গে লাইব্রেটার মিল নেই কেন?

ছাতি মাথায় দিয়ে মাখন গুপ্ত এসে শশধরবাবুর পাশে যখন দাঁড়ালেন তখন প্রায় বারোটা বাজে। শশধরবাবুকে বললেন তিনি, "এই যে সেন মশাই, নমস্কার।"

"এই যে গুপ্ত মশাই নমস্কার। বহু দিন দেখা হয় না আপনার সঙ্গে।"

"হে-হে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম।—রমাপদ বোধ হয় আজ আসে নি? আমি কাল রাত্রিতেই ওর ইস্তফাপত্রটা ভাল ক'রে ড্রাফ্‌ট্‌ ক'রে দিয়েছি। এই ভাল হ'ল—অল্প বয়সে জাল-জুয়াচুরির সঙ্গে জড়িয়ে গেলে কি সর্বনাশই না হ'ত! আপনি কি দেখতে এসেছেন, সেন মশাই?"

"চরিত্র, জাতি-চরিত্র।"—বললেন শশধর সেন।

"ভাঙছে নিশ্চয়ই?"

"না, গ'ড়ে উঠেছে।"

"একটু দাঁড়ান তো—" ছাতাটা বন্ধ ক'রে মাখন গুপ্ত কিউটার সামনের দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখছেন মাখনবাবু? চরিত্র না কি?"

"না, মাধুরীকে দেখছি। মাধুরীর কথা মনে আছে আপনার? ব্যাপার কি? কিউটার সামনে মাধুরী গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেন? সত্বর টাকা তো অনেক দিন আগেই তুলে দিয়েছি। একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।" মাখন গুপ্ত ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। ফিরে এসে বললেন, "ধরতে পারলুম না, মাধুরী ভেতরে ঢুকে গেল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, সেন মশাই। আপনি কিছু বুঝলেন?"

"না।"—জবাব দিলেন শশধর সেন।

সাড়ে দশটা নাগাদ বোস সাহেব পৌঁছলেন এসে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে। প্রতিদিনকার মত পেছনের ফটক দিয়ে এসে দোতলায় উঠলেন। অন্য দিন বিপিন আসে সঙ্গে। বড় ফোলিও-ব্যাগটা বিপিনেরই হাতে থাকে। আজ ফোলিও-ব্যাগটা নেই, বিপিনও নেই। বিপিন ব্যাঙ্কে এসেছে বাসে চেপে, দশটার অনেক আগে। রমাপদ ভেবেছিল, ব্যাঙ্কে এসে বোস সাহেব ওকে ডাকবেন। কিন্তু ডাকলেন না। বিপিনের কাছে রমাপদ প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পরেই জিজ্ঞাসা করছে, "সাহেব আমায় ডাকেননি ?"

"না।"

বোস সাহেব তাঁর প্রাইভেট কামরায় এসে ঢুকেছেন। রাস্তার দিকের জানলাটা খুললেন তিনি। ক্যানিং স্ট্রীটের পিচ-ঢালাই রাস্তা তিনি দেখতে পেলেন না। লোকের ভিড়। কিউটা বিরাট একটা লম্বা সাপের মত আঁকা-বাঁকা হয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটের চৌ-রাস্তা পার হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকে চ'লে গেছে। বোস সাহেব ঝুঁকে দাঁড়ালেন। কিউটার শেষ তিনি দেখতে পেলেন না। বোধ হয় হাওড়া পোলের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে। নিশ্চিন্ত বোধ করলেন ললিতবিহারী বসু।

বেলা গড়িয়ে চলল। রোদের বেশি তাপ নেই। আকাশ পরিষ্কার। কালবৈশাখীর সময় এটা নয়। পায়চারি করতে লাগলেন বোস সাহেব। ভাবতে লাগলেন রমাপদর কথা। একবারও সে ওপরে এলো না। পদ-ত্যাগ-পত্রটা বোধ হয় সে ছিঁড়ে ফেলেছে। ভাল ছেলে রমাপদ।

অমূল্যধন খাঁচা থেকে বেরয় নি। আঙুলের ব্যাণ্ডেজটা বারে বারে খুলছে আবার লাগাচ্ছে। বেলা খানিকটা বাড়তেই সে একটু স্থির হয়ে বসল। বাইরের ফটকটার দিকে ভুল ক'রেও সে একবার দৃষ্টি দেয় নি। পেছন দিকে সে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। মিনিট গুনছে অমূল্যধন—লোহার কলাপ্‌সিবল গেটটা কোন্ সময় যে ফস ক'রে বন্ধ হয়ে যাবে তা সে জানে না। বন্ধ হওয়ার মুহূর্তটা সে দেখতে চায় না। কিন্তু দু ঘণ্টা তো হ'ল—গেট বন্ধ হ'ল না। রমাপদর মুখ দেখে মনে হ'ল অমূল্যধনের যে, গেটটা বন্ধ করবার হুকুম দেবার জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা আসে নি।

বন্ধ করবার হুকুমের কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই তাঁর মুখে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যধনের ক্ষিধে বাড়তে লাগল।

কিউটার মুখ থেকে মাধুরী ঢুকে পড়ল ব্যাঙ্কের মধ্যে। মাধুরীর হাতে চেক নেই। পেছন থেকে একজন ভদ্রলোক বললেন, "চেক-বই আনতে ভুলে গেছেন বুঝি? আমায় তা হ'লে রাস্তা দিন।"

মাধুরী স'রে দাঁড়াল। কাকে খুঁজছে মাধুরী?

কাউণ্টারের ওপাশ থেকে রমাপদ দেখতে পেল মাধুরীকে। সে এগিয়ে এসে বলল, "আপনি? আপনার এখানে কি দরকার? আপনার মায়ের টাকা তো আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। আপনি কেন এসেছেন?"

"একটা অ্যাকাউণ্ট খুলতে।"

বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের বড় হল-ঘরটায় চাপা গুঞ্জন উঠল। অবিশ্বাসের বড় বড় বটগাছগুলো বিশ্বাসের ঝড়ে খড়কুটোর মত উড়তে লাগল চতুর্দিকে। ঝড় এলো। মাধুরী হাত বাড়াল রমাপদর দিকে। অনুরোধ করল, "অ্যাকাউণ্ট খোলবার একখানা ফর্ম্ দিন আমায়।"

ঝড়ের গতি ভেতর দিকে। কাউণ্টারের ওপর থেকে কর্মচারীরা সব ঘাড় ফিরিয়ে মাধুরীকে দেখছে। দেখবার জন্যে ওপাশের সব পাওনাদারদের মধ্যেও ঠেলাঠেলি প'ড়ে গেল। মাধুরী তখন এ পাশে এসে ব'সে পড়েছে একটা খালি চেয়ারে। পরিশ্রান্ত মাধুরী। ভোর আটটার সময় এসে কিউতে দাঁড়িয়েছে। এখানে পৌঁছতে ওর চার ঘণ্টা লাগল।

মাধুরী দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল, "একটা ফর্ম্ দিন।" রমাপদর এবার চেতনা ফিরে এসেছে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, "বিপিন, বিপিন—অ্যাকাউণ্ট খোলবার একটা ফর্ম্ নিয়ে এস।"

রমাপদর গলার আওয়াজ আজ এত উঁচুতে উঠল যে, ভারতবর্ষের ময়দানে দাঁড়িয়ে কোন নেতাও তাঁর গলার আওয়াজ এত উঁচুতে তুলতে পারেন নি।

ফর্ম্ হাতে ক'রে নিয়ে এসেছে অমূল্যধন। ফর্ম্টা মাধুরীর হাতে দিয়ে সে রমাপদকে বলল, "বলি নি সার্, আজ আমি টাকা গুনব, টাকা আসবে!"

রমাপদর মুখে ভাষা নেই।

মাধুরী টাকা বার ক'রে টেবিলের ওপর রাখল। টাকার দিকে দৃষ্টি দিল না রমাপদ। কি যেন সে ভাবছে। অমূল্যধন সই-করা ফর্ম্টা রমাপদর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি এটা দেখুন সার্, আমি টাকা গুনছি।"

টাকা গুনবার কৌশল আর কৃতিত্ব দেখাতে লাগল বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ছোট ক্যাশিয়ার। ডান হাতের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বুড়ো আঙুলটা সে এমন দ্রুতভাবে নাড়াতে লাগল যে, মাধুরী তন্ময় হয়ে অমূল্যধনের আঙুলের দিকে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক যেন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কে নেই, নিজামের রত্নভাণ্ডারে ঢুকে তিনি মণিমুক্তার সংখ্যা যাচাই করছেন।

গোনা শেষ হওয়ার পরে অমূল্যধন বলল, "তিন শো পঁচানব্বই টাকা আট আনা।"—এই বলে সে আধুলিটা কায়দা ক'রে টোকা মেরে তুলে ফেলল প্রায় সিলিং পর্যন্ত। তারপর নিজেই আবার লুফে নিয়ে বলল, 'খাঁটি জিনিস।"

লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করল মাধুরী।

চান শেষ ক'রে পুজো করতে বসেছিলেন সৌদামিনী দেবী। পুজো শেষ ক'রে যখুন উঠলেন, মাধুরী তখন বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেল, কেন গেল, মাধুরী কিছুই ব'লে যায় নি। সৌদামিনী দেবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ব্যাঙ্ক নিয়ে কি একটা গোলমাল চলছে ব'লে তিনি শুনেছেন। কিন্তু কি যে গোলমাল তা তিনি জানেন না।

রান্নার কাজ শেষ ক'রে কাপড় বদলালেন সৌদামিনী দেবী। বোম্বে মিলের পাতলা ফিনফিনে কাপড়খানা গেল-পুজোয় মাখনবাবু তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ব্যবহার করবার সুযোগ পান নি তিনি। আজ যেন সুযোগ এসেছে ব'লে মনে হ'ল তাঁর।

ঘরে তালা লাগিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। রাজমোহনের গেটের সামনে ভিড় নেই। গেটটা বন্ধই আছে আজ। সৌদামিনী দেবী চলেছেন হিন্দুস্থান পার্কে। দাদার কাছে গেলে হয়তো সব দিককার সব খবরই জানতে পারবেন তিনি। খবর জানবার জন্যে মনটা তাঁর ক্রমশই ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

মাখনবাবুর বাড়ির গেটও আজ খোলা। তালা লাগানো নেই। সৌদামিনী দেবী ভেতরে ঢুকলেন। একতলায় কেষ্টর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "লতিকা কোথায় রে?"

"তিনি তো সেই ভোরে রমাপদবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। এখনও ফেরেন নি।"

"বাবু কোথায় ?"

"তিনি গেছেন ক্যানিং স্ট্রীটে।"

"ক্যানিং স্ট্রীটে ? সেখানে কি ?"

"ব্যাঙ্ক ফেল পড়া দেখতে গেছেন।"

"কোন্ ব্যাঙ্ক ? রমাপদবাবু যেখানে কাজ করেন ?"

"বোধ হয় তাই।"—একটু বিরক্তির সুরে কেষ্টই আবার বলল। "মানুষের সর্বনাশ দেখতে আমাদের বুড়ো বাবু বড্ড ভালবাসেন।"

আরও খবর জানবার জন্যে সৌদামিনী দেবীর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন, হিন্দুস্থান পার্কে আর কোন খবর পাওয়া যাবে না। কেষ্টকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যানিং স্ট্রীটে কেমন ক'রে যাওয়া যায় ?"

"পাঁচের-এ বাসে।"

"তুই জানিস ?"

"জানব না ? রমাপদবাবুর জন্যে কতদিন খাবার নিয়ে গেছি। চলো, তোমায় আমি বাসে তুলে দিয়ে আসছি। তুমিও সেখানে ব্যাঙ্ক ফেল পড়া দেখতে যাবে বুঝি ?"

"ব্যাঙ্ক ফেল পড়বে না। আমার মন বলছে, সবারই কল্যাণ হবে। চল্ আমায় তুলে দিয়ে আয়।"

কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে সৌদামিনী দেবী গেলেন পাঁচের-এ বাস ধরতে। বেশি দূরে যেতে হ'ল না। সামনেই বাস দাঁড়ায়। বাসে ওঠবার আগে কেষ্ট বলল, "ক্যানিং স্ট্রীট আর স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে নামিয়ে দিতে ব'লো। তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারতুম, কিন্তু মা ঠাকরুণ আজ সকালবেলা থেকেই জেগে ব'সে আছেন। অন্য দিন এত বেলা অবধিও ঘুমন। তা হ'লে যাই ?"

"যা।" বাসে উঠলেন সৌদামিনী দেবী।

পার্ক স্ট্রীটে চেয়ার-টেবিল সব পাঠিয়ে দিতে পরেশবাবুর প্রায় বেলা এগারোটা বাজল। রজনী ফিরে এসেছে। কসবা সে যায় নি। দেশপ্রিয় পার্কের পূব দিকের একটা বেঞ্চিতে ব'সে সময় কাটিয়ে সে ফিরে এসেছিল এক ঘণ্টা পরেই। সে এসে বলেছিল "মাধুরীদিদিদের ওখানে জায়গা নেই।"

"আমার জন্যে সংসারের আজ কোথাও জায়গা নেই, রজনী।"

"পাগলামি ক'রো না, জিনিস পত্র সব আজ থাক্। পরে সব ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে। লোকে বলে, কলকাতায় বউ ছাড়লে বউ পাওয়া যায়, কিন্তু ফ্ল্যাট ছাড়লে ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। ফ্ল্যাট নেওয়ার জন্যে রাস্তায় ভিড় দেখলে না, দাদাবাবু?"

রজনীর সঙ্গে পরেশবাবু আর তর্ক করেন নি। পার্ক স্ট্রীটে জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেওয়ার পরে হঠাৎ তাঁর মাখন গুপ্তের কথা মনে পড়ল। তাঁর মুখেই পরেশবাবু শুনেছেন যে ব্যাঙ্কটা এখনও ফেল পড়ে নি। সেদিকে একবার গেলে কেমন হয়? ব্যাঙ্ক যদি ফেল হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে টাকা তিনি পাবেন না। আর ব্যাঙ্ক যদি চালু থাকে, তা হ'লে তো তাঁর টাকা তোলার দরকার নেই। চেক-বইটা ঘরেই রেখে গেলেন। রজনীকে বললেন তিনি, "আজকে আর ফ্ল্যাটটা ছাড়ব না। আমি একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসছি। ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে রাখ্। ঘরে আসবাব নেই ব'লে কেউ আবার ফ্ল্যাটটা দখল ক'রে না বসে। কাউকে দরজা খুলে দিস না।"

ক্যানিং স্ট্রীটে এসে পরেশবাবু যখন পৌঁছলেন, তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বেজেছে। রাস্তার ভিড়ও অনেক কমে এসেছে। তিনি এসে দেখলেন, ব্যাঙ্কের বড় গেটটা খোলাই আছে। টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসছে অনেকে। তিনি এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন মাখনবাবুর কাছে। শুকনো মুখে মাখন গুপ্ত তখনও ছাতি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওখানে। প্রথমে ছাতিটা তিনি শশধরবাবুর মাথার ওপরেও ধরেছিলেন। তারপর বেলা যত বাড়তে লাগল, মাখন গুপ্ত একটু একটু ক'রে স'রে যেতে লাগলেন দূরে। বারোটার পরেও যখন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল না, তখন তিনি কেবল নিজের মাথার ওপরেই ছাতিটা ধ'রে রাখলেন। শশধরবাবু তার অংশ পেলেন না।

পরেশবাবু তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই মাখন গুপ্ত ব্যাঙ্কের দরজার দিকে মুখ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে অধ্যাপক, কখন এলেন?"

"একটু আগেই।"

"টাকা তুললেন না কি?"

"না, টাকা তুলতে আসি নি। একদিনে সবাই যদি টাকা তুলে নেয়, তা হ'লে আপনাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও তো উজাড় হয়ে যাবে।"

এই সময়ে মাধুরী বেরিয়ে এলো বাইরে। মাখনবাবু কিংবা শশধরবাবু কাউকেই সে দেখতে পায় নি। দু'পা সমানের দিকে এগিয়ে গিয়ে মাখন গুপ্ত খপ ক'রে হাতটা চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাধু, তুই এখানে কি করছিস?"

"হাত ছাড় মামা, ব্যথা লাগছে।"

"এখানে কি কাজ ছিল তোর?"

"টাকা রাখতে এসেছিলুম। আজকে আমি একটা অ্যাকাউণ্ট খুললুম এখানে।"

"সর্বনাশ! করলি কি?"

"মামা, মাকে তুমি হারিয়েছ, আমাকে পারবে না।"

"কি, এত বড় কথা!"

শশধরবাবু আর পরেশবাবু তখন মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাধুরীর কথা সব শুনলেন এঁরা। মাধুরী এবার একটা চেক-বই শশধরবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এটা আপনার কাছে থাক্। দরকার হ'লে চেয়ে নেব।"

হাসতে হাসতে শশধরবাবু বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, থাক্ আমার কাছে। চলো মা, আমরা এবার বাড়ি যাই, বেলা তো কম হয় নি।"

মাখনবাবু নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বললেন, "মাত্র একটা বাজল। এখনও আরও এক ঘণ্টা সময় আছে। দুটো পর্যন্ত সবাইকে টাকা দিতে হবে। শেষটা দেখে যাবেন না, সেন মশাই?"

"শুরুটাই দেখতে এসেছিলুম।"—এই ব'লে শশধরবাবু মাধুরীর ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন।

মাধুরী এবার শশধরবাবুর দিকে মুখ ক'রে বলল, "ইনি পরেশবাবু, এঁর কাছে আমি ইতিহাস পড়তুম।"

বোস সাহেব জানলার কাছে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল উল্টো দিকের ফুটপাতে। তিনি দেখলেন, মাখন গুপ্ত দাঁড়িয়ে আছেন শশধরবাবুর পাশে। মাধুরীকেও দেখলেন তিনি, চিনতে পারলেন না। মনে মনে আন্দাজ করলেন, এই মেয়েটিই বোধ হয় মাধুরী, সহুরে মেয়ে। বাঃ, বেশ

সুন্দর হয়েছে তো দেখতে! বোস সাহেব চশমাটা একটু নেড়ে চেড়ে চাপ দিয়ে ভাল ক'রে বসিয়ে দিলেন নাকের ওপর। এখন রমাপদ যদি মেয়েটাকে সত্যিই ভালবাসতে পারে, তা হ'লে সন্থর জীবনটা সুখেই কাটবে। স্বামী বেঁচে থাকলে সন্থর একটা পাকা আশ্রয়ই থাকত। এখন রমাপদ যদি মাধুরীকে বিয়ে করে, তা হ'লে ওদের সাংসারিক শান্তির ওপরেই সন্থর জীবনের শান্তিও নির্ভর করবে। বোস সাহেব দেখলেন, শশধরবাবু মাধুরীকে নিয়ে চ'লে গেলেন স্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকে। ওঁরা বোধ হয় সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হ'ল না ব'লে শশধরবাবুই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি খুশী হয়েছেন আজ, ভাবলেন বোস সাহেব। জানলাটা তিনি বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখলেন, সন্থ এসে দাঁড়িয়েছে মাখনবাবুর পাশে। মুহূর্তের মধ্যে বোস সাহেবের মুখখানা আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জানলাটা বন্ধ করতে তাঁর মিনিট দুই সময় লাগল আজ।

সৌদামিনী দেবী আকাশ থেকে পড়লেও মাখন গুপ্ত এত বেশি অবাক হতেন না। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এখানে কি ক'রে এলি?"

"পাঁচের-এ বাসে চেপে।"

"তোরা মা-মেয়েতে মিলে ক্যানিং স্ট্রীটে এসে হুল্লোড় শুরু করলি কেন আজ? ব্যাপার কি সন্থ? রমাপদকে তোরা লতুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবি নে।"

সৌদামিনী দেবী মাখনবাবুর একটা কথাও শুনলেন না। তিনি চেয়ে ছিলেন বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের ছতলা বাড়িটার দিকে। চেয়ে থাকবার মত বাড়ি বটে!

"দাদা, ললিতের ব্যাঙ্কটা কি ফেল প'ড়ে গেল না কি?"

'ললিত নয়, ললিত নয় সন্থ। ললিতবাবু—লোফার।"

"ব্যাঙ্কটা ফেল পড়লে ললিত কি নিয়ে থাকবে?"

"ললিত নয় সন্থ, ললিতবিহারী বসু—ভ্যাগাবণ্ড।"

"ব্যাঙ্কটাকে বাঁচানো যায় না, দাদা?"

"তোর তাতে লাভ কি, সন্থ? তুই বিধবা। হিন্দু মেয়ের স্বামী কখনও মরে না। বাড়ি চল্।"

এর পরে মাখনবাবু যা করলেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি ট্যাক্সি ডাকলেন। সতুকে আজ তিনি ট্যাক্সি চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সৌদামিনী দেবী ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বোস সাহেব আবার জানলাটা খুললেন। ট্যাক্সি চ'লে যাওয়ার পরে জানলাটা খোলাই রইল।

ছুটো বেজে গেছে। তিনটে বাজল। রমাপদকে তবু বোস সাহেব একবারও ডাকলেন না। রমাপদকে ডাকবার ক্ষমতা বোধ হয় বোস সাহেবের আর নেই। তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সদাশিব রায় এসে পৌঁছে গেলেন। তিনি তাঁর নিজের অ্যাটর্নি আর অডিটারও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। ললিতবিহারী বসু ব্যাঙ্ক চালাতেন, ব্যবসা করতেন না। সদাশিব রায় ছুটো কাজই করবেন।

মীটিংয়ের খাতাপত্র নিয়ে এবার রমাপদকে আসতে হ'ল দোতলায়। মীটিংয়ের ঘর আলাদা। অন্যান্য ডাইরেক্টাররাও সবাই এলেন। এঁরা সব বোস সাহেবের হাতের লোকই ছিলেন। রমাপদকে সামনে দেখতে পেয়ে বোস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ব্যাঙ্কেই ছিলে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সার্।"

"তুমি বিয়ে করছ কবে?"

প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে সবাই এসে ঘরে ঢুকলেন। কথা বলার হয়তো আর সুযোগ পাওয়া যাবে না ভেবে রমাপদ বলল, "আজকে আমাদের ব্যাঙ্কে মাধুরী একটা নতুন অ্যাকাউণ্ট খুলল। তিন শো পঁচানব্বই টাকা আট আনা জমা দিয়েছে।" রমাপদ বেরিয়ে এলো বোর্ড-রুম থেকে। অপেক্ষা করতে লাগল ঘরের বাইরে। ওকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না মীটিং শেষ হয়।

শেষ হতে প্রায় ছু ঘণ্টাই লাগল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ক্যানিং স্ট্রীটে ভিড় আর নেই। সদাশিব রায় বললেন, "রমাপদ, কাল সকালেই আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো।"

"কটার সময় যাব, সার্?"

"বেলা আটটা নাগাদ। দরওয়ানদের সব ব'লে দিও, ললিতবাবু এ ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর যুক্ত নেই। তিনি এখান থেকে একটা আলপিনও হাতে

ক'রে নিয়ে যেতে পারবেন না। ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সব ব্যাঙ্কেরই, এমন কি আলপিনটাও।" লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গিয়ে সদাশিব রায় আবার বললেন, "ললিতবাবুর গিনি-হাউসটা তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। তাঁর প্রাইভেট ভল্ট থেকে সবগুলো গিনিই আমরা বার ক'রে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির ফর্দভুক্ত করেছি। বিপিনকে ব'লে দিয়ো, কাল থেকে ওই ঘরটাই হবে বিশ্ববিহার ব্যাঙ্কের প্রধান হিসাব-রক্ষকের কামরা। রমাপদ, মাখনবাবুর কাছে শুনেছিলাম যে, ওই ঘরটায় ঢুকতে তুমি নাকি ভয় পেতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সার্।"

"এখন তো আর ভয়ের কোন কারণ রইল না। লুকনো গিনি-হাউস ললিতবাবু নিজেই আজ খুলে দিয়েছেন। ড্রাইভার গুলজার আলিকে বলবে, আমার কাছ থেকে অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত গ্যারেজ থেকে একটা গাড়িও যেন সে বার না করে। রমাপদ, তুমি কি করবে? তুমিও তো গাড়ি এখন ব্যবহার করতে পারবে না।"

"আমার কোন অসুবিধে হবে না।"

"নীচে আমি একটু অপেক্ষা করছি, তুমি বরং এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে। আমার ওখানে কাজ শেষ হ'লে, আমার ড্রাইভারই তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে।"

"আচ্ছা, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ ক'রে নিচ্ছি।"

সদাশিব রায় লিফ্‌টে ক'রে নেমে গেলেন নীচে।

রমাপদ বোস সাহেবের প্রাইভেট কামরার বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "আসতে পারি কি, সার্?"

"এসো।"

ঘরে ঢুকতে রমাপদ আজ আর ভয় পেল না। সোজা এসে ব'সে পড়ল বোস সাহেবের সামনে। কিছু বলল না। বোস সাহেবই বললেন, "অন্ধকার তো হয়ে এলো, আর একটু ঘন হ'লে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব। ওঁরা বললেন, খুব বেঁচে গেছি। সব কিছু দিয়ে না দিলে আমায় ওঁরা জেলে দিতেন। রক্তের চাপ আমার এত বেড়েছে যে, জেলে গেলে আমি ম'রে যেতুম। জেলে যাওয়ার চেয়ে অন্ধকারে মিশে যাওয়া অনেক ভাল। তোমার কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয়, ওঁরা আপনাকে জেলে দিতে পারতেন না। আমি জানি, ভয় পেয়ে আপনি ব্যাঙ্ক ছাড়েন নি।"

মৃদু হাসি ভেসে উঠল বোস সাহেবের মুখে। তিনি বললেন, "এবার তুমি সত্যিকারের কাজ করবার সুযোগ পাবে। তুমি কাজ করতেই তো চেয়েছিলে। ব্যবসায় বাণিজ্যে বাংলা দেশ বড় হোক তেমন স্বপ্ন তোমার ছিল। আমি থাকলে ব্যাঙ্কটা বাঁচত না, তোমার স্বপ্ন যেত নষ্ট হয়ে। তোমার সামনে জীবনের বিস্তৃতি দিগন্তপ্রসারী, কিন্তু আমার সামনে কিছুই নেই। আমার যা ছিল সব ভেসে গেল পদ্মার জলে। হয়তো তোমার দিকে চেয়েই আমি স'রে গেলাম।"

"মাধুরীর দিকে চান নি, সার্?"

"হ্যাঁ, মাধুরীর মঙ্গল কামনা করেছি বইকি। সতুর তো ওই এক মেয়ে।—সবাই সব কিছু পেল, আমি একটা ব্যাঙ্ক পেয়েছিলাম, তাও রাখতে পারলাম না। সদাশিববাবুর গাড়ির হর্ন বাজছে, তোমায় ডাকছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, সার্।"

"তা হ'লে তুমি যাও। আরও একটু বেশি অন্ধকার হ'লে আমিও বেড়িয়ে পড়ব। একটা খুব আশ্চর্যের কথা শুনবে, রমাপদ?"

"কি কথা, সার্?"

"কলকাতায় আমি বিশ বছরের ও'পরে বাস করছি বটে, কিন্তু এখানে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও থাকি নি। কলকাতার কিছুই আমি চিনি না। পার্ক সার্কাস ব'লে যে এখানে একটা জায়গা আছে, তাও যেন আজ আমি প্রথম জানলুম। সকালে ওই পথ দিয়েই আসছিলাম। একটা জায়গায় দেখলুম অনেকগুলো সমাধি-মন্দির রয়েছে। গুলজার আলি ড্রাইভার বলল যে, এখানে খ্রীষ্টানদের কবর দেওয়া হয়। গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বললুম। সাদা সাদা স্তম্ভগুলোর দিকে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। মনে হ'ল, আমার পাওয়ার আর কিছু নেই। সব পাওয়ার শেষ আমি দেখলুম। আর দেখলুম, ওই পার্ক সার্কাসে। এতগুলো মৃত্যুর চিহ্ন এক জায়গায় আমি কোনদিনই দেখি নি, রমাপদ।"

উঠে পড়বার জন্যে রমাপদ একটু ব্যস্ততা দেখাল। বোস সাহেব বললেন, "যদি বেচে থাকি, মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। এই ব্যাঙ্কে আমি দুটি

জিনিস রেখে যাচ্ছি।" ভাবলেন একটু, তারপর আবার বললেন, "ব্যাঙ্কের নাম লেখা সাইনবোর্ডখানা, আর রেখে যাচ্ছি তোমাকে।"

কথা শুনে মনটা ভিজে আসছিল রমাপদর। তাই সে বলল, "আমার হাতে কোন কিছুই নষ্ট হবে না। ব্যাঙ্কটাকে আরও বড় করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" উঠে পড়ল রমাপদ।

বোস সাহেব বললেন, "একটু দাঁড়াও। সেদিন হিরোশিমার আর্তনাদ শুনে মনে হ'ল যেন জায়গাটা কত কাছে! মাঝখানে সুতোর মত একটা ব্যবধান—এ পারে হিরোশিমা আর ও পারে সভ্যতা। তাই না?"

"হ্যাঁ। নমস্কার সার্।" রমাপদ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বোস সাহেব ডাকলেন, "এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। একটু আগে সদাশিব-বাবু বাড়িতে টেলিফোন ক'রে আমার পদত্যাগের কথা লতিকাকে জানাতে চেয়েছিলেন। বাড়ি থেকে খবর পেলেন তিনি যে, লতিকা সেই সকাল থেকে এখনও নিরুদ্বেগে ঘুমচ্ছে। লতিকা যে ভেতরে ভেতরে কতখানি জ্বলেছে তার একটা আন্দাজ পেলুম আজ।"

এর পরে রমাপদ আর অপেক্ষা করল না।

বিপিন অপেক্ষা করছিল। এই ঘরের চাবিটা বিপিনকে দিয়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হবে বোস সাহেবের। ড্রয়ার থেকে একটা পাস-বই বার করলেন তিনি। বিপিনের নাম নামে যা টাকা তিনি রেখেছিলেন সেটা তারই রইল। পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন পাস-বইটা। জানলায় এসে শেষবারের মত দাঁড়ালেন বোস সাহেব। ক্যানিং স্ট্রীটের সঙ্গে পরিচয় তাঁর আজকেই শেষ হবে। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেন বোস সাহেব, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। এবার এই অন্ধকারের স্রোতে ভেসে পড়লেই হয়। কলকাতার আকাশে ঝড় নেই বটে, কিন্তু বোস সাহেবের মনের আকাশে ঝড় আজও থামে নি। এ ঝড় থামবার নয়। রাস্তায় নামবার আগে বোস সাহেব একবার ফিরে যেতে চাইলেন বিক্রমপুরের রাজবাড়ি গ্রামে।

সংসারে বাপ মা কেউ ছিলেন না। কাকার বাড়িতে বয়স বেড়েছে তাঁর। লেখাপড়া করবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুযোগ তেমন হয় নি। গাঁয়ের

ইস্কুলে তিনি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। বাল্যজীবনটা সুখের হয় নি বোস সাহেবের।

সুখের স্বাদ পেলেন তিনি যেদিন পদ্মার ধারে দেখা হ'ল সন্থুর সঙ্গে। ভাল বাঁশী বাজাতেন বোস সাহেব। বাঁশীর সুরে সন্থুকে তিনি পাগল ক'রে তুলেছিলেন। সন্থু তাঁর বাঁশী শুনলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। সন্থুকে তিনি ভালবাসলেন। ভালবাসার পথ খুব সরল নয় তা তিনি জানতেন। সন্থুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বোস সাহেব উপার্জনের পথ খুঁজতে লাগলেন। কোথায় পথ, কেমন ক'রে সে-পথে পৌঁছতে হয় তাও তিনি জানতেন না। দিন গেল, বছরও ব'য়ে চলল ক্ষয়ের দিকে। সৌদামিনীর দাদা মাখন গুপ্ত ব্যাপারটা সব জানতে পেরেছিলেন। ভালবাসার পথ খুব মসৃণ নয়, জানতেন বোস সাহেব। কিন্তু মসৃণ নয় জেনেও বোস সাহেব সন্থুকে ভালবাসতে লাগলেন।

সন্থুর বয়স বোধ হয় তখন উনিশ কি কুড়ি। মাখনবাবু তখন বাঁকুড়ায় মুন্সেফ। ছুটি নিয়ে দেশে আসবার পথে কলকাতা থেকেই তিনি সন্থুর বিয়ের সব পাকা বন্দোবস্ত ক'রে এলেন। পদ্মার ধারে দিনরাত হেঁটে হেঁটেও বোস সাহেব সন্থুকে রক্ষা করবার কোন রাস্তাই বার করতে পারলেন না। তাঁরই চোখের সামনে সন্থুর বিয়ের সব জিনিসপত্র কেনাকাটা হতে লাগল।

এই পর্যন্ত ভাবার পরে বিপিন এসে পেছনে দাঁড়াল। সে বলল, "অনেক রাত হ'ল বাবু।"

"ও, তাই তো। চাবিটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি। আর পাঁচ মিনিট দাঁড়া।"

"নীচে দরওয়ানরা আর ড্রাইভার দুজনও অপেক্ষা করছে।"

"তাদের সঙ্গে তো আমার আর কোন কাজ নেই বিপিন। ওদের যেতে ব'লে দে।"

বিপিন বেরিয়ে যাওয়ার পরে বোস সাহেব আবার ফিরে গেলেন রাজবাড়িতে। সন্থুর বিয়ের দিন বোস সাহেব দুপুরবেলা থেকে বাঁশী বাজাতে লাগলেন। বোধ হয় সন্ধ্যে পর্যন্তই তিনি বাঁশী বাজিয়েছিলেন, সন্থু তবু এলো না। বৈশাখ মাস। এর দুদিন আগেও কালবৈশাখীর হঠাৎ আবির্ভাবে পদ্মার বুক উঠেছিল ফুলে। কী তার উচ্ছ্বাস আর কী তার গর্জন! রাজ-

বাড়ির দক্ষিণ দিকটা গত কদিনের মধ্যে পদ্মার জলে ভেঙে পড়েছে। বোস সাহেবদের বাড়িটাও একেবারে জলের সামনে এসে পড়ছিল ব'লে তাঁর কাকা ঘরের টিন আর খুঁটিগুলো খুলে নিয়ে রাজবাড়ি ত্যাগ ক'রে গেছেন প্রায় মাস খানেক আগে। বোস সাহেবের মাথা গুঁজবার জায়গা ছিল না। ইস্কুলের খালি ঘরে, কখনও মুদির দোকানে রাত কাটাতে লাগলেন তিনি।

সন্থর বিয়ের দিনটাতে আবার কালবৈশাখী এলো। পদ্মার বুকে মাতন উঠল প্রচণ্ড। বিয়ের শাড়ি আর অলঙ্কার প'রে সন্ধ্যের সময় সন্থ বেরিয়ে এলো বাইরে। বোস সাহেব তার জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন। সন্থ বলল, "তোমার চাকরি নেই। থাকবার ঘর নেই। হাতে পয়সাও নেই। কি করবে, তাড়াতাড়ি কর।"

"তোমায় বিয়ে করব। আমিও একজন পুরুত ঠিক করেছি। দক্ষিণার পয়সা তাঁকে পরে দিলেও চলবে। নারায়ণশিলা তিনিই যোগাড় ক'রে নিয়ে আসবেন। সন্থ, তুমি তো ভালবাস আমাকে, অন্যদিকে দেখবার দরকার কি?"

"তোমার মত মানুষ তো গল্পের বইতেও দেখি নি।"—হতাশার সুরে মন্তব্য করল সন্থ।

"কি ক'রে দেখবে! তাদের তো কর রকমের গুণ থাকে! পয়সা না থাকলে বিদ্যা থাকে, রূপ থাকে। কোন বড়লোক আত্মীয় মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি পাওয়ার আশাও থাকে তাদের। আমার কিছু নেই, সন্থ। আমি অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত অসহায়। তাই আমার দিকে কেউ নেই, একমাত্র পুরুতঠাকুর আর নারায়ণশিলা ছাড়া। তোমাকে ভালবাসি, কেবল সেইটেই আমার সম্পদ। আমি জানি সব শিক্ষিত লোকেরাই আমার মত ক'রে ভালবাসতে পারবে না। সন্থ, আশ্রয় হয়তো একদিন জুটবে, অভাবও হয়তো মিটবে; কিন্তু তোমার যদি বিয়ে হয়ে যায়, তা হ'লে আমি কি করব আশ্রয় পেয়ে, কি করব অভাব মিটিয়ে?"

সন্থ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশের কালো মেঘ পদ্মার বুকের ওপরে ছাউনি ফেলেছে। বোধ হয় জল নামবে এক্ষুনি। প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য এখন অনেক। বোস সাহেব বললেন, "কেবলমাত্র এই মানুষটার ওপর বিশ্বাস ক'রে চ'লে আসতে পার না?"

"না। পরীক্ষা ক'রে তো কিছুই দেখিনি, ললিত। অনেক রকমের

প্রতিজ্ঞা তুমি করবে জানি, কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা-পালনের মন তোমার থাকবে কি না জানি না।”

“এই মুহূর্তটার চেয়ে বড় বিপদ আমাদের জীবনে হয়তো আর আসবে না। সদু—”

সৌদামিনী তখন চেয়ে ছিল পদ্মার দিকে। সেই দিকে চেয়ে হঠাৎ সদু জিজ্ঞাসা করল, “আমি যদি বলি, ওই পদ্মফুলটা আমায় এনে দাও, পারবে এনে দিতে?”

“পারব।”

“তা হ'লে দাও।”

বোস সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। স্রোতের টানে বোস সাহেব কতদূর যে চ'লে গেলেন সদু তা দেখতে পেল না। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটল। কি করবে সদু? তখন তার পায়ের দু ইঞ্চি নীচে জল।

প্রায় সারা রাত বোস সাহেব ভেসে রইলেন। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পেরে উঠলেন না। কত ক্রোশ দূরে গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত তিনি ডাঙায় উঠলেন, আজ আর তা বোস সাহেবের মনে নেই। রাজবাড়ির দিকে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তিনি পথ চলতে লাগলেন। দৌড়বার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। প'ড়েও যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। রাজবাড়িতে পৌঁছবার জন্যে সমস্তটা দিন তিনি হাঁটলেন। পরের দিন রাত্রিবেলা পদ্মফুল নিয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন সদু তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গেছে।

আজ সেই পদ্মফুলটা আর নেই, ব্যাঙ্কটাও তাঁর রইল না।

বিপিনের হাতে চাবিটা দিয়ে তিনি বললেন, “তোর চাকরি তো রইলই। আমি আর রিজেণ্ট পার্কে ফিরে যাব না। এই পাস-বইটা নিয়ে যা। এদিকে কোথাও একখানা ঘর ঠিক করতে পারলেই তোদের আমি ঠিকানা দিতে পারব। বিপিন, তোর মা ইংরিজীতে নাম সই করতে পারে জানিস?”

“না, বাবু।”

“আমিই শিখিয়েছিলাম তাকে নাম সই করতে। কথাটা গোপন রাখতে বলেছিলাম আমিই। এখন কেবল তুই তো থাকবি তার কাছে। আমার বিছানার তলায় তার চেক-বইটা আছে। সাবধান ক'রে রেখে দিস।”

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন বোস সাহেব। দরওয়ানরা সেলাম জানাল

তাঁকে। সেলাম তিনি গ্রহণও করলেন। কেবল গুলজার আলি ড্রাইভার সামনে এসে বলল, "কাল আমি দেশে যাচ্ছি সাহেব। চাকরি ছেড়ে দিয়েই যাচ্ছি।"

বোস সাহেব বললেন না কিছুই। পেছনের ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যানিং স্ট্রীটে। রাস্তায় লোক নেই। বুড়ো ভিখিরীটা আছে। ভিখিরীটার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন বোস সাহেব। আজ তাঁর ভোলবার দিন। কাকে মনে রাখবেন? কেন মনে রাখবেন? মনে রেখে লাভ কি? ভুলে যাওয়াই ভাল, ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, ভাবলেন তিনি।

ভিখিরীটা বোস সাহেবকে চিনতে পারে নি। ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফেরবার মুখে বোস সাহেব ওকে প্রত্যেক দিনই একটা ক'রে টাকা দিয়ে যান। গাড়িতে ব'সেই টাকাটা দেন ওর হাতে। আজকে তিনি গাড়িতে নেই, হেঁটে এসেছেন বাইরে। ভুলে গিয়েছিলেন ভিখিরীটার কথা। মনে থাকলে, মীটিংয়ের সময় সদাশিববাবুর কাছে ওর জন্যেও দু-একশো টাকা চেয়ে নিতে পারতেন। এখন তিনি ওকে অন্য দিনের মত একটা টাকাই দিলেন। কেন দিলেন তা তিনি জানেন না। ষোল আনার মধ্যে এক পয়সারও পুণ্য আছে কি না তাও তিনি ভেবে দেখেন নি। ভেবে দেখতে গেলে হয়তো দিতে পারতেন না।

রাস্তার উল্টো দিকে চ'লে এলেন বোস সাহেব। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন দু-এক মিনিট। কেবল অতীত নয়, ভবিষ্যৎটাও তিনি এখানে রেখে গেলেন আজ। দুপুরবেলা ঠিক এই জায়গাতেই সন্থু এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সন্থু এখানে নেই। এমন কি সন্থুর ছায়াটা পর্যন্ত নেই! বোস সাহেব সত্যিই একা পড়লেন আজ।